১৪ মে ১৯৮৬ □ আনন্দবাজার প্রকাশন □ তিন টাকা

আনন্দমেলা

প্রচ্ছদ নিবন্ধ
কৃত্রিম উপগ্রহ

সত্যজিৎ রায়ের গল্প

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ধারাবাহিক

আশাপূর্ণা দেবীর সম্পূর্ণ উপন্যাস

স্পাইডারম্যান □ স্টার ওআরস □ কুইজ

Hard Copy - Library
Scan & Edit - Optimus Prime

This e-copy is scanned and preserved by
Dhulokhela Team Members

Anyone Can Contribute to our project by
giving their rare magazines for scan.

Reach us at
optifmcybertron@gmail.com

ক্যালেন্ডুলার ভেষজ গুণে ভরপুর...
গ্রীষ্মের দিনগুলিতে বোরো ক্যালেন্ডুলার সাহায্যে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপায়ে আপনার ত্বককে ঘামাচি থেকে সুরক্ষিত রাখুন। প্রাকৃতিক উপাদান ক্যালেন্ডুলা ও হাইড্রাস্টিস্ ভেষজের নির্য্যাসে তৈরী এই প্রিক্‌লি হিট পাউডার আপনার শরীরকে দুর্গন্ধমুক্ত করে, আপনাকে তরতাজা রাখে সারাদিন।
বোরো ক্যালেন্ডুলা ঘামাচি ও ত্বকের দুর্গন্ধ সৃষ্টিকারী জীবাণু নাশে অদ্বিতীয়।
বোরো ক্যালেন্ডুলা*
প্রিক্‌লি হিট পাউডার
সারাদিন আপনাকে দুর্গন্ধমুক্ত আর তরতাজা রাখে
Boro calendula*
PRICKLY HEAT POWDER
HL এর উৎপাদন
anjan chakraborty, Cal-74
* A PATENT & PROPRIETARY HOMOEOPATHIC MEDICINE OF HAHNEMANN LABORATORY, CALCUTTA - 12

আনন্দমেলা

ছড়া
সাজগোজ । প্রেমেন্দ্র মিত্র ৪

গল্প
গঙ্গারামের কপাল ।
সত্যজিৎ রায় ৫

লটারির টিকিট । মঞ্জিল সেন ৩৩
অজ্ঞাত সৈনিকের সঙ্গে ।
কৃষ্ণা বসু ৬১

সম্পূর্ণ উপন্যাস
মার্ডার কেস । আশাপূর্ণা দেবী ১৫

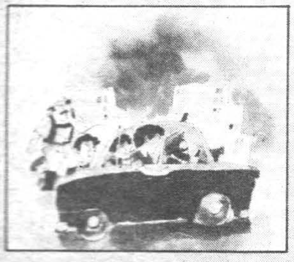

ধারাবাহিক উপন্যাস
নীলমূর্তি-রহস্য ।
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ১২
ডোরাকাটা জামা ।
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ৭১

প্রচ্ছদ-রচনা
কৃত্রিম উপগ্রহের কী ও কেন ।
অনীশ দেব ৩৬

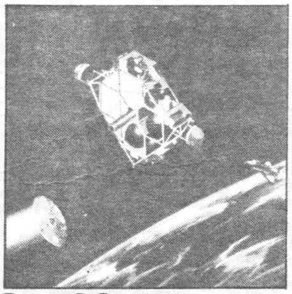

বিজ্ঞানবিচিত্রা
এলাম আমি কোথা থেকে ।
সুভাষ মুখোপাধ্যায় ৩৯
বিচিত্র সব মাছ ।
বিশ্বজিৎ পাণ্ডা ৪০

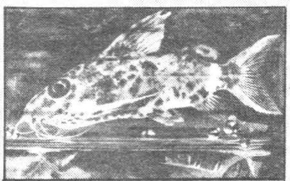

বিজ্ঞান : গবেষণা । অনুসন্ধানী ৪৫

শার্লক হোমসের গল্প
নতুন চাকরি ।
সার আর্থার কোনান ডয়েল ৬৮

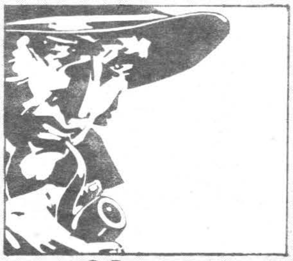

ভ্রমণকাহিনী
স্বপ্নরাজ্য অ্যাগনিস পার্ক ।
সলিল লাহিড়ী ৪৯

সাক্ষাৎকার
সুকুমার সেনের ছেলেবেলা ।
কার্তিক মজুমদার ৫৮

লেখাপড়া ও বিদ্যালয়-পরিচিতি
সহজে ইংরেজি । প্রসাদ ৫৫
অর্থ জানো । দেব-সেনাপতি ৫৫
বীরসিংহ ভগবতী বিদ্যালয় ।
শ্যামলকান্তি দাশ ৭৬

স্বাস্থ্য-কথা
যোগাসনের উদ্দেশ্য ।
বিশ্বনাথ ঘোষ ও
প্রেমসুন্দর দাস ৬৫
সর্দি-গরমি এড়াতে হলে ।
(ডাঃ) বিশ্বনাথ রায় ৬৫

খেলাধুলো
মেক্সিকোয় কে বিশ্বকাপ জিতবে ।
রত্না শূর ৭৮
এবারের বিশ্বকাপের নায়করা ।
কৃশানু ভট্টাচার্য ৮২
বিশ্বকাপের গল্প ৮৬
বিশ্বকাপের ধাঁধা ৮৬

চিত্রকাহিনী ও কমিক্স
স্টার ওঅরস ৪৬,
স্পাইডারম্যান ৫২,

টিনটিন ৫৬, টারজান ৭৫,
রোভার্সের রয় ৮৪, গাবলু ৮৯

অন্যান্য আকর্ষণ
কুইজ । নিল ও'ব্রায়েন ৪৮
ধাঁধা ৬৬, হাসিখুশি ৬৬
মজার খেলা ৬৬, শব্দসন্ধান ৬৭
আঁকিবুকি ।
রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৭
দূরদর্শন । দিগ্‌দর্শক ৮৭
বইয়ের খবর ।
দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ৯০

প্রচ্ছদ
বিমল দাস

আগামী সংখ্যায়

লীলা মজুমদারের তাক-লাগানো ভুতুড়ে গল্প 'পাখি'

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের সম্পূর্ণ উপন্যাস 'কালো গোখরো'

মহাশ্বেতা চৌধুরীর কলম্বাস যাদের ভারতীয় ভেবেছিলেন

নিশানাথ সেনগুপ্তের কম্পিউটার কী না পারে

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ছড়া । সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের ধারাবাহিক উপন্যাস । যোগ-ব্যায়াম, কমিক্স, ম্যাজিক, কুইজ, টিভি, বইয়ের খবর, অন্যান্য আকর্ষণ ।

সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত । দাম তিন টাকা ।
বিমান মাশুল ত্রিপুরায় ১০ পয়সা ; উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে ১৫ পয়সা । পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা ।

সাজগোজ

প্রেমেন্দ্র মিত্র

জানি, জানি, হচ্ছ মোহিত
খোলসটাকে দেখেই,
ভেতরে কী বস্তু আছে
একটু তা না চেখেই !

মানছি বটে চেহারাটা
জোর দর্শনডালি,
চোখে পড়লেই মন কেড়ে নেয়
বাহারি বর্ণালি !

পরখ করে দেখো তবু
বাহারটা নয় ফাঁকি,
সাজটা যেমন, গোজটাও তাই
আগেই বলে রাখি ।

সাজ তো জানি, গোজ মানে কী ?
ভেবে মরছ বুঝি ?
পাতাগুলো উলটে গেলেই
অর্থ পাবে খুঁজি ।

সাজটা হল খোলসটারই
গোজটা হল শাঁস,
সাজের সাথে গোজ মিললে
তবেই মেটে আশ ।

এ মিল হল কেমন করে, বলি,
তোমরা যেমন হচ্ছ বড়
আমরাও ঠিক তাই,
নতুন কালের তালে তালে
পা বাড়িয়ে চলি ।

ছবি : বিমল দাস

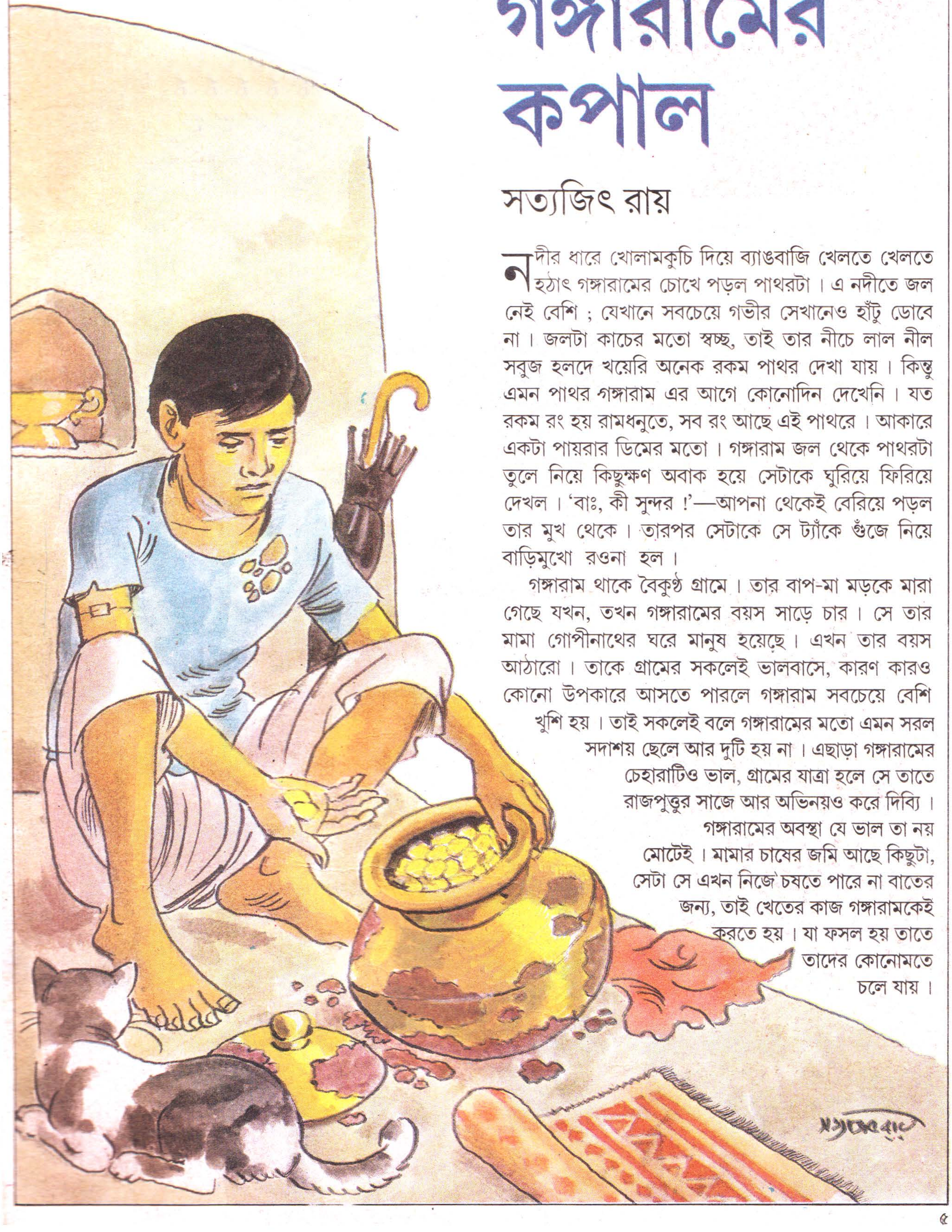

গঙ্গারামের কপাল

সত্যজিৎ রায়

নদীর ধারে খোলামকুচি দিয়ে ব্যাঙবাজি খেলতে খেলতে হঠাৎ গঙ্গারামের চোখে পড়ল পাথরটা। এ নদীতে জল নেই বেশি ; যেখানে সবচেয়ে গভীর সেখানেও হাঁটু ডোবে না। জলটা কাচের মতো স্বচ্ছ, তাই তার নীচে লাল নীল সবুজ হলদে খয়েরি অনেক রকম পাথর দেখা যায়। কিন্তু এমন পাথর গঙ্গারাম এর আগে কোনোদিন দেখেনি। যত রকম রং হয় রামধনুতে, সব রং আছে এই পাথরে। আকারে একটা পায়রার ডিমের মতো। গঙ্গারাম জল থেকে পাথরটা তুলে নিয়ে কিছুক্ষণ অবাক হয়ে সেটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। 'বাঃ, কী সুন্দর !'—আপনা থেকেই বেরিয়ে পড়ল তার মুখ থেকে। তারপর সেটাকে সে ট্যাঁকে গুঁজে নিয়ে বাড়িমুখো রওনা হল।

গঙ্গারাম থাকে বৈকুণ্ঠ গ্রামে। তার বাপ-মা মড়কে মারা গেছে যখন, তখন গঙ্গারামের বয়স সাড়ে চার। সে তার মামা গোপীনাথের ঘরে মানুষ হয়েছে। এখন তার বয়স আঠারো। তাকে গ্রামের সকলেই ভালবাসে, কারণ কারও কোনো উপকারে আসতে পারলে গঙ্গারাম সবচেয়ে বেশি খুশি হয়। তাই সকলেই বলে গঙ্গারামের মতো এমন সরল সদাশয় ছেলে আর দুটি হয় না। এছাড়া গঙ্গারামের চেহারাটিও ভাল, গ্রামের যাত্রা হলে সে তাতে রাজপুত্তুর সাজে আর অভিনয়ও করে দিব্যি।

গঙ্গারামের অবস্থা যে ভাল তা নয় মোটেই। মামার চাষের জমি আছে কিছুটা, সেটা সে এখন নিজে চষতে পারে না বাতের জন্য, তাই খেতের কাজ গঙ্গারামকেই করতে হয়। যা ফসল হয় তাতে তাদের কোনোমতে চলে যায়।

গঙ্গারামের একটা মামাতো ভাই আছে তার চেয়ে তিন বছরের বড়, নাম রঘুনাথ। রঘুনাথ কুসঙ্গে পড়ে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে যায়, তাতে তার শাস্তি হয় তিন বছরের হাজতবাস। সেই তিন বছর কাটতে আর তিন মাস বাকি। বাবা গোপীনাথ বলেছে ছেলেকে আর বাড়িতে ফিরিয়ে নেবে না।

নদীর ঘাটে খেলা সেরে বাড়ি ফেরার পথে গঙ্গারাম একবার সুবলকাকার বাড়ি হয়ে গেল। সুবলকাকার কদিন থেকে সর্দি জ্বর। তার একটা পা খোঁড়া, তাই সে লাঠি ছাড়া হাঁটতে পারে না। গঙ্গারাম তাকে এসে দেখার জন্য শশীকবিরাজকে খবর দেয়, শশী রুগি দেখে ঔষধ বলে দিয়ে যায় চাকুলে পাতার রস। সে পাতাও গঙ্গারাম বনবাদাড়ে ঘুরে বিছুটির কামড় খেয়ে জোগাড় করে এনে দেয়।

আজ গঙ্গারাম দেখল সুবলকাকা অনেকটা ভাল। একবার মোক্ষদা-বুড়ির বাড়িতেও যাবার ইচ্ছা ছিল, বুড়ি গ্রামের এক প্রান্তে একা থাকে সেই জন্য, কিন্তু সুবলকাকার বাড়ি থেকে বেরিয়ে দেখল আকাশে মেঘের ঘনঘটা।

গঙ্গারাম পা চালিয়ে বাড়িমুখো চললেও বৃষ্টি এড়াতে পারল না। অবিশ্যি বৃষ্টিতে ভিজতে তার ভালই লাগে, কিন্তু ও মা—আজ যে জলের সঙ্গে শিল পড়তে শুরু করল! আর এমন শিল গঙ্গারাম তার বাপের জন্মে দেখেনি। একেকটা শিল যেন একেকটা তাল। ফটাস্ ফটাস্ করে রাস্তায় পড়ছে আর ফেটে চৌচির হয়ে বরফ ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। যদি একটা মাথায় পড়ে?

মাথায় পড়ল ঠিকই, তবে সেটা গঙ্গারামের নয়। শ্রীনিবাস-ময়রার বুড়ো বাপ ভুজঙ্গ লাঠি হাতে ঠক্ ঠক্ করে যাচ্ছিল রাস্তা দিয়ে, সোজা তার মাথায় একটা শিল পড়ে গঙ্গারামের চোখের সামনে বুড়ো মাথা ফেটে অক্কা পেল। আর তারপর গাঁয়ের কেলো কুকুরটাও ম'ল মাথায় ওই রাবুনে শিল পড়ে। গঙ্গারাম ভেবেছিল তেলিপাড়ার বুড়ো অশ্বত্থ গাছটার তলায় আশ্রয় নেবে, কিন্তু সেই সঙ্গে শিল কুড়িয়ে নিয়ে তাতে কামড় দেবার লোভটাও সামলাতে পারল না। অথচ গাঁয়ের সব লোক হয় গাছতলায় না হয় বাড়ির দাওয়ায় আশ্রয় নিয়েছে। দু'একজন গঙ্গারামকে রাস্তায় দেখে চেঁচিয়ে তাকে সাবধান করে দিল, কিন্তু গঙ্গারাম তাদের কথায় কান দিল না। আর এও ঠিক যে, তার চতুর্দিকে শিল পড়লেও তার গায়ে পড়েনি। গঙ্গারামের কপাল মন্দ বলেই সকলে জানত—যদিও গঙ্গারাম কোনোদিন নিজেকে দুঃখী বলে মনে করেনি—কিন্তু আজ যে ঘটনা ঘটল তাতে বলতেই হয় যে তার কপাল খুলে গেছে।

এই ঘটনার তিনদিন পরে খেতে জমি চষতে গিয়ে গঙ্গারামের লাঙলে খটাং করে মাটির তলায় কী যেন একটা লাগল। গঙ্গারাম মাটি খুঁড়ে দেখল সেটা একটা পিতলের কলসি, তার মুখটা একটা পিতলের ঢাকনা দিয়ে বন্ধ, আর সেই ঢাকনা একটা লাল কাপড় জড়িয়ে তাকে গেরো দিয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে সহজে না খোলে।

খেতে কাজ সেরে গঙ্গারাম কলসিটা বাড়িতে নিয়ে এল। বেশ ভারী কলসি; গঙ্গারামের গায়ে জোর আছে তাই সে বইতে পারল, না হলে দু'জন লোক লাগত।

বাড়িতে এসে কাপড়ের গেরো খুলে ঢাকনা তুলে গঙ্গারাম দেখল কলসিটার ভিতর অনেকগুলো গোল গোল হলদে চাকতি রয়েছে, যেগুলো দিনের আলোতে ঝলমল করছে। গঙ্গারাম চোখে কখনও মোহর দেখেনি, নইলে সে বুঝত যে সেগুলো সবই মোহর। এই এক কলসির মধ্যে যত স্বর্ণমুদ্রা ছিল তাতে একটা প্রাসাদ বানানো যায়। কিন্তু গঙ্গারাম ভাবল—না জানি এগুলো কিসের চাকতি। যেইভাবে ছিল সেইভাবেই পড়ে থাক।

কলসির মুখে আবার ঢাকনা দিয়ে সেটাকে কাপড় দিয়ে বেঁধে গঙ্গারাম খাটের তলায় চালান দিল; মামাকেও বলল না সেটার বিষয় কিছু।

এর ক'দিন পরে আরেকটা ঘটনায় বোঝা গেল গঙ্গারামের কপাল ফিরেছে। মাঝরাত্তিরে গঙ্গারামের পাড়ায় অন্তা ঘোষের বাড়িতে আগুন ধরল। গঙ্গারামের সাতটা বাড়ি পরেই অন্তা ঘোষের বাড়ি। পাড়ার সকলের ঘুম ভেঙে গিয়ে চারিদিকে হৈহৈ চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল, পুকুর থেকে বালতি বালতি জল এনে হাতে হাতে সে জল চালান হয়ে আগুনে ঢালা হল। কিন্তু সর্বগ্রাসী আগুন এক ঘরের চাল থেকে আরেক ঘরের চালে ছড়াতে লাগল। সাড়ে চার ঘণ্টা লাগল আগুন নেবাতে, কিন্তু আশ্চর্য এই যে চারপাশের বাড়ি পুড়ে গেলেও গঙ্গারামের বাড়ি সে আগুন ছোঁয়নি। গঙ্গারাম নিশ্চিন্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "যাক, বাঁচা গেল। আমাদের বাড়িতে আগুন ধরলে বাতের রুগি মামাটা হয়তো পুড়েই মরত।"

এই ঘটনার পর গাঁয়ের লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল গঙ্গারামের সৌভাগ্যের কথা। কেউ কেউ এসে জিজ্ঞেস করল, "হ্যাঁ রে গঙ্গা, তোর ব্যাপার কী বল তো? তোকে ত চিরদুঃখী বলেই জানি, কিন্তু তোর এমন ভাগ্য ফিরল কী করে?"

গঙ্গারাম একগাল হেসে বলে, "কপালের কথা কেউ কি কিছু বলতে পারে? ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন বটে, কিন্তু কেন তা ত বলতে পারব না!"

গঙ্গারামের একবারও মনে হল না যে, তার ট্যাঁকে যে পাথরটা গোঁজা থাকে সেই পাথরই তার কপাল ফিরিয়ে দিয়েছে।

॥ ২ ॥

গঙ্গারামের মামাতো ভাই রঘুনাথ হাজত থেকে ছাড়া পেয়ে তার বাড়িতে আসার পথেই হলধরের দোকান থেকে মুড়ি কিনে খেতে খেতে গঙ্গারামের আশ্চর্য কপালের কথা শুনল। শুনে তার মনে হল, এটা কেমন করে হয়? হঠাৎ একটা লোকের ভাগ্য ফিরে যায় কী করে? এ ব্যাপারে একটু খোঁজখবর করতে হবে ত!

খিদে মিটিয়ে বাড়ি ফিরে এসে প্রথমেই তার বাপের

কাছে মুখ-ঝামটা খেতে হল রঘুনাথের। "এ-বাড়িতে তোর ঠাঁই হবে না," সোজা বলে দিলেন বাপ, "তুই অন্য ব্যবস্থা দ্যাখ।"

রঘুনাথ বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে দেখল গঙ্গারাম মাঠ থেকে বাড়ি ফিরছে। "কী দাদা, অ্যাদ্দিনে ছাড়া পেলে বুঝি?" গঙ্গারাম জিজ্ঞেস করল রঘুনাথকে। "কিন্তু বাপ তোমার উপর খাপ্পা হয়ে আছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করেছ?"

"করেছি," বলল রঘুনাথ। "আমি এ বাড়িতে থাকার জন্য আসিনি। আমার অন্য ডেরা আছে কেষ্টপুরে। আমি এসেছি একবার তোর সঙ্গে দেখা করে যাব বলে।"

"সে ত ভাল কথা," বলল গঙ্গারাম।

"তোর সঙ্গে একটা কথা ছিল।"

"কী কথা?"

"তোর কপাল ফিরেছে বলে শুনলাম। ব্যাপারটা কী?"

"আমি আর কী বলব দাদা। যিনি মাথার উপর আছেন, তাঁর কখন কী মর্জি হয় তা কি আমরা বলতে পারি?"

রঘুনাথ বুঝল যে গঙ্গারাম যা বলছে তা সরল মনেই বলছে। তার কাছে থেকে খুব বেশি কিছু জানা যাবে না। সে পোঁটলা কাঁধে আবার বেরিয়ে পড়ল। কেষ্টপুরে সত্যিই তার একটা ডেরা আছে। তার দলের যে পাণ্ডা, যাকে পেয়াদায় ধরতে পারেনি, সেই মহেশ থাকে কেষ্টপুরে। জেল খেটে রঘুনাথের এবার সৎপথে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু দুষ্কর্ম তার মজ্জায় ঢুকে গেছে, তাই তার পুরনো দল সে ছাড়তে চায় না।

তবে কেষ্টপুর যাবার আগে সে গেল হরিতাল, অঘোর গনতকারের কাছে। অঘোর শুধু গুনতে জানে না, সে নানারকম মন্তর-তন্তর জানে। লম্বা, চিমড়ে মানুষটা, গায়ের রং একেবারে আলকাতরার মতো, বয়স কত তা কেউ জানে না।

অঘোর রঘুনাথকে দেখেই বলল, "কয়েদখানা থেকে ছাড়া পেলি? তবে তোর কিন্তু কপালে দুঃখু আছে, তোকে আবার হাজতে যেতে হবে। এই বেলা কুসঙ্গ পরিত্যাগ কর।"

"সে সব কথা থাক," বলল রঘুনাথ। "আমি আমার

ফ্যারেক্স®
প্রথম পছন্দের!

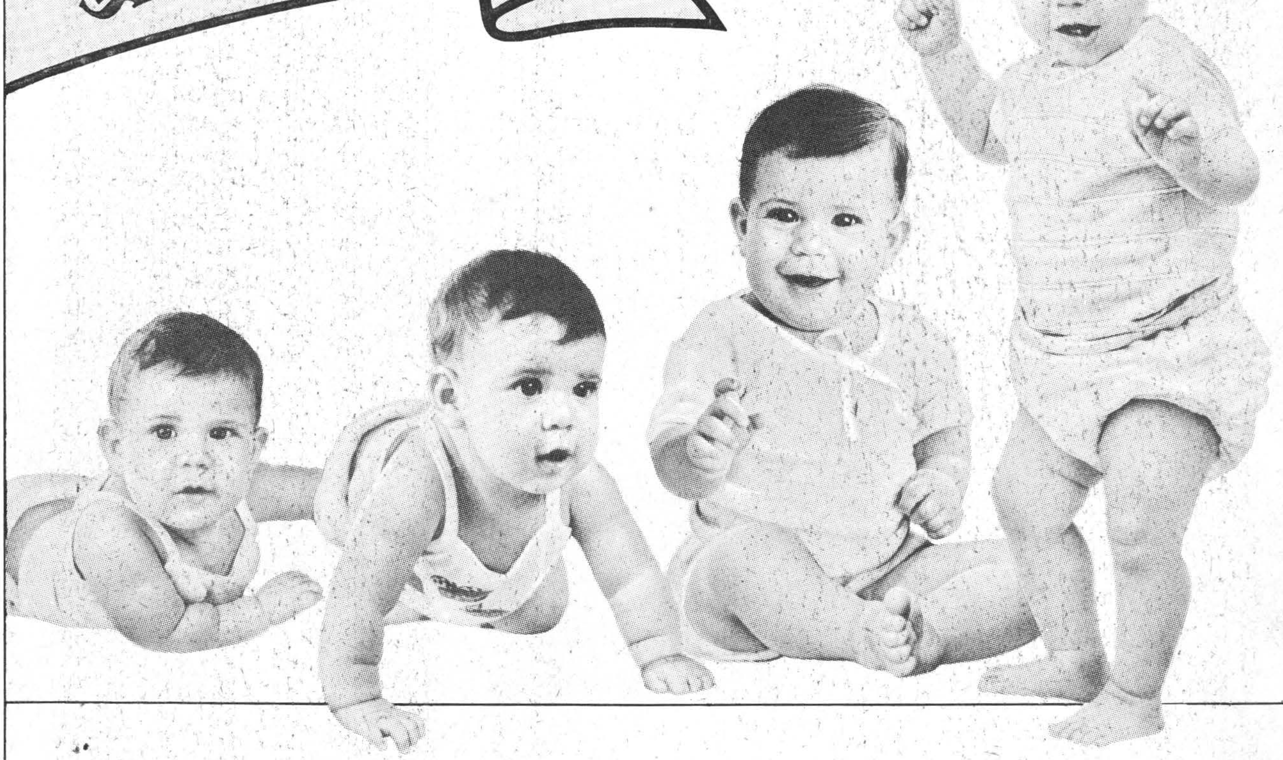

কারণ, নতুন উন্নত ফ্যারেক্স-এ, বাচ্চাকে তার প্রথম ধাপের শক্ত-আহার ধরানোয় সাহায্য করার জন্যে থাকে, অত্যাবশ্যক সব উপাদানের সঠিক সম্মেলন।

প্রোটিন ও ফ্যাটের সঠিক মিশ্রণ
ফ্যারেক্স,প্রোটিনে ভরপুর হয়. যা বাচ্চাকে দৃঢ় ও সুস্থভাবে বাড়বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। ফ্যারেক্স-এ থাকে, বাচ্চার কোমল হজম-ক্রিয়ার উপযুক্ত, বিশেষভাবে ফর্মুলেট করা একেবারে সঠিক পরিমাণে ফ্যাট।

বাচ্চার রক্ত সুস্থ রাখতে থাকে, যথেষ্ট পরিমাণে আয়রন
বাচ্চার ৪ মাসের সময়, তার মজুত রাখা সমস্ত আয়রন নিঃশেষ হয়ে যায়। ফ্যারেক্স-এ যথেষ্ট পরিমাণে আয়রন থাকে যা, বাচ্চার রক্ত সুস্থ রাখতে ও রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

ক্যালসিয়াম-ফসফরাসের আদর্শ অনুপাত
বিশেষভাবে ফর্মুলেট করা ফ্যারেক্স-এ থাকে, ক্যালসিয়াম-ফসফরাসের ২ঃ১ আদর্শ অনুপাত যা, দিনের পর দিন ধরে, বাচ্চার দাঁত ও হাড়, শক্ত ও সুস্থভাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

আর, পুষ্টিকর এই ফ্যারেক্স-এর প্রতিটি আহার এখন আরো বেশী সুস্বাদু করা হয়েছে — আর, এটি মেশানোও অতি সহজ।

দুধ মেশানোর প্রয়োজন নেই!
এ শুধু জল দিয়ে মেশান, আর খাওয়ান।

নতুন উন্নত ফ্যারেক্স®

CLARION-B GX 13/244 BEN

পিসতুতো ভাইয়ের কথা জানতে এসেছি।"

"কে, গঙ্গারাম ?"

"তার কপাল ফিরল কী করে বলতে পারেন ?"

"দাঁড়া, একটু হিসেব করে দেখি।"

অঘোর গনতকার তার তক্তপোশে বসে একটা খেরোর খাতায় খাগের কলম দিয়ে কয়েকটা নকশা এঁকে প্রায় মিনিট পাঁচেক ধরে সেগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। তারপর বলল, "সে তো এখন বিস্তর ধনের মালিক।"

"ধন ? কই, ধনদৌলত ত কিছু দেখতে পেলাম না।"

"কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি।"

"হঠাৎ তার কপাল ফিরল কেন ? সে কি দেবতার বর পেল নাকি ?"

"না। সে পেয়েছে একটা পাথর।"

"পাথর ?"

"হ্যাঁ, পাথর। তার জোরেই তার কপাল ফিরেছে। এই পাথরের নাম সাতশিরা। তার বৃহস্পতি এখন তুঙ্গে। তবে সে নিজে তা বোঝে না। সে অতি সরল মানুষ।"

"তার ধন কোথায় আছে বলতে পারেন ?"

"তার খাটের নীচে। তিন সহস্র স্বর্ণমুদ্রা।"

রঘুনাথ গনতকারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সে সোজা গেল কেষ্টপুর। তার লক্ষ্য মহেশ চোরের বাড়ি।

মহেশের বয়স পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি, পাকানো শরীর, নাকের নীচে পুরু গোঁফ আর গালে গালপাট্টা।

"দাদা !" বলল রঘুনাথ মহেশের হাত ধরে, "তিন সহস্র স্বর্ণমুদ্রা !"

"কী ব্যাপার ?"

রঘুনাথ তাকে পুরো ব্যাপারটা খুলে বলল।

"এই কথা ?" শুনে বলল মহেশ। "খাটের তলায় আছে পেতলের ঘটি ?"

"হ্যাঁ, দাদা ! তুমি আনতে পারলে তিনের দুই ভাগ তোমার। এক ভাগ আমার।"

"তা বেশ," বলল মহেশ। "পরশু অমাবস্যা। পরশু যাব।"

মহেশের মতো চতুর চোর এ-তল্লাটে আর কেউ ছিল না। সে যে কতবার পেয়াদার চোখে ধুলো দিয়েছে তার হিসেব নেই। অমাবস্যার রাতে সিঁদকাঠি নিয়ে বৈকুণ্ঠগ্রামে গঙ্গারামের বাড়িতে এসে সে কাজ শুরু করে দিল। নিশুতি রাত, ফাল্গুন মাস, কিন্তু শীত এখনও পুরোপুরি যায়নি। মহেশ এসে পৌঁছেছে রাত তিনটেয়, যখন লোকের ঘুম হয় সবচেয়ে গভীর। এসেই প্রায় শব্দ না করে সে সিঁদ কাটতে শুরু করে দিয়েছে।

কিন্তু তাকে বেশিদূর এগোতে হল না। দু'দিন হল বৃষ্টি হয়ে গেছে, শীতকালের লম্বা ঘুম ভাঙা এক কালসাপ ছিল কাছাকাছির মধ্যে, সেটা নিঃশব্দে এসে মহেশের গোড়ালিতে মারল একটা ছোবল। মহেশের হাত থেকে সিঁদকাঠি পড়ে গেল, আর দু'মিনিটের মধ্যে তার নিষ্প্রাণ দেহ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

পরদিন সকালে গঙ্গারামই দেখল প্রথমে চোরের মৃতদেহ। সে বুঝল কী হয়েছে, কিন্তু তার বাড়িতে চোর সিঁদ কাটতে আসবে কেন সেটা সে বুঝল না।

এদিকে মহেশের কী দশা হয়েছে সেটা রঘুনাথ জানতে পেরেছে। সে বুঝল তার পিস্‌তুতো ভাইয়ের কী আশ্চর্য কপাল। এইভাবে চুরি করে ত তার কাছ থেকে টাকা আদায় করা যাবে না। অন্য কী পন্থা নেওয়া যায় সেই নিয়ে সে ভাবতে বসল।

এদিকে গঙ্গারামের যে কপাল খুলেছে তার আরো প্রমাণ পাওয়া গেছে। তার মামার বাত আপনা থেকেই অনেকটা ভাল হয়ে গেছে ; মামার মেজাজটা ছিল খিটখিটে, আজকাল সেটাও বদলে গিয়ে অনেক নরম হয়ে গেছে। মামা বলছে গঙ্গারামের জন্য এবার একটা পাত্রী খুঁজতে হবে। গঙ্গারাম এটাকেও কপাল ফেরার লক্ষণ বলে মনে করে, কারণ বিয়েতে তার আপত্তি নেই। বেশ একজন সুখ দুঃখের সাথী হবে, ঘরকন্নার কাজ করার লোক হবে, আর সে মেয়ে যদি ফুটফুটে হয় তা হলে ত কথাই নেই। ফুল যেমন সুন্দর, সকাল-সন্ধ্যার আকাশ যেমন সুন্দর, পাখির ডাক যেমন সুন্দর, তেমনি তার বউও সুন্দর হয় এটা গঙ্গারাম চায়।

এই সময় একদিন এক হাটবারে হাটে ঢ্যাঁড়া শোনা গেল। বৈকুণ্ঠগ্রাম থেকে সাত ক্রোশ দূরে কনকপুর শহর, সেই শহর থেকে ঢ্যাঁড়া দিতে এসেছে। ঘোষণাটা এই—

কনকপুরের রাজকন্যার একটা সাতশিরা পাথর ছিল, সেটা একটা বাঁদর রাজবাড়ির অন্দরমহলে ঢুকে নিয়ে যায়। সেই থেকে রাজবাড়িতে নানান দুর্ঘটনা ঘটেছে। রাজকন্যার মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে, তার শরীর শুকিয়ে যাচ্ছে। এই সাতশিরা পাথরে রামধনুর সাতটা রঙই শিরায় শিরায় ফুটে বেরোয়। সে পাথর যদি কারও কাছে থেকে থাকে তা হলে সেটা ফেরত দিলে রাজা সে-লোককে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দেবে।

গঙ্গারাম শুনল ঘোষণাটা, তারপর একটা গাছের আড়ালে গিয়ে ট্যাঁক থেকে পাথরটা বার করে দেখল সেটার দিকে মন দিয়ে। হ্যাঁ, এতেও ত শিরায় শিরায় সাতটা রঙই দেখা যায়। এই কি তা হলে সাতশিরা পাথর ?

গঙ্গারাম মনে মনে ঠিক করল সে কনকপুর যাবে, আর গিয়ে রাজাকে জিজ্ঞেস করবে এই পাথরই সেই পাথর কি না। যদি তাই হয় তা হলে সে পাথরটা ফেরত দিয়ে দেবে। সেটা তার সাধের জিনিস সন্দেহ নেই, কিন্তু রাজকুমারীর অবস্থা শুনে তার মনে আঘাত লেগেছে। কারও দুঃখ গঙ্গারাম সইতে পারে না। সে দুঃখ দূর করার ক্ষমতা যদি তার থাকে তা হলে সে নিশ্চয়ই তা করবে।

এদিকে কেষ্টপুরেও এই একই ঢ্যাঁড়া পড়েছে, একই ঘোষণা হয়েছে, আর সেটা শুনেছে রঘুনাথ। তার মন বলল তার পিস্‌তুতো ভাইটা যা বোকা, সে নিশ্চয়ই পাথর ফেরত দিতে কনকপুর যাবে। সে নিজে কনকপুরের রাস্তায়

ঝোপের পিছনে লুকিয়ে থাকবে, আর ভাই এলেই তাকে ঘায়েল করে তার কাছ থেকে পাথরটা নিয়ে নেবে। নিয়ে সেটা সে নিজের কাছেই রাখবে, রাজাকে ফেরত দেবে না।

গঙ্গারাম পরদিন সক্কাল সক্কাল চাদরের খুঁটে মুড়ি বাতাসা বেঁধে নিয়ে দুগ্গা বলে কনকপুর রওনা দিল।

তিন ক্রোশ পথ যাবার কিছু পরে একটা বনের পাশ দিয়ে যাবার সময় একটা ঝোপের পিছন থেকে বেরিয়ে রঘুনাথ হাতে বাঁশের লাঠি নিয়ে ধেয়ে এল গঙ্গারামের দিকে। গঙ্গারাম কিছুই টের পায়নি, কারণ তার পিছন দিক দিয়ে নিঃশব্দে এসেছিল রঘুনাথ। কিন্তু হলে কী হবে? গঙ্গারামের ট্যাঁকে সাতশিরা পাথর। সে লাঠি তার মাথায় পড়তেই সেটা শোলার মতো মট করে ভেঙে গেল। কাণ্ড দেখে রঘুনাথ দিল চম্পট, কারণ সে জানে গঙ্গারামের সঙ্গে খালি হাতে সে পেরে উঠবে না।

কনকপুর পৌঁছাতে গঙ্গারামের দুপুর পেরিয়ে গেল। রাজবাড়িটা অনেক দূর থেকেই দেখা যায়। সে সটান চলে গেল ফটকের সামনে। সেখানে প্রহরী তাকে রুখতে সে বলল, "আমি রাজকন্যার জন্য সাতশিরা পাথর এনেছি।"

প্রহরী পাথরটা দেখতে চাইলে গঙ্গারাম ট্যাঁক থেকে বার করে দেখাল। তাতে প্রহরী শুধু তার পথই ছেড়ে দিল না, আরেকজন প্রহরীকে বলে রাজার সঙ্গে দেখা করতে পাঠিয়ে দিল।

রাজা রাজসভায় যাননি, মন্ত্রীই রাজকার্য চালাচ্ছেন, রাজা মনের দুঃখে অন্দরমহলে শয্যা নিয়েছেন।

গঙ্গারাম রাজার কাছে গিয়ে তাঁকে গড় করে বলল, "মহারাজ, আমি একটা পাথর এনেছি, সেটা সাতশিরা কি না যদি আপনি দেখে নেন।"

রাজা উঠে বসলেন, তাঁর চোখে আশার ঝিলিক।

"কই, দেখি তোমার পাথর।"

গঙ্গারাম দেখাল।

রাজার দৃষ্টি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। "এই তো সেই পাথর!" বলে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি।

তারপর রাজা গঙ্গারামের দিকে চেয়ে বললেন, "তুমি দাঁড়াও। তোমার পাওনা পুরস্কারটা তোমাকে দিই ; আর তোমার সঙ্গে লোক দিয়ে দিচ্ছি, সে তোমাকে ঘোড়ায় করে তোমার গ্রামে পৌঁছে দেবে। এ-টাকা সঙ্গে নিয়ে হেঁটে যাওয়া নিরাপদ নয়।"

কোষাগার থেকে একজন কর্মচারী একটা মখমলের থলিতে এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা এনে গঙ্গারামকে দিল। গঙ্গারাম থলি খুলেই বলল, "আরে, এ জিনিস ত আমার অনেক আছে—এর চেয়ে বেশি আছে। খেতে চাষ করতে গিয়ে মাটির তলা থেকে পেয়েছি। এ জিনিস আর আমার লাগবে না, যথেষ্ট আছে।"

রাজা ত অবাক। এমন কথা তিনি কখনও শোনেননি। তিনি বললেন, "এটা তোমার পুরস্কার, তোমার পাওনা। তোমায় নিতেই হবে।"

"তবে দিন। আপনি যখন এত করে বলছেন তখন না বলব না। কিন্তু একটা কথা বলার ছিল, রাজামশাই।"

"কী কথা"

"যাকে এনে দিলাম সাতশিরা পাথর, সেই রাজকন্যাকে বড় দেখতে ইচ্ছা করছে। আমি কোনোদিন রাজকন্যা দেখিনি।"

রাজা চোখ কপালে তুলে বললেন, "এ কেমন কথা বললে তুমি! রাজকন্যাকে দেখা কি মুখের কথা? সে থাকে তার নিজের ঘরে ; তার বিয়ের কথা হচ্ছে। সে ত আর খুকি নয়!"

"সে ত আমারও বিয়ের কথা হচ্ছে, রাজামশাই," বলল গঙ্গারাম। "আমি বলি দেখতে দোষটা কী? একবার দেখেই আমি চলে যাব।"

এমন সময় সকলকে অবাক করে দিয়ে রাজার ঘরের পর্দা সরিয়ে এক পরমা সুন্দরী মেয়ে এসে ঘরে ঢুকল।

"এ কী সুনয়না!" রাজা অবাক হয়ে বলে উঠলেন।

"যে আমার পাথর এনে দিয়েছে তাকে একবার দেখতে ইচ্ছা হল," বলল রাজকন্যা সুনয়না। "এই পাথর যে হাতছাড়া করতে পারে সে ত যেমন তেমন লোক নয়। এমন পয়া পাথর ত আর হয় না। এতে মানুষের ভাগ্য ফিরে যায়।"

গঙ্গারাম অবাক হয়ে রাজকন্যার দিকে চেয়ে বলল, "এ কথা বোধহয় ঠিকই, কারণ এটা পাবার পর থেকেই আমার মতো গরিবের কপালও খুলে গিয়েছিল। এখন যখন পাথরটা চলে গেল—"

"তখন আবার যেইকে সেই হয়ে যাবে তুমি," বলল রাজকন্যা। "আমি এ পাথর ফেরত চাইনি, বাবাই জোর করে ঘোষণা করেছিলেন। আমাদের সত্যি করে কোনো অভাব নেই, অভাব তো তোমারই।"

"অভাবের মধ্যেই ত মানুষ হয়েছি," বলল গঙ্গারাম, "তাই অভাবের অভাবটা যে কী তা জানিই না। তবে একটা কথা বলতে পারি— এই পাথর আমাকে অনেক স্বর্ণমুদ্রা এনে দিয়েছে। অ্যাদ্দিন বুঝতে পারিনি, আজ বুঝলাম। আমার মনে হয় বাকি জীবনটা তাতে স্বচ্ছন্দে চলে যাবে। আমার আর কোনো পাথরের দরকার নেই। ওটা তোমার জিনিস ছিল, তোমার কাছেই থাক।"

"কিন্তু একটা কথা বলি, এই পাথরের গুণে পাওয়া স্বর্ণমুদ্রা এই পাথর চলে গেলে আর নাও থাকতে পারে। তখন তুমি কী করবে?"

"পাথর পাওয়ার আগে যেমনভাবে চলছিল তেমন ভাবেই চলবে।"

"তা কেন? পাথর তো দুজনের কাছেই থাকতে পারে," সকলকে অবাক করে দিয়ে বলল রাজকন্যা।

"এটা ঠিক বলেছ," বলল গঙ্গারাম, "যদি তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয় তা হলেই ত দুজনের কাছে থাকবে পাথর।"

রাজাকে এবার বাধ্য হয়ে কথা বলতে হল। তিনি গঙ্গারামের দিকে চেয়ে বললেন, "সব ত বুঝলাম। কিন্তু আমি ত আর বেশিদিন নেই, আর আমার কোনও ছেলেও নেই। আমি না থাকলে তুমি রাজকার্য চালাতে পারবে?"

গঙ্গারাম বলল, "অ্যাদ্দিন খেতে লাঙল চালালাম, এখন না হয় রাজ্য চালাব। ফসল ফলানোও ত সহজ কাজ নয়। তাতে অনেক বুদ্ধি লাগে, অনেক পরিশ্রম লাগে। আর রাজকার্যের অর্ধেক কাজ ত করে মন্ত্রী, আপনি আর একা কত করেন রাজামশাই?"

"সে কথা ঠিকই," বললেন রাজামশাই।

"তবে কোনো ভাবনা নেই," বলল গঙ্গারাম। তারপর বলল, "তা হলে এবার চলি। আপনি এদিকে তোড়জোড় করুন, দিনক্ষণ দেখুন। আমার মামাকে আবার খবরটা দিতে হবে।....চলি রাজকন্যা, আবার পরে দেখা হবে। ভাল কথা—আমার নাম গঙ্গারাম।"

দরজার পাশ থেকে রাজকন্যা একটা খুশির হাসি হেসে পর্দা ফেলে দিয়ে চলে গেল।

*

বাড়ি ফিরে এসেই চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে গঙ্গারাম পাথরের অভাবটা হাড়ে হাড়ে টের পেল। মামার বাতটাও শুনল বেড়েছে। আর সবচেয়ে যেটা অবাক কাণ্ড—খাটের তলা থেকে কলসি বার করে দেখল তার ভিতর রয়েছে শুধু মাটি।

কিন্তু এর কোনোটাই সে গ্রাহ্য করল না, কারণ যা হতে চলেছে, তাতে তার কপাল মন্দ এটা আর বলা চলে না।

শুরু হল **কাকাবাবু ও সন্তুকে** নিয়ে ধারাবাহিক অ্যাডভেঞ্চার-উপন্যাস

নীলমূর্তি রহস্য

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

দুপুরবেলা হঠাৎ কলেজ ছুটি হয়ে গেল। একজন প্রোফেসর পদ্মশ্রী খেতাব পেয়েছেন, সেইজন্য। বাইরে ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে, কিছু ছেলেমেয়ে সেই বৃষ্টির মধ্যেই বেরিয়ে পড়ল। সন্তু কলেজের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছে বৃষ্টিতে ভিজবে কি ভিজবে না, এই সময় তার বন্ধু জোজো তার পিঠে হাত দিয়ে বলল, "চল্ সন্তু, কোথাও ট্রেনে করে ঘুরে আসি।"

জোজো সন্তুদেরই পাড়ায় থাকে, প্রায়ই ওরা একসঙ্গে কলেজ থেকে বাড়ি ফেরে। জোজো একেবারে গুল ঝাড়বার রাজা। ওর কথা শুনলে মনে হবে, পৃথিবীর সমস্ত বড়-বড় লোক ওর বাবা-মা'কে চেনে। ফিডেল কাস্ট্রো ওদের বাড়িতে নেমন্তন্ন খেয়ে গেছেন, ইন্দিরা গান্ধী এক সময় ওদের মুর্শিদাবাদের বাড়িতে কিছুদিন লুকিয়ে ছিলেন, বাংলাদেশ-যুদ্ধের সময় জোজোর বাবাই তো আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে টেলিফোন করে বলেছিলেন, 'খবর্দার, বঙ্গোপসাগরে সেভেনথ ফ্লিট পাঠাবেন না, তা হলে আপনার প্রেসিডেন্টগিরি ঘুচে যাবে!' জোজোর বাবা শিবচন্দ্র সেনশর্মাকে সবাই এত মানে কারণ তিনি একজন নাম-করা জ্যোতিষী। এমনকী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচারও নাকি আগের ইলেকশানের সময় ওর বাবার কাছ থেকে মন্ত্রঃপূত আংটি নিয়েছিলেন।

সন্তু জোজোর এই সব গল্প বিনাপ্রতিবাদে শুনে যায়। তার ভালই লাগে। জোজো সব সময় প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, সন্তুর কাকাবাবুর চেয়ে তার বাবা অনেক বেশি বিখ্যাত। সন্তুর কোনও অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী কাগজে বেরোলেই জোজো এসে বলবে, 'আরে তুই তো মোটে নেপালে গিয়েছিলি! বাবা আমাকে গত মাসে কোথায় নিয়ে গিয়েছিলেন জানিস? সাইবেরিয়ায়! কেন জানিস? না, সেটা বলা চলবে না। ভীষণ সিক্রেট, স্টেট সিক্রেট যাকে বলে, ফাঁস হয়ে গেলেই আমার ফাঁসি হবে।'

জোজোর ট্রেনে করে ঘুরে আসার প্রস্তাব শুনে সন্তু বলল, "কোথায় যাব? দিল্লি? বোম্বে?"

জোজো কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "ধুত্, ওসব জায়গায় তো কতবার গেছি! নিউ ইয়র্ক, মস্কো, হেলসিংকি দেখার পর কি আর দিল্লি-বোম্বে ভাল লাগে? এইসব বৃষ্টির দিনে যেতে হয় কোনও নতুন জায়গায়; মনে কর, কোনও গ্রামের মধ্যে ছোট্ট একটা স্টেশান, চারদিকে সবুজ গাছপালা, একটা ছোট্ট নদী বয়ে যাচ্ছে। একটাই দোকান আছে সেই গ্রামে। সেই দোকানে বসে তেলে-ভাজা, মুড়ি আর চা খাওয়া, কী রকম দারুণ না?"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ, শুনতে বেশ ভাল লাগছে। কিন্তু ট্রেনে যে চাপব, পয়সা পাব কোথায়? পকেট তো ঢনঢন!"

জোজো এমনভাবে হাসল, যেন সন্তুটা একেবারে ছেলেমানুষ, কিছুই বোঝে না। সে ঠোঁট উল্টে বলল, "বেড়াতে আবার পয়সা লাগে নাকি? তুই আমার সঙ্গে আছিস না? শিয়ালদা স্টেশানের স্টেশানমাস্টার আমার আপন মামা, আর হাওড়ার স্টেশানমাস্টার আমার পিসেমশাই। তুই ইন্ডিয়ার কোথায় যেতে চাস বল না! এক্ষুনি বিনা পয়সায় নিয়ে যেতে পারি।"

সন্তু মিনমিন করে বলল, "স্টেশানমাস্টার আত্মীয় হলেই বুঝি ট্রেনে বিনা পয়সায় চাপা যায়? অন্য স্টেশানে ধরবে না?"

জোজো বলল, "তুই টেস্ট করে দেখতে চাস? চল্, শিয়ালদায় চল, আমি তোকে হাতে-হাতে প্রমাণ করে দিচ্ছি। টিকিট চাইবে কী রে? আমাদের জন্য আলাদা কম্পার্টমেন্ট, স্যালুন কাকে বলে জানিস, তাই জুড়ে দেবে। আমরা যেখানে বলব সেখানে থামবে।"

সন্তু বলল, "ঠিক আছে, পরে কোনওদিন তোর সঙ্গে ওইভাবে বেড়াতে যাব, এখন বাড়ি চলি।"

জোজো অবাক হয়ে ভুরু তুলে বলল, "এর মধ্যে বাড়ি যাবি? আজ তো আমাদের সাড়ে চারটে পর্যন্ত ক্লাস হবার কথা ছিল। এখন মোটে একটা-দশ বাজে। এতখানি সময়, আমরা অনায়াসেই কোনও জায়গা থেকে ঘুরে আসতে পারি।"

সন্তু বলল, "এই কয়েক ঘন্টায় ট্রেনে চেপে কোথা থেকে ঘুরে আসব?"

জোজো বলল, "কেন, ডায়মণ্ডহারবার, বনগাঁ, চন্দননগর, উলুবেড়িয়ার যে কোনও জায়গায় যাওয়া যেতে পারে। ফিরতে বড়জোর সন্ধে হবে।"

সন্তু ততক্ষণে ঠিক করে ফেলেছে, জোজোর পাল্লায় পড়া মোটেই বুদ্ধির কাজ হবে না। ডায়মণ্ডহারবার বা ওইসব জায়গায় যেতে-আসতেই তিন চার ঘণ্টা লেগে যাবে। বাড়িতে কোনও খবর না দিয়ে শুধু-শুধু এরকম ঘুরতে যাওয়ার কোনও মানে হয় না।"

জোজো হঠাৎ যেন কিছু একটা আবিষ্কার করার মতন আনন্দে চেঁচিয়ে উঠে বলল, "সোনারপুর মনে পড়েছে দ্যাট'স ইট চল্, সোনারপুর ঘুরে আসি। তোকে সিংহ দেখাব

সন্তু আর না হেসে পারল না। সোনারপুর জায়গাটার নাম সে শুনেছে, সে জায়গাটা আফ্রিকায় নয়, চব্বিশ পরগনায় সেখানে সিংহ ?

সন্তুর অবিশ্বাসী দৃষ্টি অগ্রাহ্য করে জোজো বলল, "তুই তো ইজিপ্টে গিয়ে উটের পিঠে চেপেছিস, তাই না ? হাতির পিঠে চেপেছিস কখনও বল্, সত্যি করে বল্

সন্তু স্বীকার করতে বাধ্য হল যে, সে কখনও হাতির পিঠে চাপেনি।

জোজো বলল, "সোনারপুরে তোকে আমি হাতির পিঠে চাপাব। আমি তোর পাশে-পাশে উটে চেপে যাব। সুন্দরবন পর্যন্ত ঘুরে আসব

সোনারপুরে সিংহ শুধু নয়, উট, হাতি উঃ, সত্যি, জোজোকে নিয়ে আর পারা যায় না গুলেরও তো একটা সীমা থাকা উচিত সন্তু কাকাবাবুর সঙ্গে সুন্দরবন ঘুরে এসেছে, ওই সোনারপুরের পাশ দিয়েই যেতে হয়েছিল। সোনারপুর তো দূরের কথা, গোটা সুন্দরবনেই একটাও হাতি নেই। উট আর সিংহ থাকার কথা তো কল্পনাও করা যায় না

এই সময় ওদের আর-এক বন্ধু অরিন্দম পিছন থেকে এসে বলল, "এই, গেটের সামনে দাঁড়িয়ে কী গ্যাঁজাল্লি করছিস বাড়ি যাবি না এরপর রাস্তায় জল জমে ট্রাম-বাস বন্ধ হয়ে যাবে

সন্তু বলল, "অরিন্দম, তুই সোনারপুর জায়গাটার নাম শুনেছিস

অরিন্দম বলল, "কেন শুনব না এই তো শিয়ালদা লাইনে, বোধহয় চার-পাঁচটা স্টেশন আমি ওই স্টেশান দিয়ে পাস করেছি অনেকবার।"

"সোনারপুরে জঙ্গল আছে

"জঙ্গল মানুষ থিকথিক করছে ওই স্টেশান থেকে মতরাজ্যের তরকারিওয়ালারা ওঠে তবে দু-চারটে বাগানবাড়ি আছে শুনেছি।"

"জোজো বলছে, ওই সোনারপুরে নাকি বাঘ-সিংহ, হাতি-উট-গণ্ডার ঘুরে বেড়ায়

অরিন্দম হা-হা করে হেসে উঠে বলল, "ওফ্ জোজো, দিস ইজ টু মাচ তুই সন্তুকে ভালমানুষ পেয়ে আর কত গুল ঝাড়বি অ্যাঁ ?"

জোজো গম্ভীরভাবে বলল, "আমি বাঘ কিংবা গণ্ডারের কথা বলিনি। সন্তু বাড়াচ্ছে। কিন্তু যদি সিংহ দেখাতে পারি

অরিন্দম বলল, "আফ্রিকার কোনও রাজা বুঝি তোর বাবাকে সিংহ প্রেজেন্ট করেছেন ? তুই মাঝে-মাঝে সিংহ নিয়ে মর্নিং ওয়াক করতে যাস ?"

সন্তু বলল, "শুধু সিংহ নয়, জোজো বলছে, সোনারপুরে গেলে ও আমাদের হাতি কিংবা উটের পিঠে চাপাতে পারে।"

অরিন্দম বলল, "জোজো, তুই শুধু-শুধু কেন এই পচা কলেজে পড়ে আছিস ? তুই ওয়ার্ল্ড গুল কমপিটিশানে নাম দে। নির্ঘাত ফার্স্ট হয়ে যাবি। তারপর গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে তোর নাম উঠে যাবে।"

জোজো গম্ভীরভাবে ডান হাতের পাঞ্জাটা বাড়িয়ে বলল, "কত বেট ?"

অরিন্দম বলল, "কিসের বেট তুই ওয়ার্ল্ড গুল কমপিটিশানে ফার্স্ট হবি কি না ? নিশ্চয়ই হবি

জোজো বলল, "সে-কথা বলছি না। আমি যদি এখন থেকে ঠিক দু' ঘণ্টার মধ্যে তোদের হাতির পিঠে চাপাতে পারি, তা হলে কত টাকা বাজি হারবি ?"

অরিন্দম জোজোর থুতনি ধরে নেড়ে দিয়ে বলল, "আহা রে, চাঁদু ! আমাদের বোকা পেয়েছিস ? চিড়িয়াখানায় গেলেই তো হাতির পিঠে চাপা যায়।"

জোজো মিটিমিটি হেসে বলল, "চিড়িয়াখানায় নয়

অরিন্দম বলল, "তা হলে কোনও সার্কাসের হাতি

জোজো একইভাবে বলল, "সার্কাসেরও নয়।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "আর উট, আর সিংহ ?"

জোজো বলল, "হ্যাঁ, সিংহও দেখাব। উটও দেখাব।"

অরিন্দম জিজ্ঞেস করল, "তুই সার্কাসের জানোয়ার দেখিয়ে আমাদের ঠকাবি না ?"

জোজো বলল, "কোন্ সার্কাসে সিংহ থাকে রে ? তা ছাড়া বলছি তো, সার্কাসের কোশ্চেনই উঠছে না।"

অরিন্দম বলল, "তুই এই সবগুলো একসঙ্গে আমাদের দেখাবি ? তা হলে দশ টাকা বাজি

জোজো বলল, "ডান্ ! তা হলে চল, এক্ষুনি স্টার্ট করি।"

বৃষ্টি বেশ জোর হয়েছে এখন। এর মধ্যে ট্রামে-বাসে উঠতে গেলেও ভিজে যেতে হবে। তবু তিনজনে দৌড় লাগাল। বাস স্টপে এসেই পেয়ে গেল একটা শিয়ালদার বাস।

বাসে উঠে জোজো অরিন্দমকে বলল, "তুই আমাদের তিনজনের টিকিটটা কেটে ফ্যাল তো

অরিন্দম বলল, "বাজির দশ টাকা থেকে এই বাসভাড়ার পয়সাগুলো কাটা যাবে।"

সন্তু বলল, "কাটা যাবে কী রে, যোগ হবে বল্। জিতব তো আমরাই।"

জোজো বলল, "দ্যাখ না কী হয় !"

বাসে ভিড় বেশি নেই। ওরা আরাম করে বসল। সন্তু আর অরিন্দম পাশাপাশি, জোজো অন্য দিকে। এর মধ্যেই ওরা দুটো পার্টি হয়ে গেছে।

সন্তু আর অরিন্দম পরে আছে প্যান্ট আর শার্ট। জোজোর গায়ে একটা মেরুন রঙের গেঞ্জি, তাতে সাদা অক্ষরে লেখা 'ভিকট্রি'। ওই গেঞ্জিটা নাকি ব্রাজিল থেকে পেলে পাঠিয়েছে জোজোকে। জোজোর বাবার পাঠানো ফুল আর বেলপাতা পকেটে নিয়ে পেলে সব সময় খেলতে নামত।

জোজোর চেহারাটা সুন্দর, ওই গেঞ্জিটায় তাকে সুন্দর মানিয়েছে।

সন্তু ফিসফিস করে অরিন্দমকে বলল, "আমরা তো যাচ্ছি ওর সঙ্গে। কিন্তু জোজোর কাছ থেকে বাজির টাকা আদায় করতে পারবি ?"

অরিন্দম বলল, "আমি ঠিক আদায় করে ছাড়ব। এর আগে তো কেউ জোজোর কথা চ্যালেঞ্জ করেনি ?"

জোজো তাকিয়ে আছে জানলা দিয়ে। হঠাৎ সে একটা চলন্ত গাড়ি দেখে মুখ বাড়িয়ে হাসল, হাতছানি দিল।

তারপর বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কে গেল জানিস ?"

অরিন্দম বলল, "কী করে জানব ?"

হাসি-ঝলমলে মুখে জোজো বলল, "কপিলদেব ! আমার বাবার সঙ্গেই দেখা করতে যাচ্ছে। জানতুম, আসতেই হবে। এবারে অস্ট্রেলিয়া যাবার আগে বাবার সঙ্গে দেখা করে যেতে ভুলে গেছে, তাই তো এই কাণ্ড !"

অরিন্দম বলল, "চুপ, একটু আস্তে বল্। সবাই শুনতে পাবে।"

জোজো বলল, "তোরা বিশ্বাস করছিস না ?"

অরিন্দম বলল, "আচ্ছা জোজো, তোর বাবা পরীক্ষা পাশ করার কোনও মাদুলি-টাদুলি দেন ?"

জোজো সঙ্গে-সঙ্গে বলল, "না। ওইটা কক্ষনো দেন না। তা হলে আমিই তো সব পরীক্ষায় ফার্স্ট হতাম !"

সন্তু মনে-মনে স্বীকার করল জোজোটার বুদ্ধি আছে। অরিন্দমের প্রশ্ন করার আসল উদ্দেশ্যটা ঠিক সঙ্গে-সঙ্গে বুঝে ফেলেছে।

একটু বাদেই ওরা পৌঁছে গেল শিয়ালদায়। স্টেশানের মধ্যে ঢুকে অরিন্দম টিকিট কাউন্টারের দিকে এগোতে যাচ্ছে, সন্তু তার হাত টেনে ধরে বলল, "ওদিকে যাচ্ছিস কী রে ! আমাদের তো টিকিট লাগবে না। আমরা যাব স্পেশ্যাল কম্পার্টমেন্টে !"

জোজো বলল, "চল্, আগে বড়মামার সঙ্গে দেখা করে আসি।"

'স্টেশানমাস্টার' লেখা একটা ঘরের সামনে এসে সে বন্ধুদের বলল, "তোরা এখানে দাঁড়া, আমি এক্ষুনি ব্যবস্থা করে ফেলছি।"

দরজার বাইরে একজন বেয়ারা বসে আছে টুলে। তাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই জোজো দরজা ঠেলে ঢুকে গেল ভেতরে। বেয়ারাটি হা-হা করে তেড়ে গেল তার পিছনে।

জোজো কিন্তু তক্ষুনি বেরিয়ে এল না। মিনিট পাঁচেক সময় লাগাল। তারপর বেরিয়ে এল হাসতে-হাসতে।

সন্তু ভাবল, তা হলে সত্যিই কি জোজোর এত চেনাশুনো ?

জোজো কাছে এসে বলল, "একটা মজার ব্যাপার হয়েছে রে। আমার বড়মামাকে প্রাইম মিনিস্টার কী জন্য যেন ডেকেছেন। উনি তো দিল্লি চলে গেছেন কাল।"

অরিন্দম বলল, "তুই যখন দরজা ঠেলে ঢুকলি, তখন দেখলুম যে, ওদিকে চেয়ারে একজন বসে আছেন !"

জোজো বলল, "হ্যাঁ, উনি তো এখন অ্যাকটিং। ওঁকেও আমি খুব ভাল চিনি। উনি কী বললেন জানিস ? আমাদের সোনারপুর যাওয়ার কথাটা উড়িয়েই দিলেন। উনি একটু বাদেই একটা ইন্সপেকশানে দমদম যাবেন, আমাদেরও সেইসঙ্গে যেতে বললেন। যাবি দমদম ?"

অরিন্দম জিজ্ঞেস করল, "দমদমেও সিংহ আছে নাকি ?"

জোজো বলল, "দমদম গেলে আমি তোদের ভাল চমচম খাওয়াতে পারি। একটা দোকানে চেনা আছে।"

অরিন্দম বলল, "কোথায় সিংহ আর কোথায় চমচম। আমি ভাই সিংহ দেখব বলে বাজি ফেলেছি।"

সন্তু বলল, "আমিও ভাই সিংহ দেখার জন্য এসেছি।"

জোজো এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল, "ঠিক আছে। তা হলে সোনারপুরেই যাওয়া যাক। এইটুকু তো মোটে রাস্তা, কতই বা টিকিটের দাম হবে। তোদের কাছে কত টাকা আছে রে ?"

সন্তু অরিন্দমের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমরা অবশ্য বিনা পয়সায় ট্রেনে যাওয়া নিয়ে কোনও বাজি ফেলিনি।"

অরিন্দম বলল, "স্টেশানমাস্টার প্রাইম মিনিস্টার না রেল মিনিস্টার কার কাছে যাবে, সে-বিষয়েও আমাদের তর্ক তোলা উচিত নয়।"

সন্তু বলল, "আমরা সোনারপুরে সিংহ দেখতে চাই।"

অরিন্দম বলল, "দ্যাটস্ রাইট। তার সঙ্গে হাতি প্লাস উট।"

সন্তুর কাছে দু' টাকা আছে। অরিন্দমের কাছে একটা পাঁচ টাকার নোট। জোজো বলল, "দে, দে, ওতেই হয়ে যাবে।"

অরিন্দম বলল, "ফেরার ভাড়া রাখতে হবে।"

জোজো বলল, "ফেরার জন্য চিন্তা করিস না। ওখানে আমার ছোট মেসোমশাই থাকেন, তাঁর গাড়িতে ফিরে আসব।"

বহু দূর দুর্গম জায়গা ঘুরে এলেও সন্তুর এই সামান্য দূরের একটা জায়গায় ট্রেনে করে যাওয়ার চিন্তায় বেশ উত্তেজনা হচ্ছে। দেখাই যাক না জোজোর গুলের দৌড় কতদূর যায়।

টিকিট কাটার পর প্ল্যাটফর্ম খুঁজে-খুঁজে ওরা সোনারপুর লোকাল দেখতে পেল। দুপুরবেলার ট্রেন, একেবারে ফাঁকা।

ট্রেনটা ছাড়ার পর সবেমাত্র একটু দূর গেছে, এমন সময় জোজো জিভ কেটে বলে উঠল, "এই রে, এতক্ষণে মনে পড়েছে ! জায়গাটা তো সোনারপুর নয়। আমরা ভুল ট্রেনে চেপেছি।"

(ক্রমশ)

ছবি : অনুপ রায়

মার্ডার কেস

আশাপূর্ণা দেবী

সেই কোন্ কাল থেকে ট্যাঁপার মনে একটি বাসনা—হাতে কিছু পয়সা হলে ট্যাঁপারা দুই বন্ধু নগদ এক-এক টাকার বাদামভাজার ঠোঙা কোলে করে একটি গদিদার রিকশায় চেপে বসে কলকাতা ভ্রমণ করবে।

ইচ্ছেমতন চারদিকে বাদামের খোলা ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলবে, আর মধ্যে-মধ্যে রিকশা থামিয়ে-থামিয়ে ফুচকা খাবে, চায়ের দোকান থেকে চা খাবে, ডাবওলা দেখতে পেলে রিকশা থামিয়ে ডাবের মুখ কাটিয়ে খড় দিয়ে চুষে চুষে ডাবের জলটুকু শুষে বার করে নেবে।

শহর কলকাতার মধ্যে তো আর সাইকেল-রিকশার চলন নেই, সবই মানুষ-টানা, কাজেই মাঝে-মাঝে তো বদলাতেও হবে রিকশা। তখনই এক-একবার কিছু খেয়ে নেওয়া যাবে।

সাধটা প্রধানত ট্যাঁপার হলেও মদনাও অরাজি ছিল না এই পরিকল্পনায়। তা তখন তাদের কাছে এই পরিকল্পনাটি তো প্রায় পরির কল্পনা। তখন তো ট্যাঁপা-মদনাকে পঁচিশ পয়সার বাদামভাজা দু'জনায় ভাগ করে খেতে হত। আর তাই হত বলে, বাদামভাজাওলাটার কাছ থেকে দু'জনে আলাদা আলাদা করে নুনলঙ্কার গুঁড়ো চেয়ে নিয়ে-নিয়ে সংগ্রহ করত, যাতে বাদাম ফুরিয়ে গেলে, ওই 'ঝালনুন' নামের মনোহর জিনিসটি একটু-একটু চেটে চেটে আরও কিছুক্ষণ জিভটা তাজা রাখা যাবে।

তা তখন আর এ ছাড়া কী হবে ? তখন তো 'আয়'-এর মধ্যে গজ-উকিলের বাড়ির বিনিমাইনের চাকরিতে শুধু হাত-খরচা বাবদ দু' বন্ধুর মিলিয়ে দৈনিক চার আনা পয়সা।

তাই দিয়ে যা করতে পারো করো।

গজ-উকিল বলেছিলেন, "বে-খাটুনির চাকরি, দু'বেলা ক'ঘন্টা বসে-বসে শুধু দাবা-খেলা দেখা। তার বদলে দু'বেলা আশ মিটিয়ে পেটপুরে চর্বচোষ্য খেতে পাচ্ছিস। মাইনে কী জন্যে? অ্যাঁ? মাইনে আবার কী? খাবার জন্যেই তো টাকার দরকার? তো খেতেই যখন পাচ্ছিস, তখন আর কী? তবে হ্যাঁ, 'কাঁচির কারবারটি' আর নয়। নাকে-কানে খত দিয়ে ছেড়েছ, মনে আছে তো?"

কিন্তু ট্যাঁপা আর মদনা নামের দুটো মুখ্যুসুখ্যু ছেলে হঠাৎ গজ-উকিলের প্যাঁচে পড়ে গেছিল কেন?

সে অনেক কথা: বিশদ বলতে বসলে মহাভারত।

ছেলে দুটো আচমকা একটা ফেরে পড়ে গিয়ে 'গজ-উকিলের হত্যা-রহস্য' ভেদ করে ফেলেই পড়ে গেল 'নিহত' গজ-উকিলের গাড্ডায়। তারপর ...যাক গে, বললাম তো সে অনেক কথা। মোটের মাথায় গজ-উকিল বলেছিলেন, 'তোদের এমন ব্রেন, সেটাকে অপচয় করছিস লোকের পকেট কেটে বেড়িয়ে! ইশ, এমন ব্রেন নিয়ে দাবা-খেলাটা শিখে ফেলতে পারলে, দেশের কল্যাণ, দশের মঙ্গল, জগতের হিত। একটা ভাল দাবাড়ু পৃথিবীর সম্পদ। তো এ তো আবার একটা নয়, দু-দুটো। একেবারে জোড়ামানিক।'

কিন্তু বেচারি ছেলে দুটোর বে-খাটুনির চাকরি বজায় রাখতে রাখতে হাতে-পায়ে খিল। মনমেজাজ বোদা বিস্বাদ! মাথা ঝিম! অতএব একদিন চম্পট।

তারপর তো কত পাকচক্র! কত পট পরিবর্তন। ভাগ্যের কত খেল।

ভাগ্যে থাকলে কী না হয়? তা নইলে খবরের কাগজে ট্যাঁপা-মদনার নাম বেরোয়? ওদের ফোটো তোলানো হয়? এবং কাগজে সেই ছবিও ছাপা হয়? সেই যে সেবার 'সোনার ইঁট'-এর ব্যাপারে? তো সে-সব তো গত কথা।

তারপর?

তারপর থেকে তো কত কত অবিশ্বাস্য সব ঘটনা ঘটে গেল নেহাত হতভাগা দুটো ছেলের জীবনে। ট্যাঁপা বলত 'জেবন'। মদনা বকে-বকে ছাড়িয়েছে। বলতে গেলে গাধা পিটিয়ে প্রায় ঘোড়া করে তুলেছে মদন!

কিন্তু মদনকে কে পিটিয়ে-পিটিয়ে ঘোড়া থেকে মানুষ করে তুলেছে?

সেও তো অনেক কথা। সে-সব কথা যাক। আসল কথা এই, ইতিমধ্যে ট্যাঁপার ওই তুচ্ছ বাসনাটুকু মেটবার অবস্থা যে না হয়েছে, তা নয়। অনেক দিনই হয়েছে। কিন্তু মেটানোটা আর হয়ে ওঠেনি।

হয়ে ওঠেনি, কতকটা ঘটনাপ্রবাহের স্রোতের ধাক্কায়, কতকটা বা মদনার গাফিলতিতে। ট্যাঁপা যখনই তাড়া দিয়েছে, তখনই মদনা বলেছে, 'হবে, হবে! তাড়া কী?'

ট্যাঁপা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছে।

আর আজ?

আজ কিনা ট্যাঁপা 'আর কবে হবে রে মদনা' বলে যেই দীর্ঘশ্বাসটি ছেড়েছে, মদনা হেসে উঠে বলল কিনা, "রিকশা চেপে তুই ক'দিনে কলকাতা ভ্রমণ সাঙ্গ করবি রে ট্যাঁপা-মানিক? তার থেকে আয় বরং একটা ট্যাকসিকে ঘন্টা হিসেবে ভাড়া করে হোল্ ক্যালকাটাটা চক্কর মেরে আসা যাক।"

ট্যাঁপা ধিক্কারের গলায় বলল, "এতকাল পরে এই কথা? হাওয়া-গাড়িতে চেপে 'হুশ' করে হাওয়ায় ভেসে ভেসে, বড় রাস্তায় বড় রাস্তায় চক্কর মারাটাকে 'ভ্রমণ' বলে? রেশকোয়...ইয়ে তো গে রিকশাগাড়ি চেপে চাদ্দিক দেখতে দেখতে যাব, মন হলে গলিঘুঁজিতেও সেঁদিয়ে যেতে পারব, মানুষজন দোকানপাট দেখতে-দেখতে হয়তো কত জ্ঞান সঞ্চয় হবে, তার কাছে তোর টেসকি-গাড়ি...ইয়ে...ট্যাকসিগাড়ি? দূর! তো ট্যাকসি কেন, যেভাবে চড়চড়িয়ে উন্নতি হতে লেগেছে, দু'দিন বাদে তোর নিজের মটরগাড়ি চেপেই তো..."

"শুধু আমার?" মদন রাগের গলায় বলল, "এ-কথা বললি যে?"

"আহা ওই আর কী! কথার কথা। তোর মানেই আমার! তার মানেই আমাদের। তো ভাগ্যে থাকলে হয়তো এরপর আমরা সেই তোর ফেলুদার মতন উড়োজাহাজে চেপে এবেলা-ওবেলা দিল্লি-বোম্বেও করতে পারি। কিন্তু চিরকালের এই বাসনাটি তো অপুন্নো থেকে যাবে? ক্রেমোশো তো আমরা আর ট্যাঁপা-মদনাও থাকছিনে। এখনই হতে হয়েছে টি· সি· পাল আর এম· দাস! তা হলে? বেচারি ট্যাঁপা হতভাগার জন্যে আমার মন কেমন করে রে মদনা! এত হচ্ছে, কিন্তু তুচ্ছু'...ইয়ে...তুচ্ছো একটু সাধ আর মিটল না অভাগার!"

"সেরেছে!" মদনা হো-হো করে হেসে ওঠে। তারপর বলে, "তবে নে বাবা, ডাক তোর একখানা রেশকো! দেখি ক'দিনে তোর কলকাতা ভ্রমণ হয়।"

এখন ট্যাঁপা রেগে বলে, "আমার? আমি একা ঘুরব?"

"কী মুশকিল! তাই বলেছি নাকি! ও তো একটা কথার কথা! তবে ভাবনা হচ্ছে ওভাবে বাদামের খোলা ছড়াতে-ছড়াতে আর ডাব, আইসক্রিম, রাস্তার দোকানের চা খেতে-খেতে বেড়ালে, কেউ না আবার চিনে ফেলে।"

ট্যাঁপা আবার একটি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। বলে, "ওই তো, বিখ্যাত হবার জ্বালাই তো ওই! নিজের ইচ্ছেমতন কিছু করার যো নাই, সাদারণ মানুষের মতন রাস্তার দোকানে চা শরবত খাওয়া, ফুচকা খাওয়া, এসব দেখলে তো..."

"সেই তো ভাবনা।"

ট্যাঁপা রাগ-রাগ অথচ উদাস গলায় বলে, "যত দিন যাবে, ভাবনা ততই বাড়বে। যতই তুই ভি· আই· পি· হবি, ততই অবোস্তা মার্ডার কেস হয়ে উঠবে।"

"মার্ডার কেস মানে?" মদনা ভুরু কোঁচকায়।

"তো মার্ডার কেস নয়ই বা কেন? বিখ্যাত হলে তুই আর মদনা থাকবি? তখন শুধু এম· দাস।"

"সে তো তুইও!" মদনা রাগের গলায় বলে, "তুইও তখন শুধুই টি· সি· পাল।"

"তার মানে ট্যাঁপা আর মদনা নিহত!"

মদনা হতাশ গলায় বলে, "তুই বলতে চাস কী বল তো? উন্নতি না হওয়াই মঙ্গল?"

"আহাহা..." ট্যাঁপা জিভ কাটে, "তাই কি আর বলতেছি?"

"বলতেছি নয় ট্যাঁপা, বলছি।"

"ওই হল। একই কথা! উন্নতি না হোক, এ-কথা বলছি

না। বলছি, যত বিখ্যাত হবি তুই, ততই জ্বালা-দুর্দশা বাড়বে। সহজ মানুষের মতন যা ইচ্ছে করতে স্বাধীনতা পাবিনে। পয়সার অভাবে জন্মোভোর যা করতে পারিসনি, পয়সা হলে সে-সব করতে গেলেই দেখবি বিপত্তি। বাজার থেকে একজোড়া গঙ্গার ইলিশ হাতে ঝুলিয়ে রাস্তায় নাবলে ভিড় জমে যাবে। চাদ্দিক থেকে ফটাফট ফটাফট ফোটো উঠে যাবে। সে ফোটো ঝটাপট খপরের কাগজে বেরিয়েও যাবে! বল যাবে কি না? রেলগাড়ির থাড্ডো কেলাসে চেপে মাটির ভাঁড়ে চা, কিম্বা রেলগাড়ির ফেরিওলার ঝালমুড়ি, বুলবুলভাজা, কচি শশা, হজমি দানা খেতে-খেতে নিশ্চিন্দি হয়ে চলতে পারবি? পারবিনে। সব্বোদা ভয়ে কাঁটা, ওই বুজ্জি কে চিনে ফেলে। তবে? স্বস্তি আচে? মেয়েছেলেও নয় যে স্টারদিদিমণিদের মতন পাব্‌লিকে বেরোতে ঘোমটা টেনে বেরোবি।"

মদনের ভুরু আরও কুঁচকে যায়, "আমরা স্টার?"

"তা না হোস, একালে বিখ্যাত সক্কলেরই স্টারের জ্বালা! যেখানে যাবি, পাব্‌লিক চিনতে পারলেই ভিড় জমে যাবে। ফোটো উঠে যাবে।"

"এত কথা তুই শিখলি কোথা থেকে রে ট্যাঁপা?"

"দেখতে দেখতেই শেখা রে মদনা! কী থেকে কী হয়েছি আমরা, ভেবে দ্যাখ! ছিলুম পকেটমার, হয়ে পড়লুম শখের গোয়েন্দা। আকাশ পাতাল। তো এই এতটা রাস্তা আসতে কম তো দেখছি না। ক্রেমোশো আরও দেখব! পেটে বোমা মারলে ক-অক্ষর বেরোত না, এখন বই-কাগজ পড়চি। এরপর যখন ফেলুদার মতন উড়োজাহাজ চেপে দিল্লি-বোম্বে করে মার্ডার কেস-এর ফয়সালা করতে যাব, তখন হয়তো ইনজিরি বই-কাগজও পড়তে পারব। তবেই বোঝ! এ পিথিবিতে চোখ-কান খুলে শুদু দেখে বেড়ালে অনেক শেখা হয়ে যায়।"

"বলেছিস ঠিক!" মদনা নিশ্বাস ফেলে বলে, "তবে মার্ডার কেস আর আমাদের ভাগ্যে জুটেছে! দু-দু'বারই জুটেও স্রেফ বোকা বনলাম। গজ-উকিলই বল্ আর আমাদের চেম্বারের কাছের সেই ষড়যন্ত্রের কেসের 'অদৃশ্য' হয়ে যাওয়া লোকটাই বল্। মার্ডার হল, অথচ নিহত হল না। তাই বলছি অভাগাদের ভাগ্যে সত্যিকার একটা খুনের কেস আর জুটেছে!"

এখন ট্যাঁপাই মদনার গায়ে সান্ত্বনার হাত বুলিয়ে বলে, "হতাশ হোসনে মদনা! জুটবে, জুটবে! আমি বলচি, তোর কপালে অনেক খুনের কেস জুটবে।"

"আবার শুধু 'তোর কপালে'? আমার একার কেস জুটবে?"

"আহা, না রে বাবা, না! হলে দু'জনারই। তবে তোর বুদ্ধিবিদ্যে বেশি তো! তাই তোর কথাই বলি..."

"তোরও কিছু কম না। তুই যে-ভাবে অবলোকন করতে শিখেছিস!" হেসে ওঠে মদনা, "তোরও জয়জয়কার অবধারিত।"

"তা হয় না রে মদনা। এ যাবৎ যত গোয়েন্দা-গপ্পো শুনলুম আর পড়লুম, দেখলুম অ্যাসিস্টেন্টদের হতে হয় বোকা-বুদ্ধু আকাট ভক্ত-হনুমান। আমিও তাই হব। তবে তোর সাথে-সাথেই তো কারবার! ভবিষ্যতে ভাল ভাল পোশাক পরে ফাস্টো কেলাস রেলে চেপে কি উড়োজাহাজেই চেপে ঘোরাঘুরি করব। দামি দামি সেই সব, কী যেন বলে, সাততারা, দশতারা হোটেলে উঠব, কিন্তু এই আক্ষেপটি রয়েই যাবে, জীবনে একদিন পুরো একটাকার বাদামভাজার ঠোঙা কোলে নিয়ে রিকশো চেপে কলকাতা দর্শন করা হল না।"

ট্যাঁপার করুণ করুণ মুখটা দেখে মায়া হল মদনার। বলে উঠল, "তবে ডাক একখানা রিকশো। দরদস্তুর করে ঠিক করে নে ক'দিনে আমাদের কলকাতা ভ্রমণ করিয়ে দিতে পারবে। ব্যস! আস্ত দু' টাকার বাদামভাজা কিনে ফেলে ঠোঙাটা কোলে বসিয়ে, দু'দিকে তার খোলা ছড়াতে ছড়াতে আর তোর পিথিবিকে অবলোকন করতে করতে ঘুরে বেড়িয়ে জীবনের একটা বাসনা মেটানো হোক।... এই রিকশা...."

ট্যাঁপা বাধা দিল, "তোর আবার হয়তো হয়, নয়তো নয়। রোস, একটা শুভ কাজে উদ্বোধন না কী বলে, সেটার ব্যবস্থা করতে হবে না? কাল ভোর সকালে চানটা সেরে নে। প্রথমেই কালীঘাটে মা-কালী দর্শন করে, ওখান থেকেই বাদামভাজা কিনে নিয়ে...."

"ওখানে পাওয়া যাবে?"

"কী বলিস মদনা! সাধে বলি শুদু দেখলেই হয় না, অবলোকনটি করতে হয়। মন্দির থেকে বেরিয়ে একমিনিটের রাস্তা, ফুটপাথে বসে দিনভোর বালিখোলা চাপিয়ে বাদাম ভেজে চলেছে না একটা লোক! ধারেকাছে একটা বুড়ি শিলনোড়া নিয়ে বসে হরদম নুন আর কাঁচালঙ্কা এক করে পিষে চলেছে। আর ওধারে এক বুড়ি ওই ফুটপাথেই তোলা উনুনে গরম গরম বেগুনি, আলুর চপ ভাজছে। দেখিস নাই কখনও?"

মদনকে মানতেই হল, দ্যাখেনি। মানে 'দেখেছে' হয়তো, তবে 'অবলোকন' করেনি মনে হচ্ছে

পরদিন ভোর-সকালে চান-টান সেরে অভিযানের মুখে ট্যাঁপা হঠাৎ বলে ওঠে, "একটা কাজ করলে মন্দ হয় না মদনা। ধর, আমরা দু'জনে যদি এক-একটা ছদ্মবেশ ধারণ করি, তা হলে আর কারও চিনে ফেলার ভয় থাকে না। আর তোর, মানে আমার, মানে আমাদের, কী বলে...প্রোফেশনেরও কোনও ক্ষেতি হয় না!"

"অ্যাঁ, কী বললি? ছদ্মবেশ ধারণ!" মদনা হঠাৎ ট্যাঁপাকে উঁচু করে তুলে ধরার চেষ্টা করে বলে ওঠে, "ওরে আমার ট্যাঁপামানিক! তুই মরে গেলে তোর ব্রেনের একটু ঘিলু শিশিতে ভরে রাখতে হবে। মগজে এত বুদ্ধি? ফার্স্টক্লাস বলেছিস রে! তো বল কীরকম ছদ্মবেশ ধারণ করা যায়!"

"তুইই বল!"

মদনা একটু ভেবে বলে, "প্রথমে তো কালী-মন্দিরেই যাচ্ছি, তো পরনে একটা রক্তবস্ত্র, গায়ে মা-কালী লেখা নামাবলী, আর কপালে মোটা দাগে সিঁদুরের রেখা। মন্দিরে ঢোকা সহজ হবে!"

তা ভাবনায় পড়ার কিছু নেই। কিছু-কিছু ছদ্মবেশের জোগাড় তাদের আছে, কখন কী দরকার পড়বে বলে। যেমন ওই কালী-সাধকের সাজ, আবার বোষ্টম-ভিখিরির সাজ, মালা-ঝোলা, হরিনাম-লেখা নামাবলী। এ ছাড়া শৌখিনবাবুর ধুতি-পাঞ্জাবি, ফ্যাশনেবলবাবুর পলিয়েস্টার শার্ট-প্যান্ট, আবার

হাসি ঝরে মজাদার
ঝাখলে ঠোঁটে স্বাদ ট্রিঙ্কা-র !
ট্রিঙ্কা—চেখে দেখুন একবার,
আহা, স্বাদটি কী চমৎকার ! দেখেই খেতে ইচ্ছে
করে, ঠাণ্ডা এ সরবৎ যখন গ্লাসে ঝিক্‌মিক করে—
আর, এ তৈরীও হয় এক পলকে ! ট্রিঙ্কা—এমনই
এ পানীয় যে হয়ে ওঠে সবার প্রিয় !
প্রতি বোতলে পাবেন ৫০ গ্লাস
প্রতি প্যাকে পাবেন ৬ গ্লাস
Trinka
Makes 50 glasses
Orange flavour
Trinka
Soft Drink Mix
Vitamin C
6
পাঁচটি মনের মত দারুণ সুন্দর
স্বাদগন্ধে : অরেঞ্জ, লেমন,
পাইনঅ্যাপ্‌ল, কোলা,ফ্রুট পাঞ্চ।
ট্রিঙ্কা
স্বাদে সবচেয়ে আগে !
cpc কর্ণ প্রডাক্টস্‌ কোম্পানী (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড
CLARION B/CP/13/244

লুঙ্গি, টুপি, ডোরাকাটা ফতুয়া, এবং সর্দারজির পাগড়ি, পায়জামা, ঢোলা কামিজও। পরচুল, পরদাড়ির সংগ্রহও আছে কিছু।

'যাত্রাপার্টির লোক' এই পরিচয় দিয়ে এসব কিনে-কিনে জোগাড় করেছে ট্যাঁপা-মদনা!

মদনের প্রস্তাবে ট্যাঁপা বলে উঠল, "ও-সাজে মন্দিরে ঢোকা সহজ হবে, কিন্তু বাদামভাজার ঠোঙা কোলে নিয়ে খোলা ছড়াতে-ছড়াতে বেড়ানো মানাবে?"

"আরে তাই তো! ওরে আমার জাদু! ঠিক বলেছিস! তা হলে ওই লুঙ্গি-টুপি-ফতুয়া?"

ট্যাঁপা জজের রায়ের গলায় বলে, "মন্দিরে ঢুকতে দেবে না!"

"তা হলে? সর্দারজি?"

"নাঃ! তাতে রিকশোওলার হয়তো অস্বস্তি হবে, তা ছাড়া মুখ বুজে তো আর বেড়াব না। কথা কইলেই ধরা পড়ে যেতে হবে।"

"তা হলে? হরিনামের মালার সঙ্গেও তো ওই চিনেবাদাম, ফুচকা, তেলেভাজা, এসব মানাবে না।"

"তা তো নয়ই। আমি বলি কি, ফতুয়াটা থাক, টুপিটা লুঙ্গিটা বাদ যাক, লুঙ্গির বদলে একখানা করে আধময়লা মোটা ধুতি। তার সঙ্গে একটা ছেঁড়া-ফাটা গামছা কাঁধে। পায়ে রবারের চটি। গাঁ থেকে কলকাতা দেখতে আসার মতো দেখতে লাগবে। মানিয়ে যাবে!"

মদন গম্ভীর গলায় বলল, "শুধু মাথার ঘিলুই নয় রে ট্যাঁপা, তোর পায়ের ধুলোও একটু হোমিওপ্যাথি শিশিতে ভরে সংরক্ষিত করতে হবে। তুই আবার বলিস, তুই বুদ্ধু!"

"এতে কোন বিদ্যে লাগেও না মদনা। শুধু ওই অবলোকন। যাক, আর দেরি করা নয়। 'জয় মা কালী' বলে বেরিয়ে পড়া!"

২

খাটো ধুতি, ডোরাকাটা ফতুয়া, কাঁধে গামছা। ফতুয়ার পকেটে কিছু টাকাপয়সা, এবং ওই সাজের সঙ্গে মানান করে কোমরে বাঁধা গেঁজেয় বেশ কিছু টাকা।

সারাদিনের জন্যে বেরোনো, বাড়িতে বিশেষ টাকাপত্র না রেখে যাওয়াই ভাল। দিনকাল ভাল নয়। তা ছাড়া, ওদের 'চেম্বার' ঝাঁটপাট দেবার জন্যে সম্প্রতি যে ছোকরাটাকে রেখেছে, তার মতিবুদ্ধি কেমন, তা এখনও জানা যায়নি।

শখের গোয়েন্দাদের নেমপ্লেট মেরে 'চেম্বার' খুলে বসার পর অনেকদিন পর্যন্ত তো বাইরের দরজা বন্ধ করে নিজেরাই ঝাড়ামোছা করেছে। তবে এখন ভাগ্য একটু ফিরেছে বলেই লোক রাখা! যাক, টাকাপত্তর নিজেদের সঙ্গে নিয়ে এলে আর ভাবনা কী! বরং কোমরের সঙ্গে নোটের গোছা বাঁধা থাকলে, কোমরে বেশ একটা বল থাকে।

মন্দির থেকে বেরিয়ে, সেই একটুখানি বেরিয়েই, ট্যাঁপা জিভে একটু চুকচুক শব্দ করে বলে উঠল, "মদনা, দেখেছিস?"

এখন দেখল মদনা।

একটা বুড়ি এই অতি সকালেই ফুটপাথের লাগোয়া একটা কোনাচে-মতো জায়গায় গনগনে একটা উনুনের সামনে বসে ডাঁই করে বেগুনি আলুরচপ ভেজে ফেলেছে। আরও ভাজছে।

ভাজতে হবে না? যারা ঠাকুর দর্শনে মন্দিরে আসে, তারা তো উপোস করেই আসে। বেরিয়েই উপোস ভাঙতে অস্থির হয়ে উঠবে না?

ট্যাঁপা বলল, "খালি পেটে বাদামভাজা খাওয়াটা ঠিক নয়, কী বলিস মদনা? আগে কিছু সেঁটে নেওয়া যাক!"

মদনেরও মনটা টলল বই কী। তা ছাড়া, দুটো গাঁইয়ামার্কা লোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে শালপাতার ঠোঙা হাতে নিয়ে তেলেভাজা খাচ্ছে, এ এমন কিছু আশ্চর্যের দৃশ্য নয় যে, কেউ তাকিয়ে দেখবে।

কিন্তু আশ্চর্য দৃশ্য একখানি যে দেখিয়ে চলেছে ট্যাঁপা!

মদন অনেক আগেই হাতের ঠোঙা ফেলে দিয়ে তেল-হাতটা মাথায় মুছে ফেলে যাবার জন্যে রেডি। কিন্তু ট্যাঁপার ঠোঙা ফেলে দেবার নামটি নেই। এন্তার চালিয়েই যাচ্ছে।

মদন যতবার ইশারা করছে, এবার ছাড়, ট্যাঁপা ততবারই ইশারায় বুঝিয়ে দিচ্ছে, আর একটু।

শেষ অবধি আর থাকতে পারে না মদনা, চোখ পাকিয়ে চাপা কড়া গলায় বলে, "কী করে চলেছিস? এরপর আবার সেই পুরো টাকার চিনেবাদাম। আজই জীবনের শেষ দিন করতে চাস?"

একগাল হেসে হাতের দু'খানা চটপট মুখে পুরে ফেলে, ঠোঙাটা বাড়িয়ে ধরে বলে, "দিদিমা, আর খানচারেক আলুর চপ!"

আশেপাশে ভিড় যথেষ্টই। তবে বেশির ভাগই কিনে নিয়ে যাবার খদ্দের। দু-চারজনই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেয়ে নিচ্ছে।

"ট্যাঁপা, মরবি বলে দিচ্ছি।"

ট্যাঁপা আরও একগাল হেসে বলে, "মরতে যাব কী দুঃখে? আমরা তো আর এখনও তেমন বড়মানুষ হইনি মদনা। এখনও হজোম-শক্তি আছে। খেয়ে নিই এই বেলা আশ মিটিয়ে। তেমন বড়লোক হলে তো আর সে-শক্তিটি থাকবে না। দেখছি তো চাদ্দিকে। পকেটে আর পেটে লড়ুয়ে বিরোধ। পকেটে পয়সা হল কি তোর গিয়ে পেটের বারোটা বেজে গেল। ক্রেমোশো আর খিদে নাই, রুচি নাই, হজোম নাই। অথচ পকেট যখন গড়ের মাঠ, পেটের মধ্যে তখন রাতদিন ছুঁচোয় ডন-বৈঠক মেরে চলবে।"

মদনা হেসে ফেলে, "এ-সবও কি তুই অবলোকন করে থাকিস ট্যাঁপা?"

ট্যাঁপা তাচ্ছিল্যের গলায় বলে, "এর আর অবলোকন কী? দেখতেই তো পাওয়া যায় চাদ্দিকে। ইয়া ইয়া বড়-বড় গাড়িওলা বড়মানুষরা চিনি ছাড়া চা খাচ্ছে, আলু ছাড়া তরকারি খাচ্ছে, মাখন ছাড়া পাউরুটি খাচ্ছে, সন্দেশ রসগোল্লা মণ্ডা মেঠাইকে বিষতুল্য জ্ঞান করছে, আর দু'বেলাই হয়তো ভাতের বদলে দু'খানা শুকনো রুটি চিবোচ্ছে! তো আমাদেরও কি আর সে-দশা না হবে? তা এখন যখন 'দিন' রয়েছে, খেয়ে নিই।" বলে তেলের হাত মাথায় মোছে ট্যাঁপা।

মদনা বলে, "বাঁচা-মরা নিজের হাতে ! তো হয়েছে এবার ?"

"হয়েছে ।"

ফতুয়ার পকেট থেকে একখানা কুড়ি টাকার নোট বার করে বুড়ির সামনে ফেলে দিয়ে ট্যাঁপা বলে, "নাও তো দিদিমা হিসেব করে !"

বুড়ি নোটখানা খপ করে তুলে নিয়ে বেজার গলায় বলে, "এর আবার হিসেব কী বাবা ? আপনি যে খেয়েছ, এটা ছাপিয়ে দাম উটেচে বই কম নয় । যাকগে, ওই থাক !"

"যাক গে ওই থাক মানে ?" ট্যাঁপা কড়া গলায় বলে, "এ কি দয়া নাকি ? হিসেব দাও । যা বাড়তি হয়েছে বলো চটপট ।"

বুড়ি তখন অন্য খদ্দেরদের নিয়ে ব্যস্ত । বলে ওঠে, "আপনি বাবু য্যাতো প্রাণ চায় খেয়ে গ্যাচো, আমি অতো গুনি নাই !"

"বটে ! ওঃ !" ট্যাঁপা পকেট থেকে আর-একখানা দশ টাকার নোট বার করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে, "কী ? এতে হবে ? নাকি আরও খেয়েছি ?"

বুড়ি এখন অপ্রতিভভাবে বলে, "অনেয্য কথা বলব ক্যানো ? এ থেকে আপনি এটা পাবে ।" বলে খুঁজে-পেতে একখানা ময়লা চিরকুট্টি দু'টাকার নোট বার করে বাড়িয়ে ধরে ।

"দরকার নেই । তুমিই নাও ।" বলে গটগট করে চলে আসে ট্যাঁপা ।

একটু এসে মদন হেসে বলে, "বড়লোক হোসনি, কিন্তু বড়লোকের মেজাজটি তো পেয়েছিস ! ওই টাকা দুটোতেই আমাদের বাদাম হয়ে যেত !"

"যাকগে ! তুই নিয়ে আয় ।" ট্যাঁপা এগিয়ে যায় কিছু দূরে দাঁড়ানো রিকশার সারির দিকে । কালীঘাটের মা-কালীর মন্দিরের ধারেকাছে, সব সুবিধেই হাতের কাছে ।

দু'জনে একখানা গাড়িতে চেপে বসল, বাদামের ঠোঙা কোলে নিয়ে ।

রিকশাওলা এদের ঠিক 'বাবু' পদবাচ্য না করে আলগা বলায় বলল, "যাবেন কোথায় ?"

ট্যাঁপা তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, "তোমার যেদিকে ইচ্ছে । আমরা কলকেতা দেখতে বেরিয়েছি ।"

মদনা ওকে একটা চিমটি কেটে জানান দিল, "বোকার মতো কথা বলছিস কেন ?"

ট্যাঁপাও একটা চিমটির দ্বারা জানিয়ে দিল, "ইচ্ছে করে ।"

আর একটা চিমটি । অর্থাৎ, "কেন ? কী দরকার ?"

প্রত্যুত্তরের চিমটি বলল, "আছে দরকার । বোকা সাজায় মজা আছে ।"

লোকটা অবশ্য এসব চিমটি রহস্য বুঝল না । একটু মুচকি হেসে বলল, "কোথা থেকে আসা হয়েছে ? গাঁ-ঘর থেকে বুঝি ?"

ট্যাঁপা একগাল হেসে বলল, "ধরেছ তো ঠিক ! খুব বুদ্ধি । কলকেতার জলের গুণ !"

মদনা এবার একটা জোর চিমটি কাটল । যার অর্থ হচ্ছে, "থাক ! যথেষ্ট হয়েছে ! আর নয় ।"

একটু পরেই ট্যাঁপা হৃষ্টচিত্তে বাদামের ঠোঙার মুখ খুলে একটা ছাড়িয়ে মদনের দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, "নে, প্রথমটা তুই খা ।"

"কেন ?"

"বাঃ ! তুই আমার প্রাণের বন্ধু না !"

"ঠিক আছে । দে ।"

"মদনা !"

"কী ?"

"নিজেদেরকে বেশ রাজা রাজা লাগছে, না ?"

মদনা হেসে ওঠে, "সাজটা তো একেবারে রাজসই ।"

"সাজেতে কী করে !"

ট্যাঁপা ইত্যবসরে গোটাকতক বাদাম ছাড়িয়ে ফেলে, তার খোলাগুলো মুঠো করে রাস্তায় ছড়িয়ে দিয়ে বলল, "মনের ভাবটা ভাব । রাজা-রাজা না ?"

মদনা বলল, "মটরগাড়ি চড়লে এর থেকে বেশি হত ।"

"তোর কেবল মটরগাড়ির বায়না, তোর মটরগাড়ি কোনও গলির··· এই ভাই, রোকো,রোকো···"

যদিও রিকশাওলা পিওর বাঙালি, তবু ট্যাঁপা 'রোকো,রোকো'ই বলল । জানে, গাড়ি চড়লেই চালককে ডিরেকশন দিতে হিন্দি বলতে হয় । ট্যাক্সি চড়লেও 'আভি ডাইনে', 'থোড়া বাঁয়ে', 'আউর থোড়া', 'আগে বাড়ো', এই সব বলাই রীতি । তা সে ড্রাইভার খাস কলকাতার লোক হলেও ।

রিকশাওলা রুখল !

"নামবেন ?"

"না, না, শুধু ওই গলির মধ্যেটায় একবার ঢুকব । ওর মধ্যে তোমার গাড়ি পারতা হ্যায় ?"

"না ! ঘোরাবার জায়গা নেই ।"

মদনা বলল, "এখানে কী ?"

"কী আবার ! দেখব । আয়, নাব ।"

"তুই যা ! আমার ইচ্ছে করছে না ।"

"মদনা ! আমার সঙ্গে নন-কোঅপারেশান করছিস ? গলিঘুঁজি কানাগলির মধ্যেই যদি ঢুকে-ঢুকে না দেখলুম, তো হলটা কী ? কলকেতা মানে তো আর শুধুই ভিক্টোরিয়ার চুড়ো, তোর গিয়ে মনুমেন্টের মাথা, হাইকোর্টের ঘড়িটাই নয় রে মদনা । আসল কলকেতা হচ্ছে গলি । শুনেছি, এক-এক জায়গায় গলির গলি তস্য গলিতে গোলকধাঁধা ! তাকেই বলে আসল কলকেতা ! চল না, ভেতরে ঢুকি !"

"ট্যাঁপা রে ! এই রেটে বেড়ালে ক'বছর লাগবে তোর কলকাতা দেখতে তা ভেবে দেখেছিস ?"

কিন্তু ভেবে দেখবার আগেই তো নেমে পড়েছে ট্যাঁপা । কাজেই বাধ্য হয়ে মদনাকেও নামতে হয় গজ্‌গজ্ করতে করতে ।

সরু গলি । ওদিকটা মুখ বন্ধ । অর্থাৎ কানাগলি । খানিকটা ঢুকেই দেখে, সেই কানা মুখ বোঝাই করে বিরাট এক জঞ্জালের পাহাড় ! কোনওমতে কোঁচার কাপড়ে নাক চাপা দিয়ে বেরিয়ে আসতে আসতে বলে মদনা, "হয়েছে তো তোর আসল কলকেতা দেখা ? তবু এ তো কিছুই না । আসল দেখতে চাস তো নর্থে যেতে হয় ।"

ট্যাঁপা উৎসাহের গলায় বলে, "তাই বলছিস ?"

"বলছি তো ! তো এখনি যাবি ? এই রিকশা চেপে ?"
"তুই রেগে যাচ্ছিস মদনা !"
"রাগব কেন ? রাগের কথা নয়। তবে একটা নেয্য-অনেয্য আছে তো ? একটা বাসনা মেটাতে বেরিয়েছিস তাই-ই মেটা ! দু-চারবার রিকশা বদল করে সারাদিনমান ঘুরে বেড়া, ফুচকা খা, ডাব খা, কাম্পাকোলা খা, চায়ের দোকানে ঢুকে চা খা, সন্ধে হলে কোনও পাইস হোটেলে ঢুকে ডিমের ঝোল ভাত খেয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফের।"

ঘরের ছেলে ঘরে !

হায় ! মদনার কথা শুনে অলক্ষ্যে কেউ হাসল বোধহয়। কিন্তু অলক্ষ্যে তো ! দেখা গেল না। দেখা গেল এইটি, ট্যাঁপা যেন সাপের ছোবল খেয়েছে, এইভাবে চমকে উঠে প্রায় চেঁচিয়ে বলে ফেলে, "অ্যাঁ ! কী বললি মদনা ? ডিমের ঝোল ভাত ! এ কোন্ স্বর্গলোকের কথা শোনালি মদনা ! আহাহা ! ডিমের ঝোল ভাত ! হোটেল রেস্টুরেন্টের ডিমের ঝোল ! তার মানে সেই রগরগে ডগডগে লাল-লাল ! ইশ ! আহা ! তা সেটা আর সন্ধের জন্যে তুলে রাখা কেন রে মদনা ? এখন এই দুপুরেই হয়ে যাক না ! ভাতটা তো লাঞ্চেই ভাল ! তাই না ?"

মদনা হেসে ফেলে, "এখন খেতে পারবি ?"

"বাঃ, কেন পারব না ? দু'খানা তেলেভাজা খেয়েছি বলে ? বলেছি তো বাবা ! যতক্ষণ না বড়মানুষ হচ্ছি, ততক্ষণ হজোমশক্তি নিজের কন্ট্রোলে থাকবে। কোথাও পালাবে না ! চল দেখি কোথায় তোর পাইস হোটেল। আহা ! সেই লালচে-লালচে ভাজা-ভাজা ডিমের ঝোল ! কবে কোন্‌কালে যেন দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু দেখেছি, আর নিশ্বেস ফেলেছি। মনে আছে তোর ? সারাদিনে দু-পাঁচজনের পকেট সাফ করে যা কিছু হাতে আসত, গুলু-সর্দার আমাদের হাত মুচড়ে সব সাফাই করে নিয়ে একটা কি দেড়টা টাকা দিত !"

মদনা ট্যাঁপার হঠাৎ এই পুরনো কথা তোলায় ভারী রেগে যায়। চোখ পাকিয়ে চাপা গলায় বলে, "এতকাল পরে এখন আবার ওসব কথা কেন ? মনমেজাজ খারাপ করতে ? তদবধি আর ডিমের ঝোল খাসনি ?"

ট্যাঁপা একটু মিইয়ে গিয়ে বলে, "তা কে বলছে ? কতই তো খাচ্ছি। এখন তো প্রেত্যেকদিনই প্রাতোক্কালে..."

"প্রেত্যেকদিন নয় ট্যাঁপা। প্রত্যেকদিন। প্রাতোক্কালে নয়, প্রাতঃকালে। তো কে তোকে সাধুভাষায় কথা বলতে বলেছে ? অ্যাঁ ? 'রোজ সকালে' বললেই তো ল্যাঠা মিটে যায় !"

এইভাবেই মদনা গাধা পিটিয়ে-পিটিয়ে ঘোড়া বানাচ্ছে। কিন্তু হতভাগা গাধাটার ভেতরে আবার অনেক খানদানি ব্যাপার। ও মাঝে-মাঝেই উদাস হয়ে যায়, স্মৃতিচারণ করতে বসে, আর দার্শনিক দার্শনিক কথা বলে।

রিকশাওলাটা ওদের কথার আভাস অনুমান করে বলে ওঠে, "আপনারা যদি এখন ভাত-টাত খান, আমায় ছেড়ে দ্যান।"

মদনা বলে ওঠে, "না না, এক্ষুনি কেউ ভাত-টাত খাবে না। চলো আর একটু।"

"আমারও তো খাবার টাইম হয়ে যাচ্ছে," লোকটা বেশ

সানলাইট ডিটারজেন্ট পাউডার আপনার কাপড়ে এনে দেয় এমন রোদের চমক যা, সাধারণ পাউডার দিয়ে কোনোমতেই হওয়া সম্ভব নয় — আর দাম, একেবারেই কম!

সানলাইট ডিটারজেন্ট পাউডার

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

6794 Ben

অনমনীয়ভাবে বলে।

"এক্ষুনি খাবার টাইম ? ক'টা বেজেছে হে বাপু ?"

লোকটা কব্জি উলটে ঘড়ি দেখে নিয়ে বেজার গলায় বলল, "বারোটা কুড়ি।"

"আরে ! সবে বারোটা কুড়ি ? এ তো ভোরবেলা। আর একটু চলো।"

"আপনারা যে কলকাতার কী দেখতে চান, তাও তো বুঝতে পারছি না।"

ট্যাঁপা গম্ভীরভাবে বলে, "বোঝবার দরকারটাই বা কী ? নাকের সোজা চলো, যখন রোকো বলব, থামবে।"

"এভাবে আমাদের কাজ চলে না। আর আধঘণ্টা বাদ ছেড়ে দেব," বলে রিকশাওলা আবার তার গাড়ির ডাণ্ডা হাতে তুলে নেয়।

কিন্তু একটু চলতে না চলতেই সামনেই এক চায়ের দোকান।

"মদনা ! তা হলে চা'টা হয়ে যাক !"

মদনা চিমটির ভাষায় বলে, "রিকশাওলা রেগে যাবে।"

ট্যাঁপাও চিমটির ভাষায় বলল, "রাগ করল তো বয়েই গেল।"

"এই ভাই, রোকো !"

"ঠিক আছে। এবার আমায় ছেড়ে দ্যান।"

মদন আর ট্যাঁপা একসঙ্গে বলে উঠল, "অত বেজার হচ্ছ কেন, অ্যাঁ ? তোমায় তো ঘণ্টাহিসেবে ভাড়া করা হয়েছে। একটু চা খেতে দেবে না ? এসো, তুমিও এককাপ চা খেয়ে নাও !"

কী ট্যাক্সি-ড্রাইভার, কী রিকশা-চালক, এদের এই এক রোগ ! কেবল তাড়া দেবে। একজনের কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে, আবার একজনের কাছেই তো ধরা দিবি বাবা ! তবু যে কেন এমন করে !

চায়ের নামেও লোকটা একটু নরম হল না ! রিকশা থামাল, ভাড়া মিটিয়ে নিয়ে চলে গেল। ট্যাঁপা আর মদনা দু'জনে দোকানের সামনে পাতা বেঞ্চিটা ডিঙিয়ে দোকানের মধ্যে উঁকি মেরে বলে উঠল, "এই যে, শুনুন, দু' কাপ চা আর···"

আর··· আর··· আর ! কথা শেষ হল না। নিথর পাথর হয়ে গেল দুটো জলজ্যান্ত আস্ত মানুষ। দু'জোড়ায় চারটে চোখ একেবারে স্থির।

৩

এ কী ! এ কাকে দেখল তারা !

কে এই ফুটপাথের ধারে বেঞ্চি-পাতা, পাটাতন-পাতা উঁচু চায়ের দোকানটায় বসে ডানহাতে চায়ের কাপ ধরে বাঁ হাতে ডিমভাজায় কামড় দিচ্ছে।

সাক্ষাৎ যমই মনে হল এদের !

না, চিনতে ভুল হয়নি। এ মূর্তি কি ভুল হবার ?

আশ্চর্য ! কোন্ না গোটা দশটা বছর পার হয়ে গেছে, তবু এখনও প্রায় একই রকম।

সেই চেক্‌লুঙ্গি, আড়ে-ডোরা ছিটের ফতুয়া, গলায় কালো কারে ঝোলানো একখানা রুপোর পদক, মাথার চুলে বুরুশকুচি ছাঁট, পায়ে হাড়কুচ্ছিত এক জোড়া চপ্পল (টেবিলের তলা থেকে আগ বাড়ানো পা দুটোই তো আগে চোখে পড়েছে), আর বাঁহাতের কব্জিতে একখানা ছকনক কাটা সিল্কের রুমাল। কব্জিতে বাঁধা ঘড়িটা আড়াল করতে, নাকি কব্জির জোর বাড়াতে, কে জানে।

কিন্তু এখন আর ওকে দেখে এত ভয় পাবার কী আছে ট্যাঁপা-মদনার ?

এখন তো তারা 'এম· দাস' আর 'টি· সি· পাল'।

তবে ? তা জানে না ওরা।

শুধু ওই সাক্ষাৎ-যমকে দেখেই একেবারে অ্যাবাউট টার্ন আর পিঠটান !

ওদের ছুট মারার দাপটে সামনের বেঞ্চিটা হুড়মুড়িয়ে উলটে গেল। আর তাতেই ঘটল বিপত্তি।

দোকানের মালিক 'কে কে' করে দোকান থেকে নেমে এসে দেখতে পেল, নেহাত বাজে-মার্কা দুটো লোক ছুট্ মারছে।

পড়ে গেল হইচই।

সঙ্গে-সঙ্গে ভিড়।

কোথা থেকে যে দু'মিনিটে ভিড় জমে যায়। যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে আসে লোকেরা।

ছুটতে-ছুটতে সামনেই একটা ষাঁড়। ধর্মের ষাঁড়।

পড়তেই পারে সামনে। এটা গঙ্গার ঘাটের রাস্তা। এই বলরাম বোসের ঘাটে অনেক পুণ্যার্থী, স্নানার্থীর ভিড়। আর পুণ্যার্থীরা অনেকেই ধর্মের ষাঁড়কে কলা খাওয়ান, প্রসাদী মিষ্টির ভাগ খাওয়ান। তা ছাড়া শালপাতা-মোড়া ফুলপাতাগুলোও তো ওদের কম প্রিয় খাদ্য নয়।

এও তো এক সাক্ষাৎ যম।

কাউকে ছুটতে দেখলেই, শিঙ উঁচিয়ে তার পিছু-পিছু ছুটবে, এই ওদের রীতি।

দাঁড়িয়ে পড়লেও তো পিছনে-ছুটে-আসারা ধরে ফেলবে।

ট্যাঁপারা অবশ্যই চায়ের দোকানের কোনও অনিষ্ট করে আসেনি, চুরি করেও ছুট মারেনি, তবু ওদের পিছনে তাড়া করে আসছে একটা দলই প্রায়। তাদের মুখে একটি ধ্বনি, 'ধর্, ধর্। চোর-চোর !'

হঠাৎ কাউকে ছুটে পালাতে দেখলে লোকে চোর ভাববেই। আর যার সঙ্গে কোনও যোগ নেই, সেও ছুটবেই।

ষাঁড়টাকেও সাক্ষাৎ যম মনে হয়েছিল, কিন্তু সেই যমই তাদের আর-এক যমের হাত থেকে বাঁচাল।

মদনা চাপা গলায় বলল, "পাশের গলিতে ঢুকে পড়।"

সড়াত করে সুড়ঙ্গ-সরু একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল দু'জনে। ষাঁড়টার পিছনের দিক দিয়ে। সে একমনে একটা গাঁদাফুলের মালা চিবোচ্ছে।

পিছনে-আসা লোকগুলো থেমে পড়ল। বলে উঠল "লোকদুটো গেল কোথায় ?"

তাজ্জব তো।

একজন হিহি করে বলল, "এই ধম্মের ষাঁড়ের পেটের মধ্যে চালান হয়ে যায়নি তো ?"

এদিক ওদিক তাকিয়ে যে-যার ফিরে গেল। হুজুগে ছুটছিল বই তো নয়।

আর দোকানের মালিক তো দোকান ছেড়ে আসেওনি।

ওরা যেখানে ঢুকে পড়েছিল, আসলে সেটা লোক-চলাচলের গলিই নয়। সেই বহুকাল আগে যখন কর্পোরেশনের এমন আইন তৈরি হয়নি যে, পাশাপাশি দুটো বাড়ি বানাতে হলে, মাঝখানে আটফুট জমি ছাড়তে হবে, তখনকার আমলের পেল্লায় দু'খানা পাশাপাশি বাড়ির মাঝখানের হাতখানেক চওড়া একটা ফাঁক মাত্র। দুটো বাড়ির নর্দমার জল এসে পড়ে। একটা লোক ছাড়া দুটো লোক পাশাপাশি ঢুকে যেতে পারে না।

তা একজনও তো পারে ? আর পিছু-পিছু লাইন দিলে দশজনও পারে !

পায়ের নীচে থইথই জল, একটা বাড়ির গা-নলের খানিকটা (পচাবাড়ি তো) ভেঙে যাওয়ায়, ছড়ছড় করে জল পড়ছে। কিন্তু কী আর করা ? প্রাণের দায় বড় দায় !

কাত হয়ে-হয়ে এগিয়ে সেই জল ছিটোনো জায়গাটা পার হয়ে ওরা একেবারে শেষ অবধি এগিয়ে যেতে লাগল।

গলা শুকনো, হাত-পা ঠাণ্ডা, বুক ধড়ফড়! চোর হোক আর না-ই হোক, ছুটে পালাতে গেলে অবস্থা একই দাঁড়ায় !

জলের ছিটে থেকে সরে গিয়ে মদনা কাঁধের গামছাখানা দিয়ে মুছতে গিয়ে দেখল গামছা কখন পড়ে গেছে। ট্যাঁপারটা রয়েছে কিন্তু। ট্যাঁপা সেটা বাড়িয়ে ধরল।

মদনা মুছতে মুছতে বলল, "কিসের জল কে জানে !"

ট্যাঁপা একটু সামলে বলল, "কলের জল হতে পারে, আবার নোংরা জলও হতে পারে।"

"ইশ, থুঃ,থুঃ ! ট্যাঁপা ! তোর চা খাবার শখ মিটেছে ?"

ট্যাঁপা উদাস গলায় বলে, "কই আর মিটল ? খেতে গিয়েই তো সাক্ষাৎ যমের মুখে !"

"তুইও দেখেই চিনতে পেরেছিলি ?"

"তা আর পারব না ? দেখা মাত্রই তো বুকের মধ্যে বাজ পড়ল।"

"কিন্তু এখন আমরা ওকে দেখে এত ভয় পেলাম কেন বল্ তো ?"

ট্যাঁপা দু'খানা হাত ওলটাল।

যদিও এখন ভরদুপুর, তবু এই দুটো বৃহৎ দেয়ালের মাঝখানের হাতখানেক চওড়া সুড়ঙ্গটা প্রায় অন্ধকার ঘুরঘুট্টি।

তবে হাত ওলটানোয় দেখা গেল।

মদনা বলল, "ভয় পেলাম শুধু এই হতচ্ছাড়া সাজের জন্যে। ভেবে দ্যাখ, যদি ভাল জামা-জুতো পরে ট্যাক্সি থেকে নেমে চা চাইতাম ? ভয় পেতিস ?"

"পেতুম না ?"

"মোটেই না। সাজে তিনভাগ বল-শক্তি।"

"তোর সেই ট্যাক্সির গোঁ। আচ্ছা বাবা, এখান থেকে বেরিয়ে পড়ে ট্যাক্সি চড়িস।"

"এক্ষুনি বেরোনো চলবে না। ওদিকে ঘটনাটা কী ঘটছে জানি না তো। এখন কিছুক্ষণ এই ইঁদুর-কলে আটকা পড়ে থাকতে হবে। তা তোর পক্ষে ভাল। গলির মধ্যে সেঁধোবার বাসনা মিটছে।"

মদনের গলায় ব্যঙ্গের সুর।

তবে ট্যাঁপা গায়ে মাখে না। শ্যাওলা-পড়া পচা দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে গা চুলকোতে চুলকোতে বলে, "তুই রাগ করছিস মদনা, কিন্তু আমার বেশ যেন এডভাঙচার, এডভাঙচার লাগছে।"

"ট্যাঁপা ফের ?"

"আচ্ছা বাবা, থাক। তবে বেশ রহস্য-রহস্য লাগছে না ? আমার তো লাগছে। মনে হচ্ছে এই বুকচাপা দেওয়ালটার আড়ালে কী যেন সংঘটিত হচ্ছে।"

"তা হচ্ছে তো ঠিকই। দু-দুটো জলজ্যান্ত মানুষ ইঁদুর-কলে আটকে পড়ে নর্দমার গ্যাসে মারা যেতে বসেছে।"

ট্যাঁপা বলে, "নাঃ, আজ তোর মেজাজ খুব বেগড়বাঁই। তবে বেরিয়ে চল।"

"এদিক দিয়ে এক্ষুনি না। ওদিকে আর একটু এগিয়ে দ্যাখ, বেরোবার পথ আছে কি না।"

ট্যাঁপা চটপট আর খানিক এগিয়ে গিয়ে গলা বাড়িয়ে উঁকি মেরে একগাল হেসে বলল, "নেইও, আবার আছেও রে।"

"নেইও, আবার আছেও মানে ?"

"দ্যাখ না উঁকি দিয়ে। তো, ওদিকেও আবার জল পড়ছে। দ্যাখ, ফোকরের মুখটা আটকানো বটে, তবে পাঁচিলটা নিচু। ডিঙোনো সোজা।"

মদন বেজার গলায় বলে, "হ্যাঁ, তারপর পাঁচিল ডিঙিয়ে লাফ মারতে গিয়ে আবার একপালা হইচই ! আর খানিক থাক চুপ মেরে ! এদিক দিয়েই বেরোব !"

তবে আর কী করা !

ট্যাঁপা তা হলে এখন অবলোকন চালিয়ে যাক !

বাড়ি দুটোর এদিকে কোনও জানলা নেই।

থাকবার কথাও নয়। পাল্লা খুলতে জায়গা কোথায় ? তবে একটা জিনিস আছে। দেয়ালের মাঝে-মাঝে ঘুলঘুলি। তাও কি পরিষ্কার ফাঁকা ?

নোনাধরা ইঁটের খাঁজে-খাঁজে ঝরে পড়া চুন-সুরকির আড়াল।

তবু ট্যাঁপা চোখ ঠিকরে-ঠিকরে দেখতে দেখতে হঠাৎ সরে এসে উত্তেজিতভাবে চাপা গলায় বলে, "এই দেয়ালটার ওপারে একটা কিছু রহস্য ঘটছে।"

"তোকে এখন রহস্যয় পেয়েছে!"

"তুই দ্যাখ না এসে।"

মদনা সরে এসে একটু দেখে বলে, "একটা লোক ঘোরাঘুরি করছে, এই তো?"

"লোকটার পায়ের কাছে একটা পেল্লায় তোরঙ্গ দেখছিস?"

"তা তো দেখছি। তো কী?"

"অত বড় তোরঙ্গয় কী ভরেছে?"

"ভরবে তোর মাথা আর আমার মুণ্ডু।"

"তা আশ্চয্যিও নয়। লোকটা কোথাও বেরোবার তাল করছে। তৎপর হয়ে কত কী করছে। ওই দ্যাখ, চা খেল। ওই দ্যাখ, ফরসা জামাকাপড় পরছে। মদনা, চল, বেরিয়ে পড়ে বাড়িটার দরজাটা পাহারা দিই। লোকটা বেরিয়ে পড়লেই অনুসন্ধান করতে হবে।"

"বাড়িতে ও ছাড়া আর লোক নেই?"

"মনে তো হচ্ছে না। একদম নিঃসাড়। এরা বোধহয় একতলার ভাড়াটে।"

"ট্যাঁপা, বলেছি তো, তুই এবার গপ্‌পো লেখা ধর। গোয়েন্দা-গপ্পো।"

"আরে বাবা, গপ্‌পো কি আবার একটা হাতি-ঘোড়া? যখন পড়তে জানতুম না, তাই ভাবতুম। এখন তো দেখি কিছুই না। যা ঘটছে, সেগুলো লিখে ফেললেই গপ্‌পো।...মদনা, শিগগির চল। লোকটা বেরিয়ে পড়ল বলে।

দারুণ উত্তেজিত ভাবে দেয়াল ঘেঁষটে ঘেঁষটে একে-একে বেরিয়ে এল দুজনে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে পাশের বাড়ির কোণভাঙা রোয়াকটায় বসে পড়ল।

আর ঠিক তক্ষুনি লোকটা বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে। পুরনো দরজা, তবে বেশ মজবুত আছে।

লোকটা দুটো দরজা টেনে ধরে একটা ভারী তালা ঝুলিয়ে চাবিটা পকেটে ফেলে ঘুরে দাঁড়িয়ে ভুরু কুঁচকে বলল, "এই, তোরা এখানে কী করছিস, রে?"

'তোরা' শুনে রাগে হাড় জ্বলে গেল। তবে রাগ প্রকাশের উপায় নেই। বুঝতেই পারছে এখন তাদের চেহারার কী হাল। একে তো ওই হতচ্ছাড়া ছদ্মবেশ, তায় আবার পেটে ভাত পড়েনি। রোদের আঁচ লেগে-লেগে মুখের রং বেগুনে, তার ওপর ভয়ের তাড়নায় একটা পচা দেয়ালের খাঁজে ঢুকে পড়ে এতক্ষণ আটকে থাকা। এবং গায়ে নর্দমার জল পড়ে শুকিয়েছে। এই মূর্তিতে এদের আবার 'আপনি' বলতে আসবে কে?

কাজেই রাগ না দেখিয়ে মদনা বলল, "বসে আছি, আবার কী করছি।"

"তোদের তো কোনওদিন দেখিনি এ-পাড়ায়।"

"আজ দেখলেন।"

"তা এখানে বসে থাকার মানে?"

"কেন, এখানে বসার আইন নেই?"

কথাটা শুনে লোকটা ঘোঁত করে একটা শব্দ করল, তারপর হনহন করে এই ছোট রাস্তাটা পার হয়ে বড় রাস্তার দিকে চলে গেল।

গেল তো গেল, আসবার নামটি নেই!

তার মানে বাক্স-তোরঙ্গ গুছিয়ে রেখে কোথাও চলে গেল দরজায় তালা লাগিয়ে।

তা এ আর এমন কী ঘটনা ?

নেহাতই সাদামাঠা চেহারার একটা লোক।

পরনে মোটাসোটা পাটভাঙা একটা ধুতি। গায়ে লংক্লথের পাঞ্জাবি, পায়ে সাদা কেডস !

বয়েস পঞ্চাশও হতে পারে, পঁয়ষট্টিও হতে পারে। পঁয়তাল্লিশ বললেও হেসে ওঠবার কিছু নেই। এক-একটা লোকের এরকম চেহারা থাকে, বয়েস বোঝা যায় না।

মুদির দোকানের মালিক-টালিক হতে পারে।

কিন্তু ওর বয়েস বোঝবার দরকারটাই বা কী ?

এ-লোকের দ্বারা ভয়ানক একটা লোমহর্ষক কিছু কাজ করে ওঠা সম্ভব, এমন মনে হয় না।

অথচ ট্যাঁপার বদ্ধমূল ধারণা হচ্ছে লোকটা ভয়ানক একটা কিছু করছিল ঘরের মধ্যে। দেখছে তো এখন দারুণ উত্তেজিতভাবে এই যাচ্ছে এই আসছে, তোরঙ্গটার আশেপাশে ঘুরছে। একবার একটু টেনেও দেখল। একবার আলতারাটা খুলে ডালাটা একটু তুলে দেখে নিয়ে বন্ধ করে ফেলে একটা তালা লাগাল। মানে কী এসবের ?

কিছু একটা রহস্যময় ঘটনা ঘটছিলই ওখানে।

মদনা হেসে বলল, "কী রে ট্যাঁপা, লোকটা তো হাওয়া হয়ে গেল। তালা ভেঙে দেখবি নাকি ? যদি কোনও রহস্যভেদ করতে পারিস !"

এতে ট্যাঁপার ভারী অপমান লাগে। মুখটা হাঁড়ি করে।

মদন বোঝে। নরম গলায় বলে, "তো বসে থেকে কী হবে ? ও তো চলেই গেল। এইবার চল দেখি কোথায় ডিমের ঝোল, ভাত জোটে।"

"গুলি মার তোর ভাত-ঝোলে।"

"কেন রে ?"

"মন নাই !"

"তবে চল, বাড়িই চলে যাই। ফ্রেশ হয়ে নিয়ে বরং..."

কথা শেষ হবার আগেই দেখতে পায় লোকটা আবার হনহন করে চলে আসছে। রীতিমত উত্তেজিত ভাব।

ওদের দেখেই থমকে দাঁড়িয়ে বলে, "তোরা এখনও বসে আছিস ! ব্যাপারটা কী ?"

"ব্যাপার আবার কী ! বসে থাকতে মন হয়েছে, বসে আছি। কেন, বসায় নিষেধ আছে ?"

"ওঃ। খুব কথা তো! তা হবে না ! এখন তো তোদেরই জয়জয়কার ! এই যে ট্যাকসি ড্রাইভার ! বলে কিনা এ রাস্তায় ট্যাকসি ঢুকবে না। চিরকাল ঢুকেছে, এখন আর ঢুকবে না। তা বসেই তো আছিস, একটু 'উবগার' করতে পারবি ?"

"তার মানে, উপকার মানে ?"

"মানে কিছু না। দুটো বাক্স-তোরঙ্গ বয়ে বয়ে নিয়ে গিয়ে ট্যাকসিতে তুলে দেওয়া।"

বাক্স-তোরঙ্গ !

মাথার চুল খাড়া হয়ে ওঠে ট্যাঁপার।

মদনেরও কম নয় ! তা হলে তো ট্যাঁপার ধারণাই ঠিক।

তবু মুখে তড়পায়, "আমরা মুটে ?"

"আহা তাই কি বলছি ? তবে জোয়ান ছেলে, বুড়ো মানুষের একটু উপকার করে দিবি এই আর কি। চা খেতে পয়সা দেব !"

পরস্পরে চিমটির ভাষায় আদান-প্রদান !

"রাজি হয়ে পড়া যাক, অ্যাঁ ?"

"তা আর বলতে !"

উঠে দাঁড়ায়। বলে, "পয়সা দিতে হবে না। কই দেখি আপনার কোথায় কী মাল !"

পয়সা দিতে হবে না শুনে লোকটা ভারী হৃষ্টমুখে বলে, "তা দেখেই বুঝেছি। পয়সা নিতে চাইবে না ভদ্দরঘরের ছেলে। তো এসো বাবা ! সাড়ে ছ'টায় ট্রেন, এখন থেকে চেষ্টা না করলে তো আর...ড্রাইভারটা 'দ'-এ মজাল।"

দরজার তালাটা আবার খুলে ফেলে কপাট হাট করে বলে, "এই যে এখানে। চলে এসো।"

ছোট একটা কোণ্‌-থোবড়ানো টিনের সুটকেস নিজেই হাতে নিয়ে বলে, "তোমরা দু'জনে এই তোরঙ্গটা...এমন কিছু ভারী না। মাপেই যা একটু বড়। তবে সাবেকি জিনিস তো ! আসল স্টিলের। তাই একটু ভারী।"

তা সাবেকি যে, তাতে সন্দেহ নেই। সর্বাঙ্গে ছাল-ওঠা, এককালে কী রং ছিল বোঝবার জো নেই।

দু'জনে ধরে টান মারতেই লোকটা হাঁ-হাঁ করে ওঠে, "সামাল, সামাল ! অন্দরমে সিসা হ্যায় !"

সেই নিয়ম-নির্দেশ দিতে গেলেই হিন্দি !

ট্যাঁপা বলে, "সিসা হ্যায় না পাত্থর হ্যায় ? এতনা ভারী কীজন্যে হ্যায় ?"

"আরে বাবা, আছে, আছে। ধরো যে পাথরের বাসনটাসনও কিছু আছে ! তো সাবধানে ভাই ! বলো তো আমিও হাত লাগাই। আসলে ওই তোরঙ্গটাই যা ভারী। ভেতরের মালটি কিছুই না। বাঃ, ভারী ভাল ছেলে ! আচ্ছা, তোমরা এগোও। আমি..."

আবার দরজায় তালাটা লাগাল। টেনে দেখে নিল।

তা খুব সাবধানেই দু'জনে সেই ছাল-ওঠা মান্ধাতার আমলের ট্রাঙ্কটাকে ধরাধরি করে ট্যাকসির পিছনে ভরে দিয়ে নিশ্বাস ফেলে !

"বাঁচালে বাবা ! তা হলে বলছ কিছু নেবে না ?"

"আজ্ঞে না !"

"বেশ, বেশ।"

মদনা টান হয়ে দাঁড়িয়ে বলে, "যাচ্ছেন কোথায় ?"

"এই একটু জগন্নাথ-দর্শনে। শ্রীক্ষেত্তর আর কি ! গাড়িও জগন্নাথের !"

"গাড়ি জগন্নাথের মানে ?"

"আহা ওই যে এখন হয়েছে জগন্নাথ এক্সপ্রেস। ও ড্রাইভারসাহেব, গাড়ি ছাড়ো। সাড়ে ছ'টায় ট্রেন, এখানেই তো সাড়ে চারটে বাজতে চলল। জয় জগন্নাথ ! দুর্গা, দুর্গা !"

৪

ট্যাকসিটা চোখ-ছাড়া হতে না হতেই ট্যাঁপা দারুণ উত্তেজিতভাবে প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে বলে ওঠে, "মদনা, শিগগির একটা ট্যাকসি দ্যাখ। ফলো করতে হবে।"

"কেন ? কী হল ?"

"পরে বলছি। তুই দ্যাখ তো। আমার তো আবার চটপট হাত তোলা আসে না।"

"কলকাতার রাস্তায় হাজার-হাজার গাড়ি। তুই কাকে ফলো করবি ?"

"আরে বাবা, সব গাড়ি তো আর হাওড়া ইস্টিশনে যাচ্ছে না ? ট্যাকসির নম্বরটা মুখস্থ করে নিয়েছি।"

"বলিস কী ? অ্যাঁ ? ট্যাঁপা !"

"থাম, থাম, যা চটপট। এই, এই, ওই তো। ভগবান মিলিয়ে দিয়েছে ! ট্যাকসি !"

ট্যাকসিটা এসে থামল। সর্দারজির গাড়ি। ওদের বক্তব্য শুনে মেজাজি গলায় প্রশ্ন করল, কেন ? সামনের গাড়িকে ফলো করতে হবে কেন ? ডাকাতি-টাকাতির ব্যাপার হলে সে নেই এর মধ্যে।

বলল তার নিজের ভাষায়। তবে বুঝতে অসুবিধে হল না।

কিন্তু সে কী ! ডাকাতির কথা ওঠে কিসে ? এই হতভাগা দুটোর চেহারা দেখে কি তাই মনে হচ্ছে। আসলে ব্যাপার এই। সামনের গাড়িটা ট্যাঁপাদের আপনজনেরই। একসঙ্গে ইস্টিশনে যাবার কথা, এদের মালপত্র ওই গাড়িতে উঠে গেছে। এরাই হঠাৎ একটু কাজে পড়ে গিয়ে, সময়ে এসে উঠতে পারেনি। কিন্তু ওই গাড়িকে ধরতে না পারলে দারুণ মুশকিল।

তবু লোকটা ওদের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বাজখাঁই গলায় জানতে চাইল, ভাড়া কে দেবে ?

মদনা আর-একবার নিজেদের ছদ্মবেশকে ধিক্কার দিয়ে, চারখানা দশ টাকার নোট ওর দিকে বাড়িয়ে দিল।

লোকটা আর কিছু না বলে গাড়িতে স্টার্ট দিল।

ট্যাঁপার মধ্যে সমুদ্রের কল্লোল।

ট্যাঁপার মধ্যে অরণ্যের ঝড়ের দাপাদাপি।

তবু ট্যাঁপা শান্ত ভাব রাখবার চেষ্টা করে। ঠাণ্ডা গলায় বলে, "তোর বাসনাও মিটল। ট্যাকসি চাপলি।"

তারপর কষ্টে চাপা গলায় বলল, "আরও একটা বাসনা মিটবে।"

"সেটা আবার কী ?"

"কী তা দেখতেই পাবি। মিথ্যে-মিথ্যে কি আর ট্যাকসি ভাড়া করে..."

"বলেই ফ্যাল না। আমি তো আবার তোর থেকে কম দেখি।"

ট্যাঁপা ভেতরের চাঞ্চল্য দমন করে হাওয়ায় ভাসা গলায় বলল, "এতদিনে তুই একটা সত্যি মার্ডার কেস পেলি। ওই তোরঙ্গটার মধ্যে একটা লাশ চলেছে।"

"কী ? কী ? কী বললি ?"

উত্তেজনা চাঞ্চল্য ঝড় জলকল্লোল সব সত্ত্বেও ঠোঁটে আঙুল, প্রায় নিঃশব্দ কথা।

ড্রাইভার সর্দারজি হলেও কে বলতে পারে তোমার আমার থেকেও ভাল বাংলা জানে কি না।

ট্যাঁপা বলল, "হ্যাঁ ! যা বলছি ঠিক। একটা লাশ যাচ্ছে। মহিলার লাশ।"

"আজ বোধহয় তোকে গপ্‌পোয় পেয়েছে ট্যাঁপা। এই এক্ষুনি গাড়ি ফলো করার ব্যাপারে দিব্যি কেমন একখানা গপ্‌পো বানালি।"

"এটাও যদি তাই ভাবিস তো ভাব ! তবে তাতে তোর একটা মার্ডার কেস মারা যাবে। তোরঙ্গটার তলায় হাত বুলিয়ে দেখেছিস ?"

"তলায় ? ওই অত বড় তোরঙ্গটার তলায় হাত বুলোব ? কী করে ?"

ট্যাঁপা সংক্ষেপে ঘটনাটি বুঝিয়ে দিল। তোরঙ্গর মালিক যখন ওটা বার করে ফেলার পর পিছন ফিরে ঘরের তালা লাগাচ্ছিল, আর তারা দুই বন্ধুতে ওটাকে রোয়াকের ওপর থেকে নামাচ্ছিল, তখন মদনা রাস্তায় দাঁড়িয়ে নীচের দিকটা ধরে ছিল, আর ট্যাঁপা রোয়াকের ওপর থেকে। সেই সুযোগের মুহূর্তে ট্যাঁপা একবার তলায় হাত বুলিয়ে দেখতে গিয়ে দেখে চমকে গেছে, তলায় ছুরি দিয়ে কাটার মতো টানা লম্বা দুটো কাটা, সিকি ইঞ্চির মতো চওড়া ফাঁক !

তা তাতে আর কী বোঝবার ছিল ? যদি না তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে পড়ে ঝুলে থাকত একটু সরু চুলের গোছার আগা, মানে মহিলার চুলের।

মানে ওই খুনে শয়তানের মারণাস্ত্র !

মানে ওই চুলের ডগা থেকেই সব ফাঁস। আর ফাঁস থেকেই ফাঁসি !

"ট্যাঁপা, তুই ঠিক দেখেছিস ?"

"নিয্যস !"

"কিন্তু ডেডবডি পাচার করতে ওই ফাঁকাটুকু রাখার দরকার কী ? তার তো আর দম আটকে মরার ভয় নেই !"

"বুঝছিস না ? পচে উঠলে দুর্গন্ধ ছাড়বার ভয়ে। বাতাস পেলে চট করে পচবে না !"

"আচ্ছা, শুধু একটা ডেডবডি পাচার করতে তাকে রেলগাড়িতে চাপিয়ে শ্রীক্ষেত্রে নিয়ে যাচ্ছে ?"

ট্যাঁপা বিজ্ঞের গলায় বলে, "নিয়েই যাবে, তার মানে নেই। রেলগাড়িতে ছেড়ে রেখে চলে যেতে পারে। তবে আমাদের হাতে যখন পড়েছে, তখন আর রেলগাড়িতে ছেড়ে যেতে হবে না বাছাধনকে !"

"ট্যাকসিটা আর দেখতে পেয়েছিস ?"

"পাইনি ! পাব !"

ভারী আত্মস্থ এখন ট্যাঁপা। বলে, "ড্রাইভার বলেছে, রাস্তায় জ্যামের সময় ধরে ফেলা যাবে।"

"কী করে ?"

"কেন ? নম্বর মুখস্থ রয়েছে না ?"

"যদি আগেভাগে স্টেশনে পৌঁছে ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে ফেলে ? তখন আর ওই নম্বরে কী লবডঙ্কা হবে ?"

"আরে বাবা, হাওড়া স্টেশনের 'পেলাটফরমটা' নেই ? 'জগন্নাথের গাড়ি' ছাড়বার মুখে তার সামনের পেলাট্‌ফরমে দাঁড়ালেই হবে। ওই গন্ধমাদনটিকে তো আর পকেটে পুরে ফেলতে পারবে না।"

"কিন্তু আসামি তো ট্রেনে উঠে পড়ে 'কুউউ ঝমঝম' বেরিয়ে যাবে ! তারপর ?"

তারপর ? কেন ওরাও সেই কামরায় উঠে পড়তে পারবে না ? হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকবে ?

"আমরাও উঠে পড়ব ?"

রেগে ওঠে মদনা, "আমাদের টিকিট আছে ?"

ট্যাঁপা ধিক্কারের গলায় বলে, "এইটা একটা প্রেবলেম হল ?"

"প্রোবলেম ।"

"মদনা !" ট্যাঁপা রেগে উঠল, মরণ-বাঁচন কালেও আর কথার খুঁত কাড়তে আসিসনে। গাধা পিটিয়ে খোঁড়া ঘোড়া হতে পারে। রেস খেলার ঘোড়া হয় না। বলি, টিকিট নেই বলে রেলগাড়িতে ওঠা যাবে না ? যত যত লোক রেলগাড়িতে ওঠে, সব্বাইয়ের টিকিট থাকে ?"

"ধরা পড়লে হ্যানস্থা হয় ।"

"ট্যাঁকে টাকা থাকলে হয় না। টিকিটমাস্টার এলে নিজে থেকেই গিয়ে বলিস, তাড়াতাড়িতে টিকিট কাটতে পারিনি, যা লাগে নিন ।"

"আর এই বেশভূষা ? এই পরে রেলগাড়িতে উঠব ?"

"তাতে কী ? গরিবদুঃখীরা রেলগাড়ি চড়ে না ? যাচ্ছিস একটা শুভ কাজে, কেবল কথার ফ্যাচাং ! তোর কথার জ্বালায় ট্যাকসির নম্বরটা গুলিয়ে যেতে বসল। 'জ্যাম' একটা পেলে হয়। ধরে ফেলা যাবে ।"

কিন্তু 'জ্যাম' কি এল না ? গাড়ি কি জ্যামের মুখে পড়ল না ? পড়ল। সবই হল, কিন্তু ট্যাঁপা যা ভেবে নিশ্চিন্ত ছিল, তা হল না।

সেই পাপী-পাতকী ট্যাকসিটাকে দেখা গেল না।

এক গোছা টাকা খরচ করে, সর্দারজিকে তাড়া দিয়ে দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসে এই !

স্টেশনে তো পৌঁছেই আসা হল। কোথায় কী।

মিটার দেখে ভাড়া মিটোনোর দরকার নেই, আগেই টাকা দেওয়া আছে। সর্দারজি কিছু বোধহয় ফেরত দিতেই আসছিল, ওরা হাত নেড়ে নেমে পড়েই ছুট মারল প্ল্যাটফর্মের মধ্যে ঢুকে পড়তে।

কিন্তু এ কী ! কত ভিড় ! সারা কলকাতার লোকই কি আজ হাওড়া ইস্টিশনে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ? এর মধ্যে থেকে কোথায় খুঁজবে সেই হাড়গিলে লোকটাকে, আর তার রং-চটা ট্রাঙ্কটাকে ! আরও কত বিশাল বিশাল বাক্স, প্যাকিং-বাক্স, ট্রাঙ্ক, সুটকেস, জগদ্দল বেডিং, বালতি, কুঁজো, ঝোড়াঝুড়ি কুলিবাহিত হয়ে চলেছে জনস্রোতের মতো ! দুমদুম করে ছুটছে।

দাঁড়িয়ে পড়ে দেখবার চেষ্টা করতে গেলে তো ধাক্কা খেয়ে উলটে পড়তে হবে।

এতক্ষণের আত্মস্থ ট্যাঁপা এখন কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে ওঠে, "হাতের মুঠো থেকে পাখি ফশকে পালিয়ে গেল মদনা ? একটা শয়তান খুনি নাকের ওপর দিয়ে জলজ্যান্ত একখানা ডেড়বডি পাচার করে নিয়ে গেল ।"

ভিড় থেকে সরতে সরতে আর পিছলোতে পিছলোতে, এগোনো দূরে থাক, পিছিয়েই পড়ছে এরা। এক জায়গায় একেবারে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়ে হতাশ হয়ে বলল ট্যাঁপা, "আমাদের কপালটাই মন্দ ।"

এতক্ষণ ট্যাকসির মধ্যে ড্রাইভারের কান বাঁচিয়ে কথা হচ্ছিল, এখন এই সমুদ্রকল্লোলের মধ্যে কে কার কথায় কান দেয় !

মদনা বলল, "ডেড়বডিই যে ছিল, তাতে এত শিওর হলি কী করে, তাও তো বুঝছি না। ট্রাঙ্কটা যে ছুরিকাটা, তার কী মানে ? এমনিই ফুটো-ফাটা থাকতে পারে। মনে হচ্ছে তিন পুরুষ আগের জিনিস ।"

"আর ফুটো-ফাটা দিয়ে বেরিয়ে আসা মেয়েছেলের চুলের ডগা ? সেটা কী ?"

"চুলেরই ডগা, তারই বা মানে কী ? আর কিছুও হতে পারে ।"

"আর কী হবে ?"

"ইয়ে, ধর বেড়ালের ল্যাজ···কিম্বা···"

"বেড়ালের ল্যাজ ! তার মানে বলতে চাস, এত কাণ্ড করে একটা বেড়াল পাচার করতে বেরিয়েছে লোকটা। ওর মাথা খারাপ, না তোর মাথা খারাপ ? শিওর কেন হয়েছি, সে-কথা তো তোকে বলাই হয়নি। ড্রাইভারটা পাছে শুনতে পায়, আর তুই পাছে নর্ভাস হয়ে যাস সেই ভয়ে···"

আসলে অবশ্য তা নয়। আসল কথাটা ট্যাঁপা তার নিজের গোপন স্টকে রাখতে চেয়েছিল মোক্ষম দরকারের সময় বার করবে বলে।

"নর্ভাস !"

"মদনা, ফের ? ফের এই মোক্ষমকালে কথার খুঁত কাড়া ? আমি মুখ্যু, আমি গাঁইয়া, হল তো ?"

"আচ্ছা ! ঠিক আছে, আর বলব না ।"

"বলবি না কেন, হাজারবার বলবি। তবে সময়-বিশেষ আছে তো ?"

"ঠিক আছে। কিন্তু কথাটা কী ? শুনে তুই নার্ভাস হোসনি ?"

ট্যাঁপা গলার স্বর নামায়, "আমি যখন শুনেছি, আমার মাথার চুল আলপিনের মতো দাঁড়িয়ে উঠেছিল, গায়ের লোম কাঁটাপেরেক-তুল্য খাড়া হয়ে গেছল ! গলির মধ্যে সেই দেয়ালের ঘুলঘুলিতে কান চেপে পষ্ট শুনলুম কে বলে উঠল, 'আস্ত ঢোকানো যাবে না। ধড়মুণ্ডু আলাদা করে ফেলতে হবে'। কাগজ আছে তো ? কাগজে মুড়িয়ে নিয়ে···"

ছিটকে ওঠার জায়গা নেই, তবু মদনা ছিটকে ওঠে। বলে, "কই, এ-কথা তো আগে বলিসনি ? তা হলে তো তখনই ব্যাটাকে খ্যাঁক করে ধরে ফেলা যেত। তার বদলে আমরাই কিনা মরতে সেই কাটা ধড়মুণ্ডু নিজেরা বয়ে ট্যাক্সিতে তুলে দিলাম। আবার পয়সা খরচা করে ফলো করতে ছুটলাম। সত্যিই তুই একটা বুদ্ধু ।"

ট্যাঁপা গোঁজ হয়ে বলল, "টাইম পেলাম কখন ? চারদিকে লোক ।"

"লোক তো কী ? তাদেরই বলতাম, খোলান এই ঢাউশ তোরঙ্গ ! বিপদকালে পাবলিকই সহায় রে। ইশ, একটা সত্যি মার্ডার কেস হাতে এসেও এল না !"

"দুর্ভাগার কপাল। কিন্তু সেই কী যেন নম্বরের টেকসিটা কি হাওয়া হয়ে গেল ? একবারও তো চোখে পড়বে। গাড়ির পেছনের ইয়েটার তো ডালা ভালমতো বন্ধ হয়নি। দিশ্যমান হয়েই ছিল ।"

বলছে, এই সময় হঠাৎ সেই খ্যানখেনে বাজখাঁই গলাটি শোনা গেল, "দো কুলি কাহে ? অ্যাঁ, দো কুলি 'কাহে ? একমেই হোগা !"

এ কী ! এ যে সেই স্বর্গলোকের স্বর।

ট্যাঁপা-মদনার কানে যেন উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত বর্ষিত হল।

দেয়ালে সেঁটে গিয়ে কিছু মানুষজনের পেছনে নিজেদেরকে আড়াল করে দেখতে পেল এরা, হ্যাঁ, সেই লোক। সেই ট্রাঙ্ক। দুটো কুলিতে ধরাধরি করে টেনে বার করেছে সেই সন্দেহজনক বাক্সটি।

সঙ্গে-সঙ্গে সেই চিৎকার, হুঁশিয়ার ! আস্তেসে। উস্‌কো অন্দরমে পাত্থরকা বর্তন হ্যায় !"

"ওরে, এখন বুদ্ধি খেলেছে। নিজেই বলছে পাত্থরকা বর্তন।"

"কিন্তু, এত হুঁশিয়ার-হুঁশিয়ারের কী আছে ? ডেড্‌বডির তো আর পড়ে গেলে মৃত্যুভয় নেই ?"

"বুঝছিস না ? যদি কোনওমতে ছিটকে বেরিয়ে পড়ে। এই, এই, চলে গেল যে..."

ওঃ, হাওড়া স্টেশনের কুলির মতো এমন ছোটায় রেস দিতে কেউ পারবে না। ওই পর্বতপ্রমাণ মোট মাথায় নিয়ে ঝড়ের বেগে দৌড়চ্ছে।

আর পিছু-পিছু সেই লোক হাঁ-হাঁ করে ছুটছে। 'হুঁশিয়ার ! সাবধান। গির যায়গা তো সর্বোনাশ হো যায়েগা !'

ছুটলে কী হবে, নাগাল পেলে তো !

কিন্তু ইত্যবসরে কুলির নাগাল পেয়ে গেছে দুই শখের গোয়েন্দা। এবং ওই ছুটন্ত প্রাণীটার পিঠের দৃশ্যটি দেখে প্রায় বরফ হয়ে গেছে।

ট্রাঙ্কটার তলা থেকে চুঁইয়ে-চুঁইয়ে ফোঁটা-ফোঁটা রক্ত পড়ে চলেছে কুলিটার ফতুয়ার পিঠে। টের পাচ্ছে না বেচারা ! সন্দেহ প্রত্যক্ষ প্রমাণে পরিণত।

এর পর আর সন্দেহের কিছু থাকে না।

টিকিট না থাকার প্রশ্নও ওঠে না।

শুধু ওই 'টু টিয়ার' সেকেণ্ড ক্লাস গাড়িটার যে-কামরায় সেই বৃহৎ মোটকে মল্লযুদ্ধ করে তোলা হল, সেই কামরাতেই উঠে পড়তে হবে গাড়ি ছাড়ার পূর্ব মুহূর্তে।

ওঃ, শয়তান লোকটা কিনা রেলের সিট-এর তলা থেকে আধখানা বেরিয়ে-আসা সেই ট্রাঙ্কের ওপর নিজের কুচ্ছিত কেডস-জোড়া খুলে রেখে একটা বিড়ি ধরাল।

ছিঃ। হোক ধড়মুণ্ডু আলাদা ডেড্‌বডি, তবু একটা মৃতদেহ তো ! এতটুকু সম্মান নেই ?

ট্যাঁপা-মদনা অপরদিকের জানলার ধারে মুখ ফিরিয়ে পিঠে-সাঁটা অনুভূতির দিব্যদৃষ্টি দিয়ে ওয়াচ করতে থাকে।

শুনতে পেল, একজন সহযাত্রী প্রশ্ন করল, "এত বড় ট্রাঙ্কে আপনার কী যাচ্ছে ?"

লোকটা গম্ভীরভাবে বলল, "সংসারের যথাসর্বস্ব।"

"ওঃ, বদলি হয়ে যাচ্ছেন বুঝি ?"

"জেনে আপনার কোনও লাভ আছে ?"

"না, লাভ আবার কী !"

লোকটা বেজার হয়ে ঘুরে বসে বলল, "অন্যের অসুবিধে ঘটানোটা আইন নয়, সেটাই মনে করিয়ে দিচ্ছি।"

"থাক, থাক। এই শর্মা বৈকুণ্ঠ বসাককে আর আইন দেখাতে আসবেন না।"

ট্যাঁপা-মদনা পরস্পরকে চিমটির ভাষায় বোঝাল, নামটা জানা হয়ে গেল।

খানিক পরেই গাড়ি রামরাজাতলায় থামল। থামবার কথা ছিল কি না, কে জানে। স্টেশনে খাবারদাবারওলারা ঘোরাঘুরি করছে?

মদনা বলল, "ট্যাঁপা, তোর সেই ডিমের ঝোল ভাত আর খাওয়া হল না।"

"বলেছি তো গুলি মারো।"

"পেট তো জ্বলছে।"

"জ্বলুক। তা বলে অসতর্ক হওয়া চলে না।"

ইতিমধ্যে বৈকুণ্ঠ বসাক হাতের বিড়ি অন্য জানলা দিয়ে ফেলে দিয়ে, এদিকে এসে "এই চা" বলেই বলে উঠলেন, "যাচ্চলে, গাড়ি ছেড়েই দিল।"

আর তারপরই হঠাৎ এদের দেখতে পেয়ে স্রেফ কাঁকড়াবিছের কামড় খাওয়ার মতো শিউরে উঠে বললেন, "তোরা সেই ছেলে দুটো না? তোরা এখানে কোথা থেকে?"

"আজ্ঞে, আপনি যেথা থেকে।"

"তো, তোরা রেলগাড়িতে উঠে এসেছিস মানে? মতলবটা কী?"

মদনা গম্ভীরভাবে বলে, "কেন? আমাদের জয়জগন্নাথ দর্শন করতে নেই?"

বৈকুণ্ঠ বসাক দারুণ সন্দেহের গলায় বলেন, "তো···তো···তোদের টিকিট আছে?"

ট্যাঁপা বলে ওঠে, "না থাকে, টিকিটমাস্টার এনে ধরিয়ে দেবেন। যদি অবিশ্যি সাহস থাকে!" বলে ট্যারাচোখে তাকাল ট্রাঙ্কটার দিকে।

বৈকুণ্ঠ দু' পা পিছিয়ে এসে বলেন, "সাহস থাকবে না মানে? সাহস থাকবে না মানে? তোদের তো ভারী ট্যাঁকটেঁকে কথা।"

পিছিয়ে এসে নিজের সিটে বসেন গোঁজ হয়ে।

এরা তাল করতে থাকে কোথায় একটু বসা যায়, যেখান থেকে ওঁকে নজরে রাখা যায়।

ঘুমনোর প্রশ্ন নেই। সারারাত পালা করে জাগতে হবে দু'জনকে। অবশ্য ঘুম আসবেও না। পেটের মধ্যে ইলেকট্রিক গিটার বেজে চলেছে।

সেই সকালবেলা টাকা বারো-চোদ্দর বেগুনি, আলুর চপ, আর দু' টাকার চিনেবাদাম। ব্যস!

তারপর গুলু-ওস্তাদ। তারপর পাঁই-পাঁই ছুট। তারপর ইঁদুর-কলে আটকা পড়া। তারপর ট্যাকসি ফলো করা। তারপর বিনটিকিটে রেলগাড়িতে চেপে বসা।

এতেও যদি পেট ইলেকট্রিক গিটার না বাজাতে থাকে, কিসে বাজাবে?

পাষণ্ড বৈকুণ্ঠ বসাকটা ইতিমধ্যে তার হাতের সেই টিনের সুটকেসটা থেকে একটি অ্যালুমিনিয়ামের কৌটো বার করে তার মধ্যে থেকেই তারিয়ে-তারিয়ে পরোটা আর আলু-চচ্চড়ি সাঁটতে থাকে। কী নৃশংস! কী পাতকী পামর! বিবেক বলে কিছু নেই! ওই ডেডবডির ট্রাঙ্কের ওপর পা তুলে বসে পরোটা আলু-চচ্চড়ি খাচ্ছে।

খেল, হাত ধুতে গেল।

ট্যাঁপা বিদ্যুদ্বেগে উঠে গেল পিছু-পিছু। বোঝা গেছে! এই মওকায় পালাবে।

নাঃ। পালাল না। হাত ধুয়ে ফিরে এল।

ট্যাঁপা ফিরে আসতে মদনা চিমটি দিয়ে বলল "এখন পালাবে কী! চারদিকে সবাই জেগে। সবে রাত ন'টা।"

তা বটে। এসব দুষ্কর্ম গভীর রাতের জন্যে তোলা থাকে।

এখন যদি টিকিটচেকার ওঠে···

কী আশ্চর্য, টিকিটচেকারের নামগন্ধও নেই।

এদেরই ভাগ্য!

শখের গোয়েন্দা দু'জন বসে-বসে ঢুলতে ঢুলতে খালি-পেটের দুর্বলতায় কখন একসময় ঘুমিয়ে পড়ল।

৫

ঘুম ভাঙল পুরী স্টেশনে এসে পৌঁছে, আচমকা একটা কলকোলাহলে। সমবেত কণ্ঠে ঐকতান, 'কুলি, কুলি, এই কোলি! ইধার, ইধার।'

চোখ খুলেই সেইদিকে তাকিয়ে দেখল ট্যাঁপা।

সর্বনাশ হয়ে গেছে। ট্রাঙ্কটা যেমনকে তেমন বসানো রয়েছে, বৈকুণ্ঠ বসাক হাওয়া।

এদিকে গাড়ির সব লোক হুড়মুড়িয়ে নেমে পড়ছে। যার যার মাল চলে যাচ্ছে তাদের কুলির মাথায়।

ট্যাঁপা আর্তনাদ করে ওঠে, "মদনা, তুইও ঘুমিয়ে মরলি? এখন উপায়?"

"উপায় আর কিছু নেই। নেমে পড়ি আয় চটপট। নইলে শেষ পর্যন্ত ওই মাল আমাদের ঘাড়েই পড়বে। দেখবে আমাদের সঙ্গে আর কোনও মালপত্তর নেই! এই হতচ্ছাড়া পোশাক, এদিকে গেঁজেয় টাকা!"

সত্যিই বটে, দেরি করা ঠিক নয়।

আরে, আরে, এ কী! বৈকুণ্ঠ বসাক যে বীরবিক্রমে উঠে আসছেন। সঙ্গে দুটো কুলি নিয়ে। কী ভাগ্যি দুটো।

তার মানে কুলি ডাকতে গেছল। তার মানে নিশ্চিন্ত আছে, তার মাল-মোট ফশ করে কেউ টেনে নিয়ে যেতে পারবে না।

তার মানে ওই পাপের বোঝা ফেলে পালায়নি!

বোঝা গেছে। বেশি ঘোড়েল। জানে ওই পুরনো তোরঙ্গ থেকেই হয়তো ধরা পড়তে পারে। তাই সোজাসুজি একেবারে সমুদ্রে ফেলে দিতে এসেছে।

ওঃ! নরঘাতকের মাথায় কত প্যাঁচ খেলে।

ওদের মুখোমুখি হতেই বৈকুণ্ঠ বসাক খিঁচিয়ে উঠলেন, "আঃ, সক্কালবেলা আবার এই অপয়া মুখ
ফেউ লেগেছে তো। নামবি তো নেমে যা।"

"আমাদের জন্যে কী? আপনি আপনার দামি মাল নিয়ে নামুন তো। আমরা ঠিকই পৌঁছে যাব!"

বৈকুণ্ঠর চোখ দুটো কুঁচকে যায়। এই ছোঁড়া দুটোর মতলব বোঝা যাচ্ছে না।

কিন্তু কুলি নিয়ে তো আর ভাবনা-চিন্তার সময় থাকে না। ততক্ষণে তো তারা ট্রাঙ্কটাকে ঘষটে টেনে নিয়ে মাথায় তোলে। দুমদাম নেমে যায়।

কেউই কিছু তাকিয়ে দ্যাখে না। দ্যাখে শুধু যারা দেখবার। স্পষ্টই দেখতে পায়, তোরঙ্গর তলায় জমে থাকা খানিকটা রক্ত ঘেঁষটে টানার জন্য লম্বা দাগে পরিণত হয়ে গেছে।

এর পর আর কী!

আবার ঊর্ধ্বশ্বাসে ফলো করা!

আবার সেই পুরনো গল্প। সামনের রিকশায় তাদের গার্জেন রয়েছে। তার সঙ্গেই এদের জিনিসপত্র। ধরতে হবে ওটাকে।

পুরীর রাস্তা জনাকীর্ণ নয়। বিশেষত এই ভোরে। দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু ফলো করার জন্যে কি বেশি ছুটতে হল?

না, না! বৈকুণ্ঠ বসাক তো তাঁর সেই সংসারের সর্বস্ব ভরা মোটটি জবরদস্তি একটা রিকশায় তুলে দিয়ে নিজেও তাতে উঠে বসেছেন।

কাজেই নিজেদের রিকশাকেই বলতে হচ্ছে ওদের "একটু আস্তে।"

বাজখাঁই গলা থেকে উচ্চারিত হতে শোনা গেল, "ইধরমে কোই ধরমশালা নেই হ্যায়?"

"অছি," বলে রিকশাওলা আর একটু এগিয়েই একটা ভাঙামতো কিন্তু বেশ অনেকগুলো ঘরওলা একটা বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করাল।

বৈকুণ্ঠ বসাক তাকে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে বলে, "এই, তুমি থোড়া দাঁড়াবে? থোড়া বাদ সমুদ্দুরমে যায়েগা।"

লোকটা কোনও জবাব না দিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল।

আর তখনই ঘ্যাঁক করে ধরে ফেলার মতো গলায় পাশ থেকে বলে উঠল ট্যাঁপা, "বুঝেছি, একেবারে সমুদ্দুরে ডুবিয়ে দিয়ে প্রমাণ লোপের চেষ্টা, কেমন? মা-গঙ্গায় বুঝি সুবিধে হল না? সর্বদা জল-পুলিশ। সমুদ্দুরের তো মা-বাপ নেই। খুব সুবিধে।"

মদন বলে উঠল, "সমুদ্দুরে কে কার কড়ি ধারে, কেমন? কিন্তু সে আর হবে না। ওই ধড়-মুণ্ডু পাচার করা চলছে না।"

এখনও বেশ সকাল। ধর্মশালার ধারেকাছে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। গোয়েন্দারা সাহসে ভর করে বলে ওঠে, "এতে কী আছে?"

বৈকুণ্ঠ বসাক একটু থতমত গলায় বলেন, "কী আছে তাতে তোদের কী কাজ বাপু? সেই কলকাতা থেকে টিকটিকি-পুলিশের মতন সেঁটে রয়েছিস কী মতলবে, তাই শুনি?"

"টিকটিকি-পুলিশকে ধরিয়ে দেবার মতলব। আর কিছু না।"

"বটে, বটে! ধরিয়ে দিবি? কী ধরিয়ে দিবি? অ্যাঁ। কী এমন করেছি আমি? ধরিয়ে দেব। যা, যা, বিরক্ত করিসনে।"

"যা ধরিয়ে দেব তা দেখতেই পাবেন। ট্রাঙ্ক খুলুন।"

"বটে। তোদের হুকুমে না কি? এই ধর্মশালার লোকেরা, আমার মাল ঘরে তুলিয়ে দাও!"

"না, ঘরে ওঠানো চলবে না।"

"আলবাত চলবে!"

"না!"

"হ্যাঁ!"

ব্যস। এই সামান্য গোলমালেই, এদিক-ওদিক থেকে লোক এসে যায় কিছু। বেরিয়ে আসে ধর্মশালার লোকও।

কী ব্যাপার?

ব্যাপার আর কিছুই নয়, নিরীহ বৈকুণ্ঠ বসাক একটু জগন্নাথ দর্শনে এসেছেন, তো এই গুণ্ডা-মস্তান দুটো তাঁর ট্রাঙ্কটিকে ছিনতাইয়ের মতলবে সেই কলকাতা থেকে ছিনেজোঁকের মতো লেগে আছে। এখন জোর করে কেড়ে নেবার তাল করছে।

"ছিনতাই!"

একটা লোক হো-হো করে হেসে ওঠে, "এ তো মশাই গন্ধমাদন।"

কিন্তু বৈকুণ্ঠ বসাক কি তাতে দমেন? তাঁর দিকে যুক্তি নেই? জলের মধ্যে জাহাজ ছিনতাই হতে পারে, আকাশের

গায়ে এরোপ্লেন ছিনতাই হতে পারে, আর স্থলপথে তুচ্ছ একটা ট্রাঙ্ক ছিনতাই হতে পারে না ?

"তা বেশ তো, তুচ্ছই যদি তো খুলে দেখাতে দোষ কী ?"

"কেন দেখাব ? ওর মধ্যে আমার প্রাইভেট সব ব্যাপার !"

মদনা অটলভাবে বলে, "তা হলে পুলিশকেই দেখাবেন। এখানের থানাটা কোথায় বলে দিন তো আপনারা।"

"কী ! কী বললি পাজিরা ? সামান্যর জন্যে পুলিশ দেখাতে এসেছিস আমায় ? নিজেরা দু-দুটো জোয়ান বিনা টিকিটে আসিসনি ? জানি না আমি," তড়পাতে থাকেন বৈকুণ্ঠ বসাক, "নিজেদের বেলায় দোষ হয় না ? আর আমার একখানা তিনছটাকি গিন্নি, তাকে যদি আমি বাক্সে ভরে..."

সেই হেসে-ওঠা লোকটা এখন অবাক হয়ে বলে, "কী বললেন ! গিন্নিকে বাক্সয় ভরে নিয়ে এসেছেন টিকিট ফাঁকি দিতে !"

বৈকুণ্ঠের তড়পানি থামে না, "এসেছিই তো। ঠাকুমার আমলের এই ফুটোফাটা ট্রাঙ্কটার মধ্যে গিন্নিকে ভরে নিয়ে আমি গয়া-কাশী-মথুরা-বৃন্দাবন-দিল্লি-আগ্রা কোথায় না বেড়িয়ে এসেছি ! কেউ টের পায়নি। তিনছটাকি একটা মানুষ, হাফ-টিকিট কাটলেও যার দাম উসুল হয় না, তার জন্য আস্ত একখানা ফুল টিকিট কাটবে, এত 'ফুল' নয় বৈকুণ্ঠ বসাক। এই করেই সব তীর্থ সেরেছি, বাকি ছিল জগন্নাথধাম। তা শেষরক্ষে হল না। এই মস্তান দুটো আমার পেছনে লেগে..."

ধর্মশালার ম্যানেজার চক্রবর্তী বলে ওঠেন, "আমি তো আপনার কথার মানে বুঝতে পারছি না মশাই ! বলতে চান এই ট্রাঙ্কের মধ্যে আপনার গিন্নি ? এইভাবেই আপনি রেল কোম্পানিকে ফাঁকি দেন ?"

ট্যাঁপা বলে ওঠে, "ওই গুলমার্কা গপ্পো আপনি বিশ্বাস করছেন ? ফাঁকি রেল কোম্পানিকে নয়, আপনাকেই দিচ্ছেন। আমি বলছি যদি গিন্নিই হন তো আস্ত নয়, ধড়মুণ্ডু আলাদা করা তাঁর ডেডবডি।"

ডেডবডি ! শব্দটি শোনা মাত্র জনতা পিছোতে থাকে।

আর চক্রবর্তী বলে ওঠেন, "দুগ্‌গা, দুগ্‌গা ! এখানে এসব গোলমেলে লোকের জায়গা হবে না মশাই। কেটে পড়ুন। কেটে পড়ুন।"

ঝপ করে ঠাণ্ডা মেরে যান তেজী বৈকুণ্ঠ বসাক। করুণ গলায় বলেন, "এইটা একটা কথা হল মশাই, দুটো মস্তানের ফচকেমিতে বিশ্বাস করে..."

"তা আপনারই বা বাক্স খুলে দেখাতে আপত্তি কী মশাই ! দেখিয়ে সন্দেহ ভঞ্জন করে দিন।"

"তবে করি," বলে ট্যাঁপাদের দিকে একটি অগ্নিদৃষ্টি হেনে, নেহাত অনিচ্ছের ভাবে পকেট থেকে চাবি বার করে ট্রাঙ্কের ডালা খুলে তুলে ধরেন বৈকুণ্ঠ বসাক।

সন্দেহ ভঞ্জন হয় !

হাঁটু মুড়ে শুয়ে থাকা একটি প্যাঁকাটির মতো রোগা আর পৌনে চার ফুট মতো লম্বা মহিলা উঠে বসে বলে ওঠেন, "মাছ তোলো, বেরোব কী করে ?"

ওই প্যাঁকাটির মধ্যে থেকেও কিন্তু সানাই বেজে ওঠে !

বৈকুণ্ঠ বসাক হেঁট মুণ্ডে একে-একে তুলে বার করেন, খবরের কাগজে মোড়া একটি বৃহৎ কাতলা মাছের ধড় আর মুণ্ডু। কাগজ রক্তে মাখামাখি।

বেরিয়ে পড়ার পথ পেতেই মহিলা চিংড়ি মাছের মতো তিড়িং করে বেরিয়ে এসে বলেন, "হয়েছে তো ? রেল কোম্পানিকে ঠকাবার ফল ফলেছে ? যখনই রেলগাড়ি চড়ব তখনই বাক্সবন্দী হয়ে। গলায় দড়ি আমার তীর্থ দর্শনে।"

বৈকুণ্ঠর অকুণ্ঠ উক্তি, "বাক্সবন্দী তো কী ? দমবন্ধ হয়ে মরেছ কখনও ? বরাবরই হাত-পা মেলে বালিশে মাথা দিয়ে যাওয়া-আসা। আমার ঠাকুমা ওর মধ্যে ঘড়া, গামলা, জগ, পিলসুজ রাখত ! ড্যাম্পো মেজেয় পড়ে থেকে তলা ঝাঁঝরা হয়ে এসেছে, তবু এত মজবুত, ডালার ওপর গণ্ডার লাফাতে পারে। এবারে কাল করল তোমার সাধের মামার বাড়ির পুকুরের মাছ।"

"কী ! কী বললে ? আমার মামার বাড়ির পুকুরের মাছ !" সানাই বেজে ওঠে চড়া সুরে।

"করলই তো। আলবাত করল। কী বলব ধর্মশালামশাই, বেরোবার মুখে বারাসাত থেকে এক লোক আধমনি এক কাতলা মাছ নিয়ে এসে হাজির। মামার পুকুরে জাল ফেলা হয়েছে। আদরের ভাগ্নিকে খেতে দিয়েছেন। তো বললাম, এখন মাছ নিয়ে কী হবে, পাড়ায় বিলিয়ে দিয়ে যাও। তো প্রাণ ধরে দিতে পারলেন না। আহা, মামার পুকুরের মাছ ! শুনবেন কথা ? বলে কিনা ও আমি কাগজে মুড়ে বালিশের মতন করে ওর মধ্যেই নিয়ে যাব ! মাছটি তো আড়ে-দীর্ঘে ওনার দুগুণ। ওই আধমনি মাছের জন্যে আমার ডবল ডবল কুলি ভাড়া লাগল। ফি বারে বলি, হুঁশিয়ার। সিসা কা বর্তন হ্যায়। এবার বলতে হল, পাথথরকা ! যাক গে, আজ এখানেই মাছটার সদগতি হোক, কী বলেন, কেটেকুটে সবাই মিলে উদ্ধার করা যাবে।"

হাসি ফুটে ওঠে চক্রবর্তীর মুখে। মাছকে কেটেকুটে ফেলার প্রসঙ্গে আর মাছের মালিককে কেটে পড়তে বলা যায় না। অতএব...

কিন্তু ছেলে দুটো ? তাদেরই তো পুলিশে দেওয়া উচিত। মিছিমিছি একটা নিরীহ ভদ্রলোককে...

ছেলে দুটো ততক্ষণে হাওয়া। ওরা তখন সমুদ্রের ধারে।

মদনা বলল, "খুব একখানা মার্ডারকেস পাইয়ে দিলি ট্যাঁপা।"

ট্যাঁপা দাঁত বার করে বলল, "এক হিসেবে তাই। আমাদের কেসটা তো মার্ডারই হল।"

মদনা আরও রাগের গলায় বলল, "যাক, তোর চিরদিনের বাসনাটি মিটেছে তো ?"

ট্যাঁপা ঘাড় চুলকে বলল, "তা একরকম মিটেছে। শুধু ওই ডিমের ঝোল-ভাতটা হয়ে গেলেই জম্পেশ হত !"

ছবি দেবাশিস দেব

লটারির টিকিট

মঞ্জিল সেন

অবনীশবাবুকে এক জ্যোতিষী বলেছেন তিনি লটারি থেকে লাখপতি হবেন। অনেক ভেবেচিন্তে তিনি টিকিট কাটাই ঠিক করলেন। প্রথম পুরস্কার পাঁচ লাখ টাকা। জিততে হলে অমন পুরস্কারই জেতা উচিত। সেই যে কথায় আছে না, ‘মারি তো গণ্ডার, লুটি তো ভাণ্ডার!’ এক লাখ দু’লাখে মন ভরল না অবনীশবাবুর।

পাঁজিতে শুভদিন আর শুভ সময় দেখে ভাল এক দোকান থেকে তিনি টিকিট কাটলেন। টিকিটটা কপালে ছুঁইয়ে পাঞ্জাবির বুকপকেটে রেখে দিলেন। কাউকে কিছু বললেন না, গিন্নিকেও না। সবাইকে তিনি তাক্ লাগিয়ে দেবেন।

টিকিটের নম্বরটা ডায়েরিতে লিখে রাখলেন, এইচ· ও· ১৪২১৬৫। তাঁর টেবিলের ওপরেই ডায়েরিটা থাকে, কাগজে খবরটা বেরোলেই মিলিয়ে নিতে পারবেন, টিকিট দেখার দরকার নেই। ওটা বেশি নাড়াচাড়া না করাই ভাল, তাতে নাকি ফল ভাল হয় না।

বুধবারের কাগজে পুরস্কার বিজয়ীদের নাম ছাপা হল। টিকিটের নম্বরটা অবনীশবাবুর মুখস্থই হয়ে গিয়েছিল, এ-ক’দিন প্রায় জপ করেছিলেন বলা চলে। ছাপার অক্ষরে প্রথম পুরস্কারের নম্বরটা দেখে তাঁর ব্লাড প্রেশার এক লাফে চড়ে গেল, বুকের ভেতর শুরু হয়ে গেল দাপাদাপি।

তাঁর টিকিটের নম্বরটা প্রথম পুরস্কার পেয়েছে। পাঁচ লাখ! ডায়েরিটা খুলে তবু তিনি একবার মিলিয়ে নিলেন। না, ভুল হয়নি। কয়েক মুহূর্ত তিনি পাথরের মতো বসে রইলেন, তারপরই চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, “ইউরেকা, মিল্ গিয়া, মিল্ গিয়া।”

তাঁর চিৎকারে বাড়ির সবাই ছুটে এল। কী ব্যাপার! কয়েক দিন ধরে তাঁর হাবভাবে বাড়ির লোক চিন্তিতই হয়ে পড়েছিল। কারও সঙ্গে তেমন মন খুলে কথা বলেন না, মাঝে-মাঝে আপন মনে বিড়বিড় করেন, সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের লক্ষণ নয়।

“পাঁচ লাখ,” বিজয়ী সেনাপতির মতো অবনীশবাবু ডান হাতটা তুলে বললেন, “কেল্লা ফতে।”

“কী হয়েছে? অমন পাগলের মতো করছ কেন?” গিন্নি একটু ব্যাকুল কণ্ঠেই বললেন।

“লটারিতে পাঁচ লাখ টাকা পেয়েছি,” অবনীশবাবু গলা তুলে বললেন, “ফার্স্ট প্রাইজ, এই দ্যাখো...।” খবরের কাগজটা আর ডায়েরির নম্বরটা তিনি সবাইকে দেখালেন।

মুহূর্তে ঘরের মধ্যে সবার মুখের চেহারা গেল বদলে। গিন্নির মুখে যে হাসি ফুটে উঠল তার দামই লাখ টাকা।

“দাঁড়াও টিকিটটা নিয়ে আসি,” অবনীশবাবু আলনা থেকে

আপনার বাচ্চাদের দেদার মজার সময়ে সঙ্গ দিতে কিসানের দলে এল নতুন সাথী। বলুন তো এ কে?

মিকি মাউস, ডোনাল্ড ডাক, উইনি দি পুঃ, গুফী —এদের মধ্যে যে কোন একজন আপনার কাছে আসবে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে; প্রতিটি গ্লাসের সাথে; প্রতিটি কিসান স্কোয়াশ বা ক্রাশের বোতলের সাথে।

তাজা স্বাদে ভরপুর — কিসান স্কোয়াশ ও ক্রাশ। সবচেয়ে ভালভাবে ঝাড়াই-বাছাই করা মরশুমী ফলের থেকে তৈরী। এতে পাবেন আকণ্ঠ পরিতৃপ্তি; একদম বিনা পরিশ্রমে। চিনি দেবার হাঙ্গামা নেই; তাই সরবৎ তৈরী হবে এক পলকে।

হাতের কাছেই রাখুন কিসানের একটা বোতল। কিংবা তার চেয়েও ভাল হয় যদি তৃপ্তিতে ভরা কিসানের তাজা ফল-সরবতের যে কোনও বোতল বা সবকটা বোতলই কিনে ফেলেন, আর তার সঙ্গে বাচ্চাদের জন্য ঘরে নিয়ে যান ডিজনী–রূপকথার পুরো দলটাকে।

তাজা, তৃপ্তিদায়ক, ফলের আমেজে ভরা এ যেন প্রকৃতই প্রকৃতিজ কিসান!

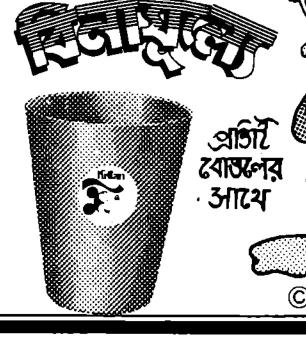

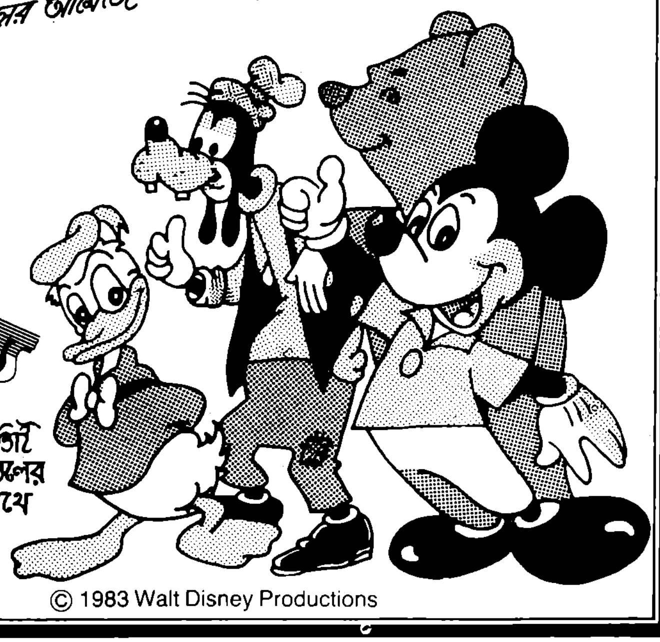

© 1983 Walt Disney Productions

স্কোয়াশ এবং ক্রাশ

অরেঞ্জ, পাইনাপল, লেমন, ম্যাঙ্গো, লেমন-বার্লি। অরেঞ্জ, পাইনাপল, রোজ ও খুশ্‌সরাপের সঙ্গেও গ্লাস পাওয়া যাবে।

এ উপহার কিন্তু সীমিত — স্টক যতদিন থাকে, আর শুধুমাত্র কয়েকটি বাছাই শহরের জন্য।

Kissan

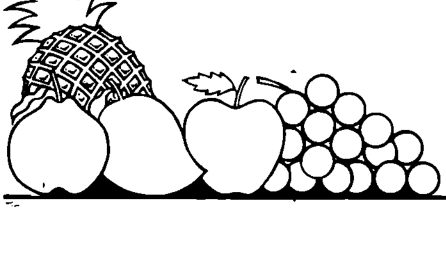

MAA(S) KPL 1B BEN 86

পাঞ্জাবিটা আনতে ছুটলেন। তারপরেই তাঁর চিৎকার শোনা গেল, "আমার পাঞ্জাবিটা ! আলনা থেকে কে সরাল ?"

"পাঞ্জাবিটা ময়লা হয়েছিল, কাল মোক্ষদা কেচে দিয়েছে," গিন্নি জবাব দিলেন, "ইস্ত্রি করতে পাঠাব বলে তুলে রেখেছি।"

"সর্বনাশ," অবনীশবাবু কঁকিয়ে উঠলেন, "ওটার পকেটেই তো টিকিটটা ছিল, কোথায় ওটা ?"

গিন্নিরও মুখ শুকিয়ে কাঠ। তিনি একছুটে পাঞ্জাবিটা নিয়ে এলেন। ওটার পকেটে কিন্তু কিছু পাওয়া গেল না।

"মোক্ষদা কোথায় ?" আর্তকণ্ঠে বলে উঠলেন অবনীশবাবু, "টিকিটটা কি ও ফেলে দিয়েছে ?"

মোক্ষদা হল ঠিকে কাজের মেয়ে, সে আবার সেদিন কাজে আসেনি। পড়িমরি করে তার বাড়ি ছুটলেন অবনীশবাবু। বস্তির মধ্যে অনেক জিজ্ঞেস করে তার ঘরটা খুঁজে পেলেন। ও বেচারা সেদিন কামাই দিয়েছিল, ভেবেছিল পরদিন গিয়ে বলবে শরীর খারাপ হয়েছিল, কিন্তু সশরীরে বাবুকে ঘরের সামনে দেখে সেও হতভম্ব।

অবনীশবাবু কিন্তু অন্য কোনও কথাই তুললেন না, সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলেন, "মোক্ষদা, তুমি কাল আমার পাঞ্জাবিটা কেচেছিলে ?"

"হ্যাঁ বাবু," ঢোক গিলে মোক্ষদা জবাব দিল।

"ওটার বুকপকেটে একটা টিকিট...মানে একটা ছোট কাগজ ছিল ?"

"সেটা তো আমি ফেলে দিইচি বাবু," মোক্ষদা এবার একটু সামলে নিয়ে বলল, "বাজে কাগজ মনে করেছিলাম।"

"হায় ভগবান !" অবনীশবাবু মাথা চাপড়ালেন, "কোথায় ফেলেছিলে মনে আছে ?"

"ওই তো, উঠোনে, জমাদারনি ঝাঁট দিয়ে ফেলে দেবে বলেই ওখানে ফেলেছিলাম। ওটা কি দরকারি কাগজ ছিল বাবু ?"

অবনীশবাবু আর কথা না বাড়িয়ে ছুটে বাড়ি ফিরে এলেন। এসে দেখলেন জমাদারনি উঠোন ঝাঁট দিচ্ছে।

"কাল ইধার একঠো কাগজ দেখা হ্যায় ?" অনেকটা ব্যাকুল কণ্ঠে তিনি প্রশ্ন করলেন।

"কেয়া কাগজ !" জমাদারনি ভুরু কুঁচকে জবাব দিল। ওকে এখন আরও কয়েকটা বাড়ি কাজ করতে যেতে হবে, সময় নষ্ট করলে চলে নাকি ওর।

"ছোটা কাগজ," অবনীশবাবু বললেন, "লটারিকা কাগজ।"

"লটারি-ফটারি হম নহি দেখা," জমাদারনি আবার ঝাঁট শুরু করল।

অবনীশবাবুর গিন্নিই জমাদারনিকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললেন। পাঁচ লাখ টাকার কথাও বললেন। এবার জমাদারনির দু'চোখ বড়-বড় হল। ঝাঁটা মাটিতে ফেলে গালে হাত দিয়ে অবনীশবাবুকে বলল, "অভি সমঝ গয়ি, লুটারি। টিকস ফেক দিয়া আপনে !" ওর গলায় ভর্ৎসনার সুর, "পাঁচ লাখ রুপিয়া কা টিকস সামালকে রাখনে চাহিয়ে, ঔর আপ ফেক্ দিয়া ! দিমাগ খরাব হো গয়া আপকা কেয়া !"

অবনীশবাবু দু'হাতে মাথা চেপে ধরলেন। শেষ পর্যন্ত জমাদারনি কবুল করল উঠোনের সব ময়লা টিনে জড় করে সে রাস্তায় ফেলে দিয়েছিল, রাস্তার জমাদার রোজকার মতো পরে গাড়িতে তুলে নিয়ে যাবে তাই।

ভাগ্যক্রমে রাস্তার জমাদারকে পাওয়া গেল, সে আবার পাশের বাড়িতেই ঝাড়ুদারের কাজ করে। তাকে জিজ্ঞেস করতেই সে বলল, গতকালের সব ময়লা আজ সকালেই সে তুলে ভ্যাটে ফেলে দিয়েছে। একটু বেলায় যে ময়লা রাস্তায় জমে তা পরদিন পরিষ্কার করা হয়। অবনীশবাবু যেন ক্ষীণ আশার আলো দেখলেন। কিন্তু তাঁর আশায় জল ঢেলে জমাদার বলল, ভ্যাটের ময়লা কর্পোরেশনের লরি তুলে নিয়ে গেছে।

তবু যদি লটারির ছোট্ট কাগজের টুকরোটা পড়ে থাকে ! অবনীশবাবু হাল ছাড়লেন না, জমাদারকে বললেন দশ টাকা বকশিস দেবেন কাগজটা সে যদি খুঁজে পায়। জমাদার আশা করেনি যে ওটা পাওয়া যাবে। তবু দশ টাকার লোভে রাজি হল। ভ্যাটটা কাছেই। অবনীশবাবু ওর সঙ্গে গেলেন। ভ্যাটে আবার নতুন ময়লা পড়েছে, জঞ্জালের পাহাড়। এ যেন খড়ের গাদায় ছুঁচ খোঁজার সামিল।

অবনীশবাবুর কপাল কিন্তু ভালই বলতে হবে। লটারির কাগজটা পাওয়া গেল, একটা কিসে যেন আটকে ছিল। জমাদার ওটা দেখাতেই তিনি তার হাত থেকে সেটা প্রায় ছিনিয়ে 'জয় মা কালী' বলে দু'লাফ মারলেন। জমাদারও ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল। তার হাতে দশ টাকার একটা নোট গুঁজে অবনীশবাবু ছুটতে ছুটতে বাড়ি এলেন। রাস্তার লোক কী ভাবল তাতে তাঁর বয়েই গেছে।

বাড়ি এসেই তিনি টেবিলের ওপর টিকিটটা টানটান করে মেলে ধরলেন। ময়লা লেগে ওটা নোংরা দেখাচ্ছিল, দুর্গন্ধ বেরোচ্ছিল। এমনিতে অবনীশবাবুর আবার শুচিবাই আছে, কিন্তু এখন এ-ব্যাপারে তিনি যেন উদাসীন। বাড়ির সবাই তাঁর চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়িয়েছে। খবরের কাগজটা খুলে টিকিটের নম্বরটা আরেকবার তিনি মিলিয়ে নিলেন, তারপরই তাঁর বুকের স্পন্দন যেন থেমে গেল। কাগজে ছাপা টিকিটের নম্বর এইচ· ও· ১৪২১৬৫ ; তাঁর ডায়েরিতেও ওই নম্বরটা লেখা রয়েছে, কিন্তু তাঁর টিকিটের নম্বর হচ্ছে এইচ· ও· ১৪২১৫৬। লেখার সময় ভুল করে পাঁচ-ছয়'টা ছয়-পাঁচ হয়ে গেছে এবং তার ফলেই এত কাণ্ড, এত দৌড়-ঝাঁপ !

নাকের কাছে স্মেলিং সল্ট ধরার পর অবনীশবাবুর জ্ঞান ফিরে এল।

ছবি : প্রবীর সেন

কৃত্রিম উপগ্রহের কী ও কেন

অনীশ দেব

মহাকাশযানের দু'দিকে পাখির ডানার মতো ছড়িয়ে আছে সৌর প্যানেল

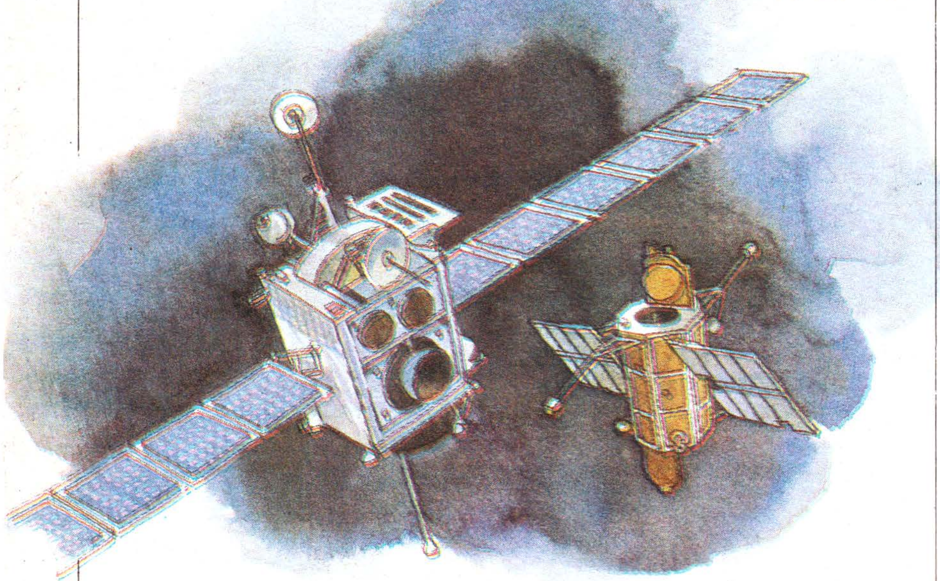

কিছুদিন আগেই সুদূর অস্ট্রেলিয়ায় বেনসন হেজেস কাপের ক্রিকেট প্রতিযোগিতা হয়ে গেল। ঘরে বসেই টেলিভিশনে সেই খেলা আমরা দেখেছি। কী জীবন্ত ছবি! যেন ঘরের পাশেই খেলা হচ্ছে। শুধু খেলা কেন, টেলিভিশনে নানান দূর দেশের সুন্দর সুন্দর বহু প্রোগ্রামই আমরা স্বচ্ছন্দে দেখতে পাই। কিন্তু এক দশক আগেও দূরের ছবিকে ঘরের ভিতর টেনে আনার এমন সহজ ব্যবস্থা ছিল না আমাদের দেশে। বিজ্ঞানের যে আবিষ্কার এই কঠিন কাজকে সম্ভব করেছে তার নাম কৃত্রিম উপগ্রহ বা আরটিফিসিয়াল স্যাটেলাইট।

কোনও গ্রহকে কেন্দ্র করে যে অবিরাম পাক খায়, তাকে বলে উপগ্রহ। যেমন পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদ। চাঁদ প্রাকৃতিক উপগ্রহ। কৃত্রিম উপগ্রহগুলোও এই চাঁদের মতোই পৃথিবীকে কেন্দ্র করে পাক খেয়ে চলেছে। বিজ্ঞানীরা গবেষণা ও উন্নত প্রযুক্তির কাজে নানান জটিল যন্ত্র ভরে কৃত্রিম উপগ্রহগুলোকে পাঠিয়ে দিয়েছে আকাশে, মহাকাশে।

কৃত্রিম উপগ্রহ কেমন করে ঘোরে মহাকাশে? খুব সহজ একটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা বোঝানো যেতে পারে। ধরা যাক, একটা রবারের সুতোর এক প্রান্তে একটি ছোট ঢিল বাঁধা আছে। এবারে অন্য প্রান্ত ধরে সুতোটিকে ঢিল সমেত ঘোরানো হল। দেখা যাবে, ঢিলটা গোল হয়ে ঘুরছে। ঘুরতে ঘুরতে সুতো ছিঁড়ে গেলেই ঢিলটা ছিটকে যাবে দূরে। অর্থাৎ, একটি অদৃশ্য বল (ফোর্স) ঢিলটাকে বাইরের দিকে টানছে। আবার রবারের সুতো ঢিলটাকে টানছে ভেতর দিকে। এই দুটি টান সমান হলেই ঢিলটা বৃত্তাকার পথে ঘুরতে থাকবে।

অনেকটা রবারের সুতোর মতোই পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ-বল সব জিনিসকে নিজের কেন্দ্রের দিকে টানে। উদাহরণের 'ঢিল' যদি কৃত্রিম উপগ্রহ হয়, তা হলে বোঝা যাচ্ছে, মাধ্যাকর্ষণের টান আর বাইরের দিকে ছিটকে যাবার টান সমান হলেই উপগ্রহটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরতে থাকবে। ঘোরার গতিবেগ কমতে থাকলেই পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টান উপগ্রহটিকে ক্রমশ টেনে আনবে নিজের কাছে। এমনি করেই এক সময় সেটা হয়তো পৌঁছে যাবে পৃথিবীর বুকে।

কৃত্রিম উপগ্রহ সাধারণত ছ'রকমের হয়। আবহাওয়া-উপগ্রহ, যোগাযোগ-উপগ্রহ, বিমান ও জলযানের পথনির্দেশ সংক্রান্ত উপগ্রহ, সামরিক উপগ্রহ, মহাকাশ-গবেষণা সংক্রান্ত উপগ্রহ এবং জীব-উপগ্রহ।

আবহাওয়া-উপগ্রহের কাজ হল বহু আগে থেকেই আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া। তা ছাড়া মেঘ ও ঝড়ের ছবি তুলে সে সরাসরি পাঠিয়ে দেয় পৃথিবীতে। যোগাযোগ-উপগ্রহ টেলিভিশন, টেলিফোন কিংবা রেডিওর বেতার-সংকেতকে দিক পরিবর্তন করে পাঠিয়ে দিতে পারে পৃথিবীর যে-কোনও প্রান্তে। নেভিগেশান স্যাটেলাইট রেডিও-তরঙ্গ ছড়িয়ে দেয় বিভিন্ন দিকে। জাহাজ কিংবা উড়োজাহাজের চালকরা সেই তরঙ্গের মাধ্যমে নিজেদের অবস্থান ও গতিপথ নির্ণয় করতে পারে। সামরিক উপগ্রহের কাজ হল পৃথিবীর উপরে নজর রাখা। কোথাও কোনও তেজস্ক্রিয় বিস্ফোরণ হলে অথবা কোনও ক্ষেপণাস্ত্র ছাড়া হলে সামরিক উপগ্রহ তা ধরে ফেলতে পারে। এক হিসেবে বলা যায় যে, এদের ভূমিকা হল গোয়েন্দার। মহাকাশ থেকে এই সামরিক উপগ্রহগুলি সেই গোয়েন্দাগিরির কাজ চালাচ্ছে। মহাকাশ-গবেষণা-উপগ্রহের কাজ সূর্য, গ্রহ, তারা, মহাকাশ এই সব নিয়ে। এদের সম্পর্কে নানান তথ্য সংগ্রহ করে সে

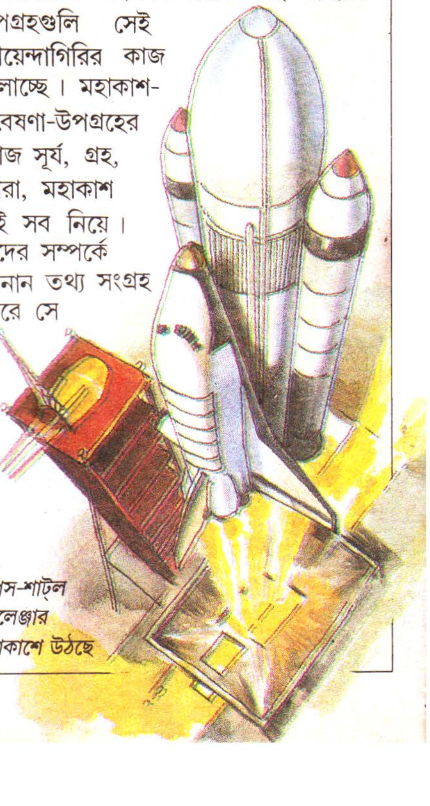

স্পেস-শাটল চ্যালেঞ্জার মহাকাশে উঠছে

পাঠিয়ে দেয় পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের কাছে। সব শেষের উপগ্রহটির নাম বায়োস্যাটেলাইট বা জীব-উপগ্রহ। এই উপগ্রহে করে বিভিন্ন জীবিত প্রাণীকে মহাকাশে নিয়ে যাওয়া হয়। এবং সেখানে তাদের ওপরে সূর্যের বিকিরণ, ভারশূন্যতা ইত্যাদির প্রভাব পর্যবেক্ষণ করা হয়।

কৃত্রিম উপগ্রহ নিজে থেকে উড়ে যেতে পারে না আকাশে। তাকে ওড়ার শক্তি জোগায় রকেট। হাউই জাতীয় বাজি থেকেই রকেটের সূত্রপাত। ১২৩২ সালে রকেটের লিখিত উল্লেখ পাওয়া যায় চিন দেশে। তারপরই ভারতবর্ষ ও আরব দেশে রকেটের প্রচলন হয়। পশ্চিম ইউরোপে রকেটের প্রথম ব্যবহার হয় ১২৪১ সালে। একসময় রকেটের প্রধান ব্যবহার ছিল যুদ্ধে, নিয়ন্ত্রিত

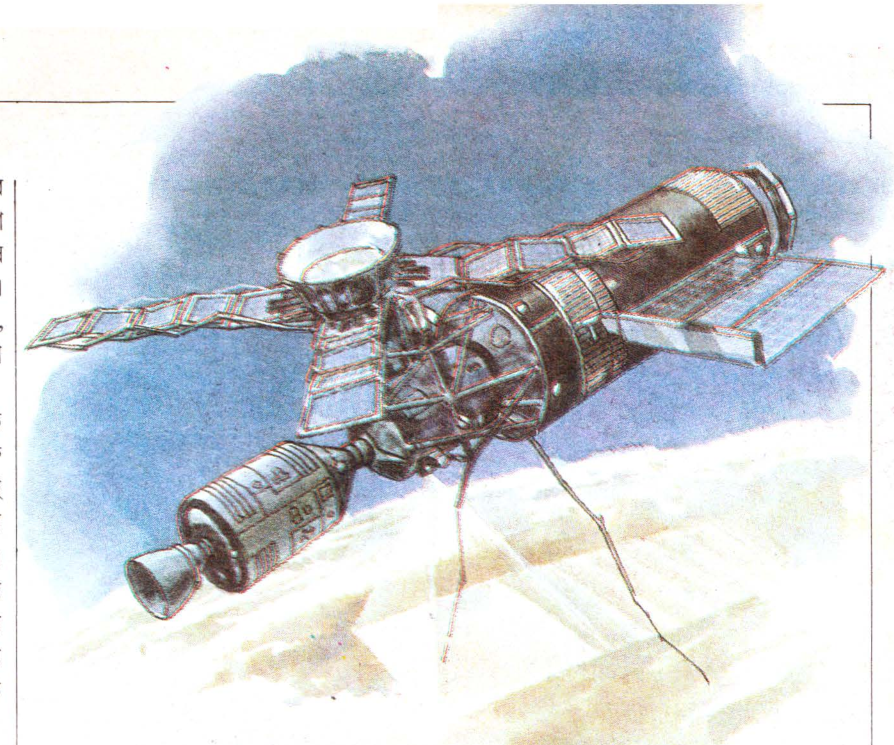

অ্যাপোলো মহাকাশযান

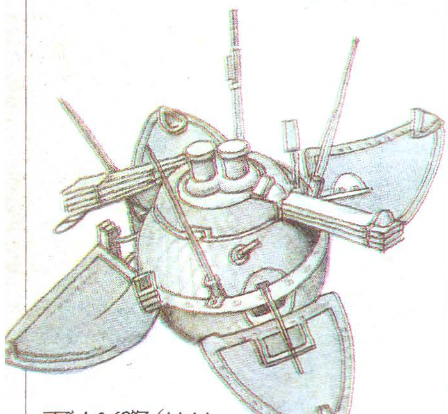

লুনা-১৩ প্রোব (১৯৬৬ সালে এই সোভিয়েত মহাকাশযান চাঁদে নামে)

ক্ষেপণাস্ত্রকে ওড়ার শক্তি জোগাতে। পরে বিজ্ঞান-গবেষণার কাজে রকেটের প্রয়োগ শুরু হয়। ভি-টু, ভাইকিং, এরোবি, বাম্পার, এরকম নানা নামের নানা ধরনের রকেট ব্যবহার করা হয় সেই কাজে। রকেটে করে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি পাঠিয়ে দেওয়া হয় অনেক উঁচুতে। ১৯৫৫ সালে এরোবি-হাই নামে একটি রকেট আকাশে পাঠিয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি ছাড়াও রকেটের সঙ্গে পাঠানো হয়েছিল কয়েকটি প্রাণী। ওপরের আবহাওয়া সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য রেকর্ড করে, প্রাণীদের ওপরে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণ চালিয়ে একটি প্যারাশুটের মাধ্যমে যন্ত্রপাতি ও প্রাণীরা নিরাপদে মাটিতে নেমে এসেছিল।

আধুনিক রকেটের একাধিক স্তর থাকে। মূল কৃত্রিম উপগ্রহটিকে বলা হয় 'পেলোড'—অর্থাৎ, রকেট চালানোর জন্য যে অংশটির প্রয়োজন হয় না। বহুস্তর রকেটে একাধিক রকেট থাকে। প্রথম রকেটটি ছোট। তার পেলোড শুধুমাত্র কৃত্রিম উপগ্রহটি। এবারে প্রথম রকেট, তার জ্বালানি ট্যাঙ্ক ও কৃত্রিম উপগ্রহ, এই তিনটি জিনিস মিলিয়ে বসানো হল দ্বিতীয় একটি রকেটে—তার পেলোড হিসেবে। বলা বাহুল্য, দ্বিতীয় রকেটটি প্রথমটির চেয়ে মাপে ও ক্ষমতায় বড়। এখন দুটি রকেট তাদের জ্বালানি ট্যাঙ্ক ও কৃত্রিম উপগ্রহকে করা হল আরও বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন তৃতীয় একটি রকেটের পেলোড। সব মিলিয়ে যে নিক্ষেপ-যানটি তৈরি হল. তাকে ত্রি-স্তর রকেট বলা যেতে পারে। এইভাবে প্রয়োজন বুঝে রকেটের স্তর বাড়ানো হয়।

মহাকাশে নভশ্চর এডোয়ার্ড হোয়াইট

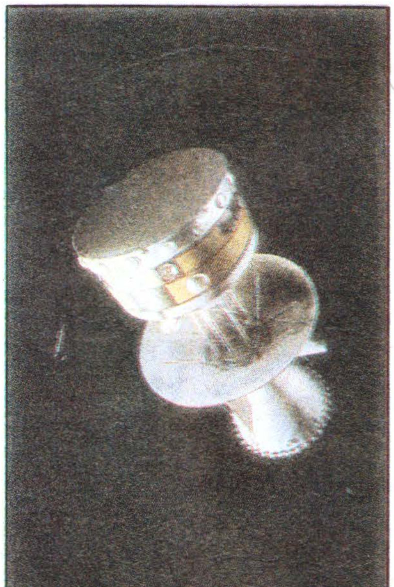

নিউক্লিয়ার পালস ইঞ্জিন চালিত আন্তঃনক্ষত্র মার্কিন প্রোব ডিডালাস

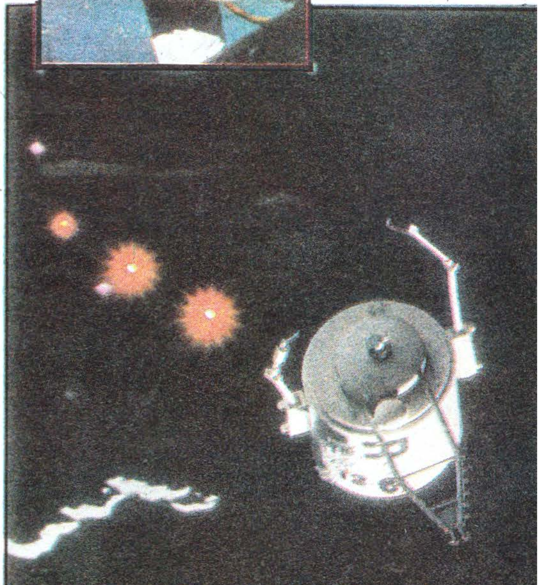

স্পেস-টাগ বা অরবিটাল ট্রান্সফার ভেহিকল (পেলোডকে কাছের কক্ষপথ থেকে দূরের কক্ষপথে নিয়ে যায়)

কৃত্রিম উপগ্রহকে নিয়ে নিক্ষেপ-যান যখন আকাশে ওড়ে, তখন সবচেয়ে বড় রকেটটি ওড়ার শক্তি জোগায়। তার জ্বালানি শেষ হলে কাজ শুরু করে পরবর্তী রকেট। তখন আগের রকেটটির শূন্য জ্বালানি ট্যাঙ্ক ও ইঞ্জিন যন্ত্রপাতি ইত্যাদি খসে পড়ে নিক্ষেপ-যান থেকে। কারণ, অদরকারি জিনিস সঙ্গে রেখে নিক্ষেপ-যানকে ভারী করার কোনও মানে হয় না। এইভাবে প্রতিটি স্তরের রকেট তাদের শক্তি শেষ করে নিক্ষেপ-যান থেকে খসে পড়ে। শুধু শেষ রকেটটি উপগ্রহকে তখন ঠেলে নিয়ে যায়, স্থাপন করে তার নির্দিষ্ট কক্ষপথে। কক্ষপথে স্থাপন করেই কিন্তু রকেটের কাজ শেষ হয় না। কক্ষপথে ঘোরার জন্য যে গতিবেগ প্রয়োজন সেই গতিবেগে কৃত্রিম উপগ্রহকে পৌঁছে দেয় সে। তারপর নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে।

রকেটকে শক্তি জোগায় কঠিন বা তরল জ্বালানি। কঠিন জ্বালানির মধ্যে রয়েছে নাইট্রোগ্লিসারিন ও নাইট্রোসেলুলোজ। আর তরল জ্বালানি বলতে হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড, হাইড্রাজিন ইত্যাদি।

লুনা-৩ প্রোব (সোভিয়েত রাশিয়া ১৯৫৯ সালে এটিকে মহাকাশে পাঠায়)

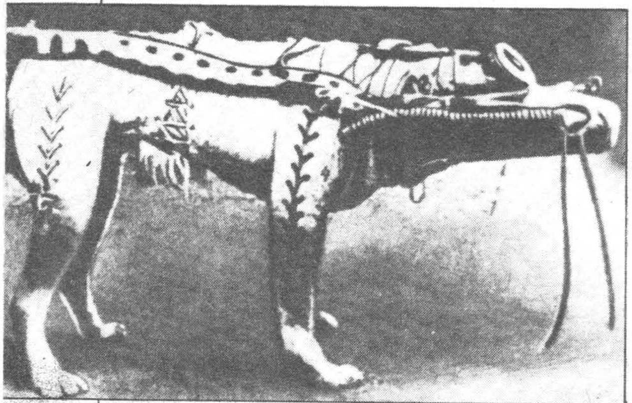

মহাকাশের পোশাকে লাইকা (স্পুটনিক-২ এর অভিযাত্রী)

মহাকাশে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠানোর কৃতিত্ব সোভিয়েত রাশিয়ার। ১৯৫৭ সালের ৪ অক্টোবর দু'ফুট ব্যাস ও ১৮৪ পাউণ্ড ওজনের গোলক স্পুটনিক-১ পৃথিবী ছেড়ে উড়ে যায় মহাকাশে। একুশ দিন কক্ষপথে থেকে মহাকাশের নানা তথ্য সংগ্রহ করে সে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিল।

এর একমাস পরেই সোভিয়েতে রাশিয়া স্পুটনিক-২কে মহাকাশে পাঠায়। স্পুটনিক-২-এর যাত্রী ছিল স্ত্রী-কুকুর লাইকা। কক্ষপথে ১০০ ঘণ্টা কাটানোর পর লাইকা মারা যায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠায় ১৯৫৮ সালের ৩১ জানুয়ারি। নাম এক্সপ্লোরার-১। এক ঘণ্টা পঞ্চান্ন মিনিটে পৃথিবীকে একবার করে পাক খেত এই উপগ্রহটি।

স্পুটনিক-১ ছাড়ার পরবর্তী দশ বছরে সোভিয়েত রাশিয়া প্রায় ২০০টি উপগ্রহ স্থাপন করে কক্ষপথে, আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাঠায় তার দ্বিগুণ। পরে মহাকাশ গবেষণায় এগিয়ে আসে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, কানাডা, ইতালি, ভারত ও অন্যান্য কয়েকটি দেশ।

লেঃ কর্নেল জন গ্লেন জুনিয়র (প্রথম মার্কিন মহাকাশচারী, যিনি পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করেন)

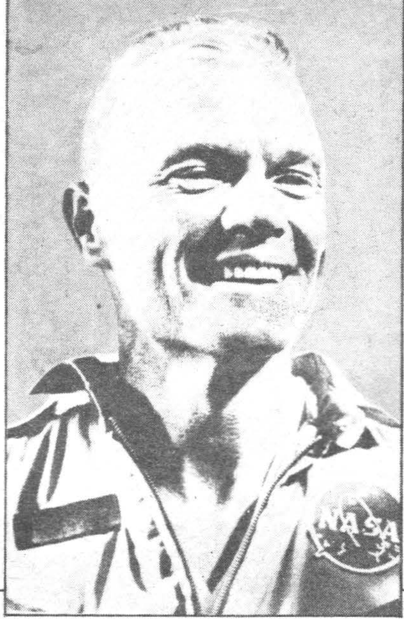

১৯৭৫ সালের ১৯ এপ্রিল মহাকাশে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করে ভারত। নাম আর্যভট্ট। ওজন প্রায় সাড়ে সাতশো পাউণ্ড। খরচ পড়েছিল আনুমানিক পাঁচ কোটি টাকা। এরপর একে-একে উৎক্ষেপণ করা হয় ভাস্কর-১, ভাস্কর-২, রোহিণী, অ্যাপল্, ইনস্যাট-১, এস· এল· ভি-৩ ইত্যাদি উপগ্রহ।

ভারতের প্রথম যোগাযোগ-উপগ্রহ ছিল অ্যাপল্। বেশির ভাগ যোগাযোগ-উপগ্রহ স্থাপন করা হয় ভূসমলয় কক্ষে। তার ফলে উপগ্রহটি পৃথিবীর সঙ্গে সমান তালে ঘুরে চলে। অর্থাৎ পৃথিবীরই মতো ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেণ্ডে একবার পাক খায় পৃথিবীকে। সেই কারণে পৃথিবী থেকে উপগ্রহটিকে স্থির মনে হয়। ভূসমলয় কক্ষপথের দূরত্ব প্রায় ২২৪৪০ মাইল। কলকাতার ওপরে ভূসমলয় কক্ষে যদি কোনও কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করা হয়, তা হলে দিন রাত সব সময়েই সে কলকাতার ওপরে থাকবে। একই জায়গায় স্থির থেকে চালিয়ে যাবে যোগাযোগ প্রসারণ ব্যবস্থা।

যতই দিন যাচ্ছে, কৃত্রিম উপগ্রহ ততই জড়িয়ে যাচ্ছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে। টেলিভিশনে দূরদেশের ছবি ফুটে উঠলেই কৃত্রিম উপগ্রহের কথা আমাদের মনে পড়ে যায়। *ছবি : বিমল দাস*

ধনদৌলত

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

জীবনের ভয় ঘুচে যেতে মানুষ দেখল, পৃথিবী হচ্ছে অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার। গেরস্তের গোলায় লক্ষ্মী, গোয়ালে লক্ষ্মী। মাটির তলাতেও মিলে গেল লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ। পাঁচ হাজারেরও বেশি বছর আগে মাটি খুঁড়ে পাওয়া গিয়েছিল প্রথম খনিজ। তাতে মানুষের জীবনে আরও সুখসুবিধে হল। মানুষ দেখল, তামার পাত দিয়ে অনেক তাড়াতাড়ি আরও ভাল যন্ত্রপাতি তৈরি করা যায়।

এরপর তামার সঙ্গে কিছুটা টিন মিশিয়ে পাওয়া গেল নতুন এক ধাতু। ব্রোঞ্জ। তাতে হাতিয়ার আরও বেশি মজবুত হল। এইভাবে শুরু হল ব্রোঞ্জ-যুগ। ব্রোঞ্জে ভর করে আফ্রিকার মিশরে আর এশিয়ার সুমেরিয়া আর ব্যাবিলনে এক বিরাট সভ্যতার পত্তন হয়।

প্রত্নপ্রস্তরযুগে সবাইকেই যেতে হত পশু শিকারে। নব্যপ্রস্তরযুগে মানুষ চাষআবাদে আর পশুপালনের কাজে মন দেয়।

ব্রোঞ্জযুগে সভ্যতা বহরে বাড়ল। তার বাহারও খুলল। লোকের জুটল রকমারি কাজ। কেউ হল খনিমজুর, কেউ রাজমিস্ত্রি, কেউ কারিগর, কেউ সওদাগর, কেউ সেপাই, কেউ কেরানি। বাকি কিছু লোক হল ব্রাহ্মণ-পুরুত, কেউ বা রাজাউজির।

ব্রোঞ্জ তৈরির কাজ সোজা নয়। তার জন্যে ওস্তাদ-কারিগর দরকার। কিছু লোকের সারাদিনের কাজ হল মাটি খুঁড়ে টিন আর তামা জোগাড় করা। একদল তা গালিয়ে তাই দিয়ে বানাবে ব্রোঞ্জের যন্ত্রপাতি। এক-একটি দল রসদ জোগাড় করবে, ঘর তুলবে। টিন আর তামা কোথাও প্রচুর, আবার কোথাও বা দুষ্প্রাপ্য ছিল ; কাজেই একদলের ওপর ছিল সেসব আনা-নেওয়ার ভার।

যে লোকটা চাষবাস পশুপালন করে, সে চায় খেতের কিছু ফসল আর মাংস দিয়ে ব্রোঞ্জের একটা লাঙল পেতে। যে কাপড় বোনে, সে হয়তো কাপড়ের বদলে পেতে চায় কিছু খোরাক কিংবা মাথা গোঁজার ঘর কিংবা ব্রোঞ্জের একটা হাতিয়ার।

এইভাবে একের সঙ্গে অন্যের, এক জায়গার লোকের সঙ্গে অন্য জায়গার লোকের লেনদেনের ব্যাপারটা এত জটিল হল আর এতদূর গড়াল যে, সে ব্যাপারে পাকা লোক দাঁড়িয়ে গিয়ে তারা হল ব্যাপারী আর সওদাগর। তাতে কিছু লোক- খুব শাঁসালো হয়ে উঠল। তারা তখন তাদের ধনদৌলত বজায় রাখার জন্যে লোকের ওপর

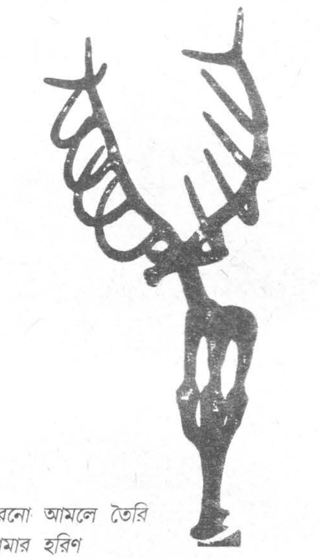

পুরনো আমলে তৈরি তামার হরিণ

জোর খাটাতে শুরু করে দিল। এইভাবে কেউ হল বড়লোক মনিব, আর বাকিরা হল তার কেনা গোলাম। বড়লোকের সেবা করাই হল তাদের কাজ।

প্রত্নপ্রস্তরযুগের চেয়ে ব্রোঞ্জযুগে মানুষ অনেক বেশি এগিয়েছিল। তারা থাকত ভূমধ্যসাগরের আশপাশের সব সমৃদ্ধ নগরে। পায়ে না হেঁটেও জলপথে নৌকোয় আর স্থলপথে চাকাওয়ালা গাড়িতে তারা এখান থেকে সেখানে যেতে পারত।

পাথরে তৈরি সেকেলে বেঢপ হাতিয়ারের বদলে তারা ব্রোঞ্জের খাসা-খাসা সব জিনিস ব্যবহার করতে লাগল। লাঙল দিয়ে চাষ আর খালনালা কেটে জমিতে সেচের ব্যবস্থা হওয়ায় খেতখামারেরও চেহারা ফিরে গেল।

ব্রোঞ্জের মানুষ (নাইজিরিয়া)

কুঁড়েঘর ভেঙে হল ইটের পাকা দালানকোঠা। নদীতে হল পারাপারের সাঁকো। তৈরি হল বিরাট বিরাট উপাসনাগৃহ। আর সর্বসাধারণের জন্যে থাকার বাড়ি।

চাকা এসে গিয়ে মানুষের যে কী সুবিধে হল বলার নয়। যাতায়াতের সুরাহা ছাড়াও, মাল বওয়ার ক্ষেত্রে চাকা জিনিসটা খুব কাজের হল। যন্ত্রপাতির জন্যে খনিজ ধাতু, নগর তৈরির জন্যে বড়-বড় পাথরের চাঁই—এসব বয়ে আনার কষ্ট কমানো গেল।

চাকা দিয়ে তৈরি হল কুমোরের ঘুরনচাকি। তাতে মাটির পাত্র চটপট তৈরি হতে পারল। গম ভাঙার চাকির ব্যাপারটাও এল চাকা থেকে। এই চাকার মধ্যেই ছিল ভবিষ্যতের বহু যন্ত্রের বীজ।

হাটেবাজারে লেনদেনে জিনিসের সংখ্যা পরিমাণ আর দাম ঠিক হওয়ার দরকার। সেই তাগিদে মানুষ গণনা করতে শিখল। হিসেব রাখার জন্যে দরকার হল লেখালিখির। দিনপঞ্জিকা তৈরি হওয়ার ফলে লোকে চিঠিপত্রে তারিখ দিতে শিখল।

খ্রিস্টপূর্ব ১৪০০ সালের কাছাকাছি কোনও সময়ে আবার এক জবর ব্যাপার ঘটল। একজন বেশ সহজে আর সুলভে লোহা তৈরির উপায় বার করে ফেলল।

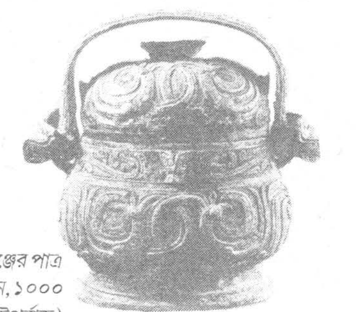

ব্রোঞ্জের পাত্র (চিন, ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)

ফলে, মানুষের জীবনযাত্রায় আবার এক বিপ্লব ঘটে গেল।

তামা আর টিন খুব একটা সহজে পাওয়া যেত না। সে তুলনায় আকরিক লোহা পাওয়া যেত প্রচুর পরিমাণে আর বিস্তর জায়গায়। ফলে, লোহার তৈরি অঢেল যন্ত্রপাতি বেড়ে গেল।

লোকে তখন তাই দিয়ে বন হাসিল করে, খালনালা কেটে জলা জায়গা সাফ করে নতুন নতুন নগর পত্তন করল।

লোহার হাত ধরে দুনিয়ায় আধুনিক কালের সূত্রপাত হল।

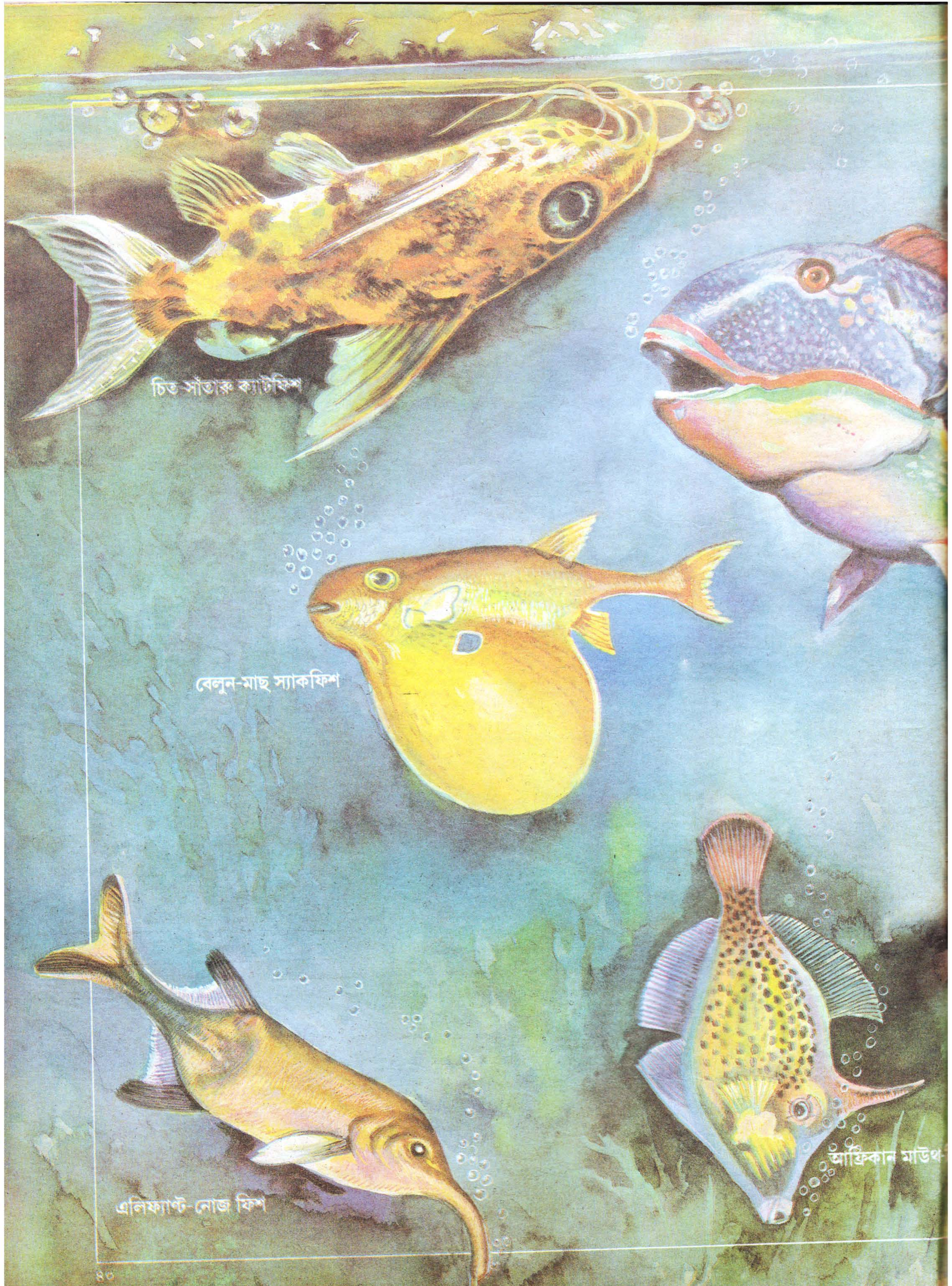

চিত সাঁতারু ক্যাটফিশ
বেলুন-মাছ স্যাকফিশ
এলিফ্যান্ট-নোজ ফিশ
আফ্রিকান মাউথ-

বিচিত্র সব মাছেরা

বিশ্বজিৎ পাণ্ডা

আমরা যে-সব মাছ দেখি, তার বাইরেও রয়েছে নানা ধরনের চিত্র-বিচিত্র মাছ। এদের স্বভাব, আকৃতি, চালচলন, জীবনধারণের পদ্ধতি ইত্যাদির কথা ভাবলে সত্যিই অবাক হতে হয়।

প্রথমেই আসা যাক, ভারত মহাসাগরের 'স্যাক্‌ফিশ্'-এর কথায়। গাঢ় বাদামি রঙের এই সুদর্শন খুদে মাছটি লম্বায় কুড়ি ইঞ্চি। কেবলমাত্র শত্রুকে ভয় পাইয়ে দেওয়ার জন্যে এরা আশ্চর্যভাবে নিজেদের পেটকে বেলুনের মতো ফুলিয়ে রাখে। শুধু স্যাক্‌ফিশ্ নয়, জাপানের বিষাক্ত 'পাফারফিশ্'ও একই কারণে এইভাবে পেট ফোলায়। এই রঙিন মাছটির গায়ে আঁকা রয়েছে বিচিত্র সব নকশা। দেখতে সত্যি দারুণ!

অনেক মাছের আকৃতি আবার অনেকটা বন্য জন্তু-জানোয়ারদের মতো। এইরকম একটি মজার মাছ হল আফ্রিকার 'এলিফ্যান্ট নোজ ফিশ্'। এই কিম্ভূতকিমাকার মাছটির হাতির মতো লম্বা শুঁড় রয়েছে বলেই এদের এই নাম। সবচেয়ে মজার কথা হল, এরা যেখানে থাকে, তার চারদিকে বিদ্যুৎ-ক্ষেত্র তৈরি করে রাখে, যাতে শত্রুপক্ষ আক্রমণ করার আগেই টের পেতে পারে। এজন্যে এদের 'রাডার ফিশ্'ও বলা হয়। 'পরকুপাইনফিশ্' বলে এক ধরনের সামুদ্রিক মাছ দেখা যায়, যাদের সারা গায়ে 'শজারু'র মতো কাঁটা থাকে।

বিপদকালে শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করতে শরীরের এই কাঁটাগুলোকে যখন খাড়া করে, তখন এদের কোনও গোলাকার কাঁটাময় শামুক-জাতীয় প্রাণী বলেই মনে হয়।

শত্রুকে ঘায়েল করার ব্যাপারে পলিনেশিয়ার 'ফরসেপফিশ্'ও যথেষ্ট পটু। এদের মুখ অনেকটা শেয়ালের মতো চোখা। এই রংচঙে খুদে মাছটি যখন সাঁতার কাটে, তখন প্রজাপতি বলে ভ্রম হয়। স্বভাবে এরা কিছুটা যুদ্ধবাজ। শত্রুপক্ষ বুঝে ওঠার আগেই, পিঠের ধারালো কাঁটা আর ছুঁচলো মুখ দিয়ে তাদের নাস্তানাবুদ করে ছাড়ে।

অবশ্য শত্রুকে নাস্তানাবুদ করার ব্যাপারে ইন্দো-অস্ট্রেলিয়ার 'আর্চার ফিশ্'-এর কোনও তুলনা নেই। এরা বন্দুকধারী মাছ হিসেবেই পরিচিত। যদিও এদের কাছে আদপেই কোনও অস্ত্রশস্ত্র

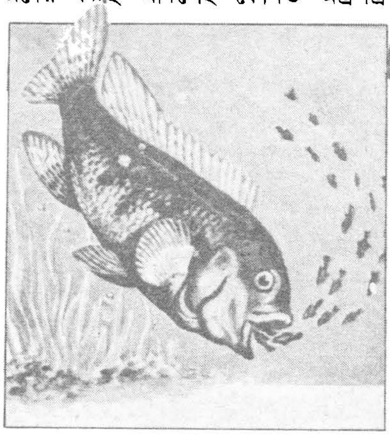

থাকে না। লক্ষ্যবস্তুর দিকে এই 'আর্চারফিশ্' মুখ দিয়ে প্রচণ্ড জোরে বুলেটের মতো জল ছোঁড়ে। যতক্ষণ পর্যন্ত শিকার আয়ত্তে না আসে, ততক্ষণ এরা ক্রমাগত এইভাবে জল ছুঁড়ে যায়। তিন-চার ফুট দূর থেকে খুব সহজেই লক্ষ্যবস্তুকে ঘায়েল করতে পারে এরা।

'ফ্যানটেল ফাইল ফিশ্'-এর ব্যাপার-স্যাপার আরও মজার। এই সামুদ্রিক মাছের মাথার ওপরে রয়েছে গণ্ডারের মতো একটি খড়্গ। আত্মরক্ষার জন্যে এবং শত্রুকে ঘায়েল করার পক্ষে এই খড়্গ যথেষ্ট কার্যকর হলেও পারতপক্ষে এরা শত্রুকে ঘাঁটাতে চায় না। বরং তাদের এড়িয়ে যাবার জন্যে এরা পরিবেশ অনুযায়ী গায়ের রঙ বদল করে।

গায়ের রঙ বদল করার কথা যখন উঠল, তখন বলা যাক ট্রপিক্যাল অঞ্চলের 'প্যারট ফিশ্'-এর কথা। বহু বর্ণময় এই

(উপরে) আমেরিকার ক্যাটফিশ, (বাঁয়ে) মাউথ ব্রিডার, (নীচে) শজারু-মাছ, (ডাইনে) বেলুন-মাছ

মাছের বিশেষত্ব হল, এরা প্রত্যেক দিন রাতে শুতে যাবার আগে শরীরের চারদিকে, আত্মরক্ষার জন্যে ঠুলির মতো একটি আবরণ তৈরি করে।

আমেরিকার 'ক্ল্যারিড ক্যাট্‌ফিশ্' জলের মাছ হলেও দলবদ্ধভাবে ডাঙায় ঘোরাফেরা করতে বেশি ভালবাসে। এরই সগোত্র 'আপসাইড ডাউন ক্যাটফিশ্' আবার শরীরকে পুরোপুরি উলটো করে সাঁতার কাটে। আবার 'কলম্বিয়ান ক্যাটফিশ্'কে বলা হয় 'পর্বতারোহী মাছ'। কোনও আধুনিক সাজসরঞ্জাম ছাড়াই জলপ্রপাতের মধ্যে ঘণ্টায় খাড়া চল্লিশ ফুট উঁচুতে উঠতে পারে।

উত্তর আমেরিকার 'ক্যাণ্ডল্ ফিশ্' হল সবচেয়ে দরকারি মাছ। এরা অতিরিক্ত চর্বি-যুক্ত বলে স্থানীয় অধিবাসীরা শুকিয়ে রাখে এবং দরকারে লম্বা ছড়িতে বেঁধে আগুন ধরিয়ে এদের মশালের মতো

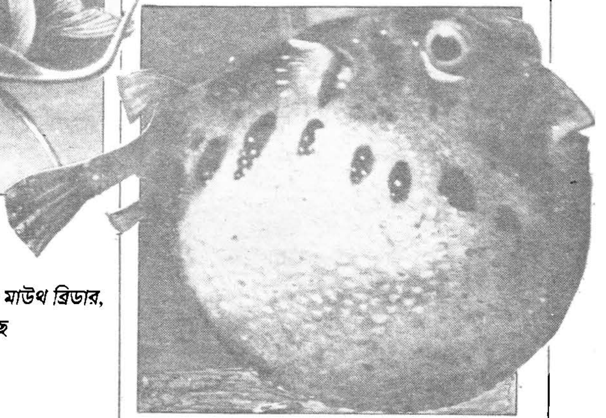

ব্যবহার করে। সেজন্যে ক্যাণ্ডল্ ফিশ্কে বলা হয় 'টর্চ মাছ'।

হাওয়াই দ্বীপের রঙিন 'টর্পেডো ফিশ্' দেখতে একদম রেকাবির মতো। এদের শরীরের ওপর থাকে, ছোট-ছোট কাঁটা। সবচেয়ে মজার হল, এদের শিকার ধরবার পদ্ধতি। এদের মুখের ওপরে থাকে, একধরনের মাংসল নল। শিকার ধরবার সময় এই নলটিকে ছুঁড়ে দেয় এরা। প্রলুব্ধ হয়ে শিকার যখন কাছাকাছি আসে তখন টর্পেডো তাকে ধরে ফেলে।

শুধু পাখি নয়, মাছও গান গাইতে পারে। ট্রপিক্যাল অঞ্চলের 'সি রবিন'-এর নাম শুনেছ? এই সামুদ্রিক কিম্ভূতকিমাকার মাছটিকে দেখে বুঝবার উপায় নেই যে, এরা গান করতে পারে। জোড়-বিজোড় পাখনাসহ এই মাছকে দেখতে অনেকটা উড়ন্ত হেলিকপ্টারের মতো।

বেল্ পলিনেট নন্ স্লিপ ব্রা (মূল্য ২৩.২৫)

ত্বকে বাতাস পৌঁছুতে পারে বলে বছর ভর আরাম মেলে বেশি

'বিমল' পলিনেট দিয়ে তৈরী বেল্ ব্রেসিয়ার আপনার ত্বক গ্রীষ্মে যেমন ঠাণ্ডা রাখে তেমনি শীতে রাখে উষ্ণ আর স্বচ্ছন্দ। কাপের নীচে এবং কাঁধে ব্যবহৃত সেরা মানের 'লাইক্রা' টেপ আপনার শরীর দৃঢ় স্বাচ্ছন্দ্যে ঘিরে রাখে। স্লিপ করে নেমে যাওয়া বা ওপরে উঠে যাওয়ার ভয় থাকে না। বহু বার ধোওয়ার পরেও শক্ত আর ফ্যাশনদুরুস্ত দেখায়।

'আইলেট স্টিচিং' আর ফিনিশিং, সহজেই আটকায় এমন শক্তপোক্ত হুকটি পর্যন্ত প্রত্যেকটি জিনিসের গুণমানের ওপর নজর—এ সবের জন্যই আজ বেল্ আপনার মত সজাগ আধুনিকা মহিলাদের প্রথম পছন্দ হয়ে উঠেছে।

এবার ব্রা কিনলে বেল্ পলিনেট নন্-স্লিপ কিনুন। দেখুন দেখতে এবং পরতে কি চমৎকার লাগে।

বেল্-এর আরও যে সব নন্ স্লিপ ব্রা আছে:

কটন টেপ	
কটন	১১.০০
২ × ২ রুবিয়া ৪ রঙে (গোলাপী, কালো, লাল, সাদা এবং গায়ের রঙে)	১৩.৫০
ইলাস্টিক টেপ	
'বিমল' পলিয়েস্টার রুবিয়া	১১.২৫
কটন	১৬.২৫
২ × ২ রুবিয়া ৪ রঙে (গোলাপী, কালো, সাদা এবং গায়ের রঙে)	২০.৫০
'বিমল' পলিয়েস্টার প্যাডসহ	২৩.২৫

belle

পলিনেট নন্ স্লিপ ব্রা

বেল্ ওয়্যারস্ প্রাইভেট লিমিটেড
৫৪ বি সুবারবান স্কুল রোড
কলিকাতা ৭০০ ০২৫। ফোনঃ ৪৮-৩৭০৮

C 86 - 9

নিম্নলিখিত দোকানগুলিতে পাওয়া যায়:

কলিকাতা: পূর্ণিমা, ডবলিউ/বি ২৬, ইণ্টালি মার্কেট; যশোদা স্টোর্স, ১০৩ বি, বিধান সরণি; মডার্ণ ড্রেসেস, হাতিবাগান; কলেজ স্টোর্স, ৫৫ কলেজ স্ট্রীট; এইচ এণ্ড আর বণিক স্টোর্স, বালিগঞ্জ ফ্যান্সি মার্কেট; ফ্রেণ্ডস স্টোর্স, ৭০/২০ রবীন্দ্র সরণি; শ্রীশ্রী সত্যনারায়ণ ভাণ্ডার, বড়বাজার; বি এণ্ড বি এন দে, 'জি ব্লক', নিউ মার্কেট; অংগশোভা, গড়িয়া; স্বর্ণময়ী, যাদবপুর; মীনাশ্রী, বেহালা; রঞ্জিত স্টোর্স বেহালা। বীণা, ৩৪ জি টি রোড (দক্ষিণ) হাওড়া; পূর্বাশা, শ্রীরামপুর; তারক এম্পোরিয়াম, চুঁচড়া; পোদ্দার ব্লাউস হাউস, নৈহাটি; শ্রীগুরু বস্ত্রালয়, বারাসাত; করুণাময়ী, খাগড়া, বহরমপুর; ইভন্ ম্যাথ স্টোর্স, কৃষ্ণনগর; সূর্য্যকমল, কাঁথি; কৃষ্ণা ম্যাচিং সেণ্টার, আসানসোল; জয়শ্রী, পুরুলিয়া; গৌরী ড্রেসেস, মালদহ; রামনারায়ণ হরিকিষণ, মেদিনীপুর; নিউ টিপটপ, গোলবাজার, খড়গপুর; রীণা ড্রেসেস, বিবেকানন্দ মিনি মার্কেট, শিলিগুড়ি; সাহা ড্রেসেস, কদমতলা। আপনার এলাকার দোকানের নাম যদি এই তালিকায় না থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের লিখে জানাবেন।

আপনার বাচ্চাকে দিন সেরেল্যাকের অনন্য লাভ

শক্ত আহারের আদর্শ শুরু

আপনার বাচ্চা ৪-মাসে পড়লেই দুধের সঙ্গে ওর দরকার শক্ত আহারের। তখন থেকেই ওকে দিতে শুরু করুন সেরেল্যাকের অনন্য লাভ।

সম্পূর্ণ পুষ্টির লাভ : সেরেল্যাকের প্রতি আহারে আছে আপনার বাচ্চার জন প্রয়োজনীয় সবরকম পুষ্টি উপাদান — প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেটস্, স্নেহপদার্থ, ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থ। আপনার বাচ্চার বিশেষ প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই এইসব উপাদান, সঠিক মাত্রায় সুষম ভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে।

চমৎকার স্বাদের লাভ : সেরেল্যাক শুধু পুষ্টিকরই নয়, চমৎকার স্বাদেও ভরপুর। সেরেল্যাকের স্বাদ তাই বাচ্চাদের দারুন মুখরোচক।

সময় বাঁচার লাভ : সেরেল্যাক এক তৈরী আহার। দুধ ও চিনি তাতে দেওয়াই থাকে, শুধু ফোটানো ঈষৎ উষ্ণ জল মিশিয়ে নিলেই হলো–চট্পট্ খাবার তৈরী।

আপনার বাচ্চার সুষম পুষ্টির জন্য সেরেল্যাক আহার স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে তৈরী করতে টিনের গায়ে লেখা নির্দেশাবলী দয়া ক'রে সঠিক্ ভাবে মেনে চলুন।

বিনামূল্যে সেরেল্যাক পুস্তিকার জন্য
এই ঠিকানায় লিখুন : সেরেল্যাক
পোষ্টবক্স নং-৩
নিউদিল্লী-১১০০০৮

Nestlé

সেরেল্যাকের যত্ন : পুষ্টিতে সম্পূর্ণ–স্বাদে অনন্য

SAA/FSL/C/3799 (R) BEN

গিলটি করা মমির মাথা

সম্প্রতি মেম্‌ফিস স্টেট ইউনিভার্সিটি যখন ঘোষণা করল যে, 'রামিসিস টু' প্রদর্শনীটি ১৯৮৭-তে আমেরিকায় অনুষ্ঠিত হবে, তখন ক্লেয়ার অস্টিনের মনে পড়ে গেল একটা অদ্ভুত জিনিসের কথা। জিনিসটা একটা গিলটি করা মমির মাথা। ক্লেয়ারের স্বামীর এক পূর্বপুরুষ, আর্চিবল্ড মার্ভিন ছিলেন শখের অভিযাত্রী। বহু বছর আগে মিশরে অভিযান চালিয়ে সোনার গিলটি করা মাথাটি তিনি নিয়ে এসেছিলেন। সেটা এখন অবহেলায় পড়ে আছে ক্লেয়ারের বাড়ির চিলেকোঠায়।

মাথাটি প্রদর্শনীতে দেখানোর যোগ্য কি না সেটা জানতে ক্লেয়ার বস্তুটি নিয়ে দেখা করেন মেম্‌ফিসের 'ইজিপশিয়ান ইন্‌স্টিটিউট অভ আর্ট অ্যাণ্ড আর্কিওলজি'-র বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে। মাথাটি পরীক্ষা করে বিশেষজ্ঞরা খুশিতে একেবারে আত্মহারা। প্রদর্শনীতে দেবার জন্য এরকম একটি দুর্লভ জিনিস পাওয়া যাবে, এ তাঁরা ভাবতেই পারেননি। মাথাটি নিয়ে নানাভাবে তাঁরা পরীক্ষা চালান। ক্যাট স্ক্যান, দাঁতের এক্স রে, ভর বর্ণালিমিতি, কিছুই বাদ দেননি। পরীক্ষা থেকে জানা যায়, মাথাটি তিরিশ-চল্লিশ বছর বয়সের এক মহিলার। সম্ভবত দাঁত থেকে সংক্রামিত কোনও রোগে তিনি মারা যান। মাথাটি সোনায় মোড়া দেখে বিশেষজ্ঞদের সিদ্ধান্ত, মহিলাটি নিশ্চয়ই রাজবংশের কেউ ছিলেন। তাঁদের মতে; মাথাটি ম্যাসিডোনীয় রাজত্বের সময়কার, খ্রীস্টপূর্ব ৩৩১ থেকে ৩০৪ সালের মধ্যে।

মাথাটি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মতামত শুনে ক্লেয়ারও যথেষ্ট অবাক হয়ে গেছেন।

নাসার নতুন অনুসন্ধান

কক্ষপথে বিগড়ে যাওয়া কৃত্রিম উপগ্রহকে সারিয়ে তুলতে মার্কিন সংস্থা 'নাসা' একটি নতুন ধরনের মহাকাশযানের কথা ভাবছেন। যানটির নাম 'অরবিটিং ম্যানুভারিং ভেহিক্‌ল্' বা সংক্ষেপে 'ও· এম· ভি·'। খুব দূরের কক্ষপথে, যেখানে স্পেস শাট্‌ল্ পৌঁছতে পারে না, সেখানে ও· এম· ভি· খুব সহজেই পৌঁছে যাবে। স্পেস শাট্‌ল্-এর 'পেলোড বে' থেকে ছাড়া পেয়ে ও· এম· ভি· কৃত্রিম উপগ্রহকে বয়ে নিয়ে যেতে পারবে আরও উঁচু কক্ষপথে। সেখানে উপগ্রহটিকে ছেড়ে দিয়ে দেখবে সেটা ঠিকমতো কাজ করছে কি না। তারপর তাকে দরকার মতো সাহায্য করে ও· এম· ভি· আবার ফিরে আসবে স্পেস শাট্‌ল্-এ। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, ও· এম· ভি·-র সবরকম নিয়ন্ত্রণের কাজই করা হবে পৃথিবীতে বসে। ও· এম· ভি·-র ক্যামেরায় তোলা ছবি টিভি-তে দেখে তাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবে অপারেটর। অনেকটা ভিডিও গেম খেলার মতো।

গবেষণার কাজ যদি ঠিকঠাক চলে, তা হলে আগামী ১৯৯০ সালেই ৩৫ কোটি ডলার দামের প্রথম ও· এম· ভি· মহাকাশে পাড়ি দেবে।

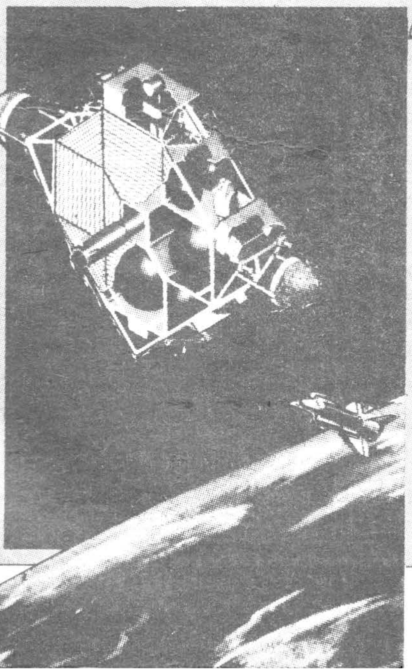

বিজ্ঞানের কাজে মাকড়সার জাল

কুখ্যাত 'ব্ল্যাক উইডো' মাকড়সা নিয়ে নানা গল্প শোনা যায়। কিন্তু সম্প্রতি এই কুখ্যাত মাকড়সা মানুষের উপকারী বন্ধু হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিভিন্ন নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের যন্ত্রপাতিতে আইপিসে একজোড়া সূক্ষ্ম তার যোগচিহ্নের মতো করে লাগানো থাকে। এদের বলা হয় 'ক্রস হেয়ার' বা 'ক্রস তার'। সম্প্রতি কিছু-কিছু যন্ত্র প্রস্তুতকারক তাদের সূক্ষ্ম যন্ত্রে ক্রস-তার হিসেবে ব্ল্যাক উইডো মাকড়সার জালের সুতো ব্যবহার করছেন। আমাদের মাথার চুলের চেয়ে আশিগুণ সরু হলে হবে কী, এই সুতো একই মাপের

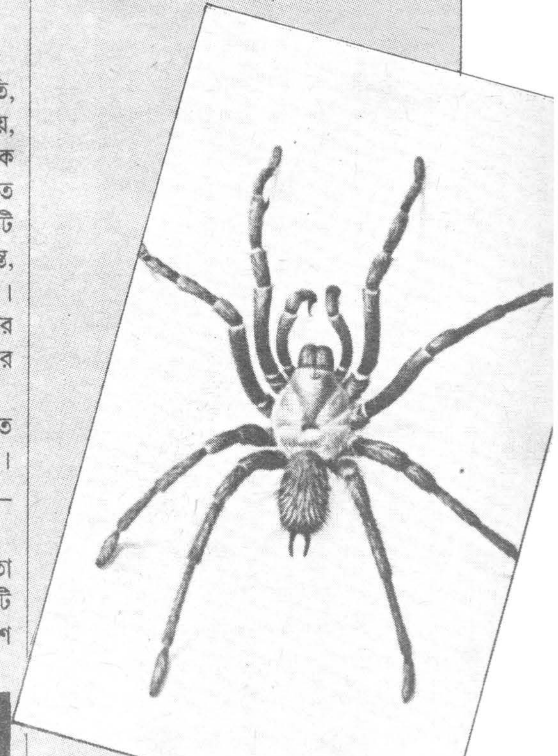

ইস্পাতের তারের চেয়েও শক্তিশালী। পুরো খোলা কলের জলের তলায় ধরলেও এই সুতো ছিঁড়ে যায় না। তা ছাড়া যন্ত্রে লাগানোর পর টেকেও অনেকদিন। সুতরাং কৃত্রিমভাবে মাকড়সার চাষ করে তাদের পেটে সুড়সুড়ি দিয়ে বিজ্ঞানীরা নিয়মিত সুতো বের করছেন। দিনে এক-একটা মাকড়সা প্রায় দু'ফুট সুতো বুনতে পারে। আর এভাবে সুতো বুনে যায় আমরণ। অতএব প্রযুক্তিবিদদের কাছে ব্ল্যাক উইডো এখন অনেক দামি।

অনুসন্ধানী

স্টার ওয়ারস

লেখক : আর্চি গুডউইন
শিল্পী : আল উইলিয়ামসন

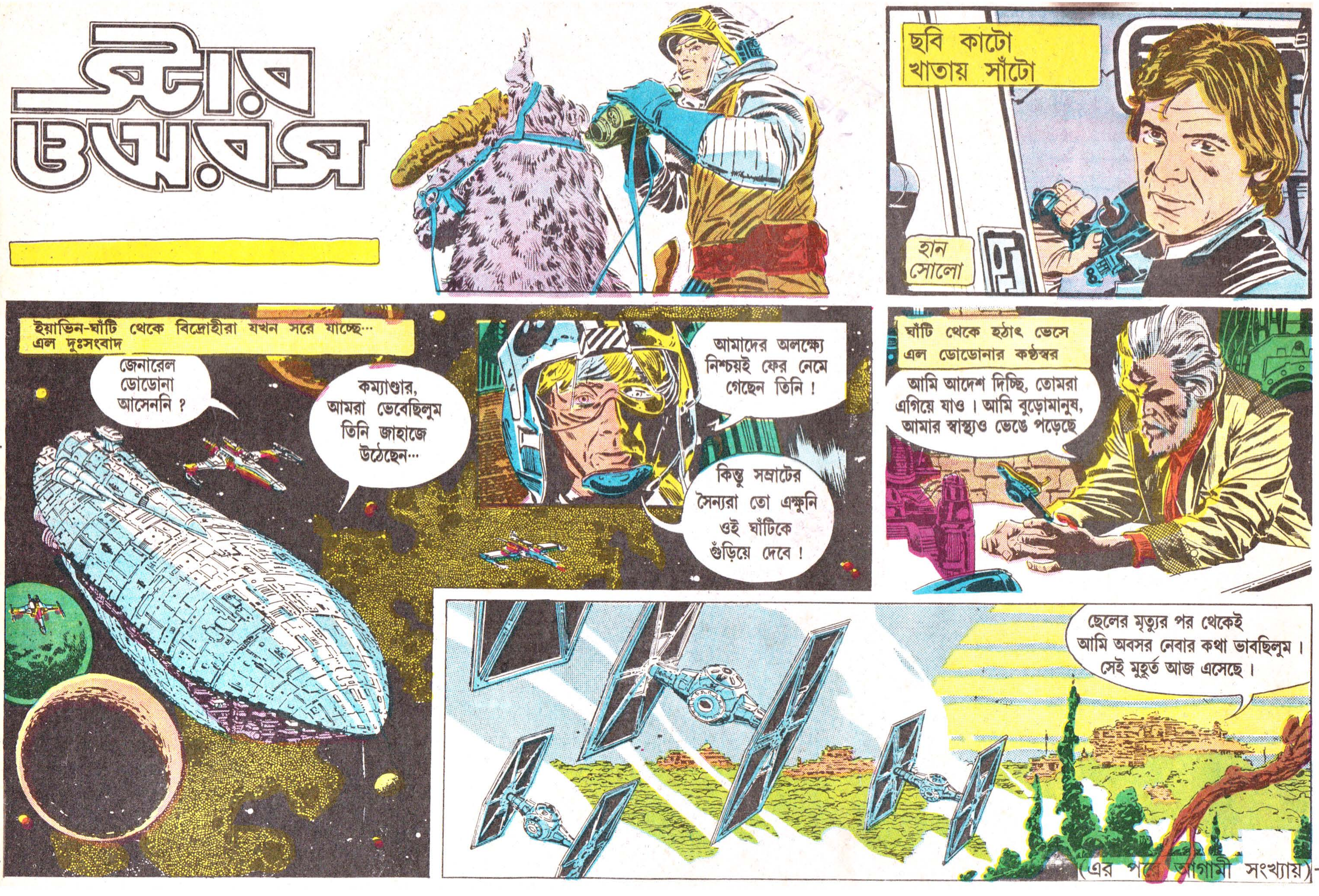
স্টার ওয়ার্স
ছবি কাটো খাতায় সাঁটো
হান সোলো
ইয়াভিন-ঘাঁটি থেকে বিদ্রোহীরা যখন সরে যাচ্ছে··· এল দুঃসংবাদ
জেনারেল ডোডোনা আসেননি ?
কম্যাণ্ডার, আমরা ভেবেছিলুম তিনি জাহাজে উঠেছেন···
আমাদের অলক্ষ্যে নিশ্চয়ই ফের নেমে গেছেন তিনি !
কিন্তু সম্রাটের সৈন্যরা তো এক্ষুনি ওই ঘাঁটিকে গুঁড়িয়ে দেবে !
ঘাঁটি থেকে হঠাৎ ভেসে এল ডোডোনার কণ্ঠস্বর
আমি আদেশ দিচ্ছি, তোমরা এগিয়ে যাও । আমি বুড়োমানুষ, আমার স্বাস্থ্যও ভেঙে পড়েছে
ছেলের মৃত্যুর পর থেকেই আমি অবসর নেবার কথা ভাবছিলুম । সেই মুহূর্ত আজ এসেছে ।
(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

কুইজ

আমাকে প্রায়ই জিজ্ঞেস করা হয়, এই ব্যাপারটার শুরু কী ভাবে হল ? কুইজের সঙ্গে, এবং যে-রকম দারুণ ভাবে এই বুদ্ধির খেলাটি ছড়িয়ে পড়ছে, তার সঙ্গে আমি কী করে জড়িয়ে পড়লাম ?
১৯৬৬ সালে আমি প্রথম ইংল্যাণ্ডে যাই, এবং সেখানে টেলিভিশনে কুইজ দেখি । দেখেই আমার খুব ভাল লেগে গেল ।

তারপর সেই বছরই দেশে ফিরে এসে আমি শুনলাম, পার্ক সার্কাসের 'ক্রাইস্ট দ্য কিং' চার্চের প্যারিশনরবা যে ক্লাবটি স্থাপন করেছিলেন, সেই ক্লাবের প্রেসিডেন্ট মিঃ এডি হোয়াইটের দেহাবসান ঘটেছে । শুনে আমি গভীর বেদনা অনুভব করলাম ।

আমাদের কমিটি চাইল, তাঁর স্মৃতি-সংরক্ষণের জন্যে একটি ট্রফির ব্যবস্থা করা হোক । কিন্তু সে-ট্রফি কিসের জন্যে দেওয়া হবে ? আমরা চাইলাম, বিতর্ক প্রতিযোগিতা নয়, ফুটবল নয়, অন্য কিছু । আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, "কুইজের চেষ্টা করি না কেন ?" "সেটা আবার কী জিনিস ?" আমি বুঝিয়ে বললাম, আইডিয়াটা কমিটির অন্য সকলের পছন্দ হল ।

অতএব নভেম্বরের এক বৃষ্টিতে ভিজে সন্ধেবেলা (সে-সময়ে সেরকম আবহাওয়া কম দেখা যায়) পার্ক সার্কাসের এক ছোট হলে সর্বসাধারণের জন্যে প্রথম কুইজের অনুষ্ঠান হল । তাতে পাঁচজন করে চারটি দল যোগ দিয়েছিল । দর্শক ছিলেন পঞ্চাশ জনের কম ।

তার আগে পর্যন্ত কুইজটা ইস্কুল-কলেজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল । আমরা একটু ঝুঁকি নিয়ে তাকে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের চার-দেওয়ালের বাইরে নিয়ে এলাম । তার পরের কাহিনী সকলের জানা । বিশ বছরে কুইজ একটা সর্বভারতীয় আকার ধারণ করেছে, আর যেখানে তার সূত্রপাত হয়েছিল, সেই কলকাতা এখনও তাতে অগ্রণী ।
এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে তোমাদের সঙ্গে কুইজের আনন্দ ও উত্তেজনায় অংশ নিতে পারব, তাতে আমি আনন্দিত ।
তোমাদের প্রশ্নাবলী (উত্তরসহ কিংবা উত্তর ছাড়া) অবশ্যই পাঠাবে । তার মধ্যে যতগুলো পারি আমরা ছাপাতে চেষ্টা করব । যে-কোনও বিষয়ে কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য আমরা সাদরে গ্রহণ করব । তোমাদের চিঠির প্রতীক্ষায় রইলাম ।

শ্রীনিল্ ও'ব্রায়েনের অনেক নাম । কেউ বলেন 'মিঃ কুইজ', কেউ বলেন, 'কুইজিংয়ের গুরুদেব' । যেটা সবাই বলেন, তা এই যে, কুইজের ক্ষেত্রে তাঁর তুল্য লোক নেই বললেই হয় । জাদুকরের ইংরেজি তো উইজার্ড । তা শ্রীও'ব্রায়েন তো কুইজের জাদুকর, তাই তাঁকে 'কুইজার্ড' বললেও কিছুমাত্র বাড়িয়ে বলা হয় না ।

এই দশটি প্রশ্ন আমি সম্প্রতি কুইজে জিজ্ঞেস করেছিলাম । তোমরা দ্যাখো, এগুলোর উত্তর দিতে পারো কি না !

(১) ইউনেস্কোর সদর দফতর কোথায় ?
(২) দ্রোণাচার্যের বাবার নাম কী ?
(৩) কলকাতায় কার ডাক-নাম পল্টু ?
(৪) ভারত-সোভিয়েত মহাকাশ-যাত্রার প্রতীক কী ছিল ?
(৫) আমেরিকার কোন্ পপ-গায়কের একটি নিজস্ব চিড়িয়াখানা আছে, যাতে অন্যান্য জীবজন্তুর সঙ্গে আছে একটি লামা এবং একটি বোয়া-কনসট্রিক্টার সাপ ?
(৬) কোথায় গিয়ে মাদার টেরিজা গরিবদের মধ্যে কাজ করবার আহ্বান শুনতে পান ?
(৭) কোন্ ধাতুর দ্রবণাঙ্ক সব চাইতে উচ্চ ?
(৮) ভারতে ফরাসি সাম্রাজ্য স্থাপনের আশা নির্মূল হয় কোন্ যুদ্ধে ?
(৯) 'বম্বে ব্লাড' কাকে বলে ?
(১০) কোন্ টেনিস খেলোয়াড়ের ডাক নাম দা সরজন ?

উত্তর কী হবে, ভাবো । সামনের বারে এই জায়গাতেই ছাপা হবে সব উত্তর । তখন মিলিয়ে নিও, কেমন ?
নীচে কয়েকজন বিখ্যাত মানুষের মুখের ফোটোগ্রাফ নয়, তার আউটলাইন ছাপা হল । এর থেকে যদি তোমরা মুখের মালিকদের নাম আন্দাজ করতে পারো, তা হলে এবারকার কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবে ।

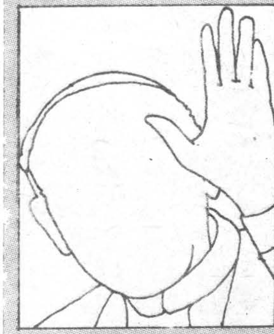

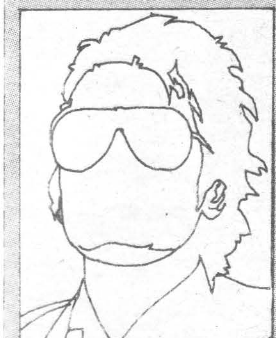

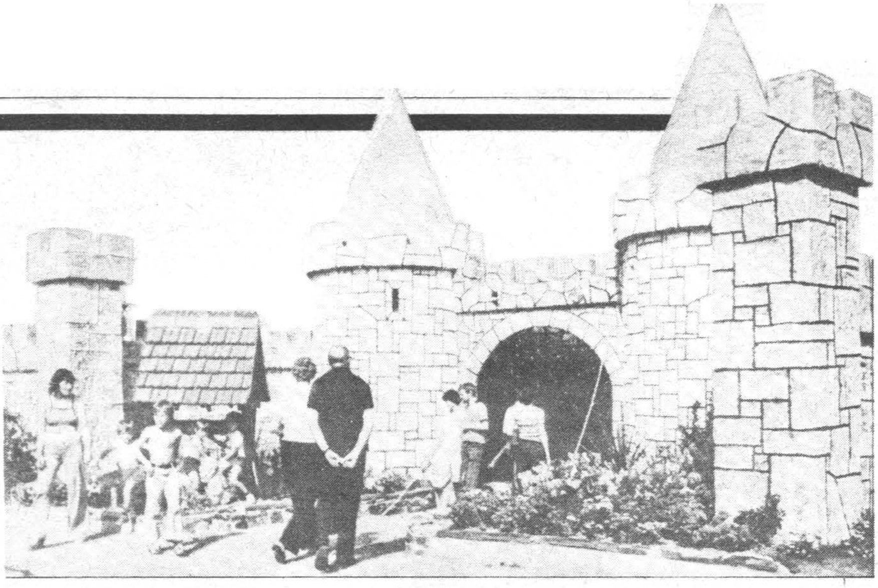

স্বপ্নরাজ্য অ্যাগনিস পার্ক

সলিল লাহিড়ী

কখনও যদি বিলেত যাওয়ার সুযোগ পাও, তা হলে ইংল্যাণ্ডের দক্ষিণতম প্রান্তের ছোট্ট জায়গা কাউণ্টি কর্নওয়াল দেখতে ভুলো না। সমুদ্র, উঁচু-নিচু পাহাড় আর সবুজ উপত্যকায় মোড়া জায়গাটা একেবারে ছবির মতো। বলতে পারো, স্বপ্নের দেশ।

এই কর্নওয়ালের প্রধানতম শহর ট্ররোতে থাকতাম আমরা। আত্মীয় অহীন্দ্রবাবুর মোটরে চড়ে একদিন সেণ্ট অ্যাগনিস লিজার পার্ক দেখতে বেরোলাম। এখান থেকে পার্কের দূরত্ব তিরিশ কিলোমিটার। অহীন্দ্রবাবু বললেন, "পার্কে পৌঁছতে সময় লাগবে আধঘণ্টা। চুপচাপ বসে থাকবেন, নাকি একটা গপ্পো শুনবেন? এই পার্ক নিয়ে একটা ভারী মজার গল্প আছে।"

"গপ্পো!" প্রায় লাফিয়ে উঠল অহীন্দ্রবাবুর মেয়ে মারিয়া, "বলো বাবা। গল্প শুনতে আমার দারুণ লাগে।"

আমিও হেসে মাথা নাড়ি, "বলুন স্যার। গল্পটল্প আমারও মন্দ লাগে না।"

অহীন্দ্রবাবু বলতে শুরু করেন: "ইংল্যাণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম পাড়ে, সমুদ্রের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে দুই পাহাড়ের চুড়ো, অ্যাগনিস বেকন আর কার্নীব্রিয়া। দুই পাহাড়-চুড়োর মাঝখানের উপত্যকায় গড়ে উঠেছে ঘন জনবসতি। সেণ্ট অ্যাগনিস পাহাড়ের গুহায় বাস করত দৈত্য বলস্টার। দেখতে যেমন ভয়ঙ্কর, চেহারাও তেমনই বিশাল। দৈত্য বলস্টার প্রতিদিন সকালে দুই

পাহাড়ের চূড়োয় দুই পা রেখে যখন গর্জন করত, তখন মেঘেরাও ভয়ে থমকে যেত। দৈত্যকে খুশি রাখবার জন্য গ্রামের লোকেরা প্রতিদিন ছাগল শুয়োর গোরু ভেড়া নিয়ে এসে তাকে উপহার দিতে শুরু করল। সব জন্তু-জানোয়ার যখন শেষ

উপরে ফেয়ারিল্যাণ্ডের মডেল পুতুল; বাঁয়ে টিন-ফ্যাক্টরির মডেল ;নীচে কোয়েকারদের সভা-ঘর (মডেল)

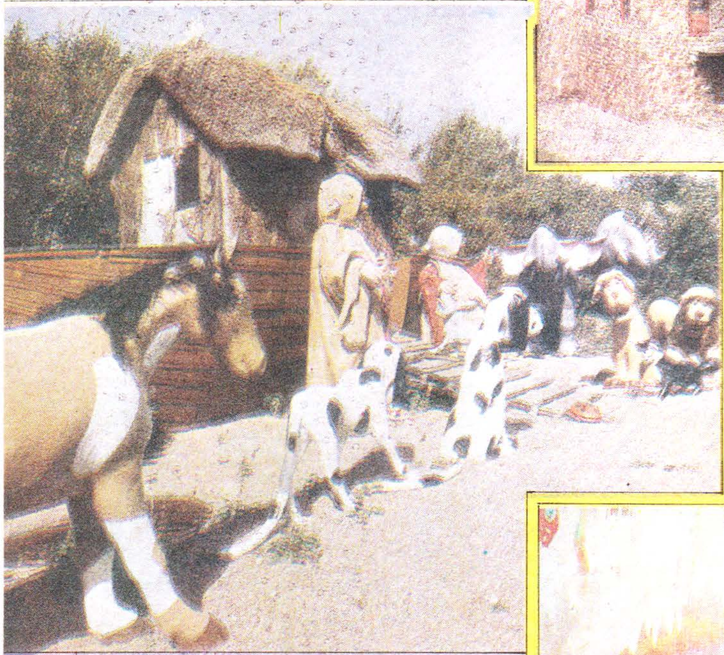

ফেয়ারিল্যাণ্ডে নোয়ার নৌকো

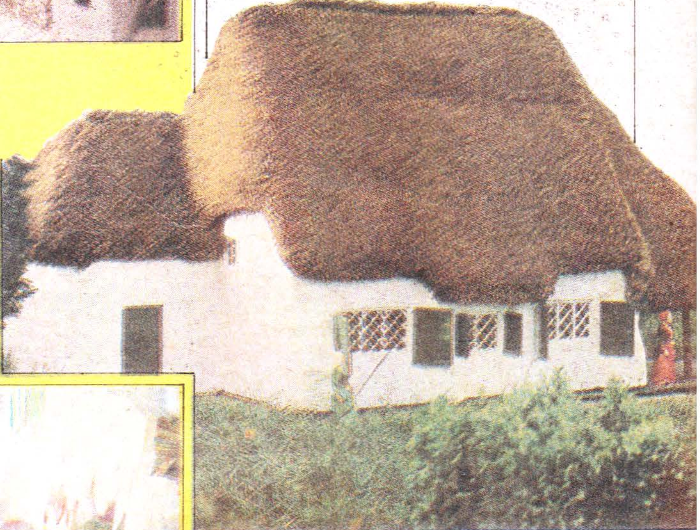

বাঁয়ে ফেয়ারিল্যাণ্ডের আইস-প্যালেস

দৈত্য হুঙ্কার ছাড়ল, এবার তার মানুষ চাই। দৈত্যের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে অ্যাগনিস বেকন আর কার্নব্রিয়া উপত্যকার লোকেরা পালাতে শুরু করল।

"কিন্তু পালালে কী হবে, দৈত্যের অত্যাচার একটুও কমে না। তারা আকুল হয়ে ভগবানকে ডাকে,'প্রভু,আমাদের বাঁচাও।'

"ভক্তের প্রার্থনায় স্বর্গের দেবতা একদিন এক সুন্দরী নারীর বেশ ধরে হাজির অ্যাগনিস

পাহাড়ের একটি গুহায়। দৈত্য বলস্টার সেই নারীর রূপ দেখে মোহিত হয়ে গেল। বলল, 'কে তুমি? কী চাও?'

"'আমি এই অ্যাগনিস পাহাড়ের মেয়ে অ্যাগনিসাস।'

"অ্যাগনিসাসকে দেখে বলস্টার বলে, 'তুমি আমায় বিয়ে করবে?'

"'উঁহু। তোমার মতো অত্যাচারী দৈত্যকে কে বিয়ে করবে? তবে হ্যাঁ, যদি কখনও ভাল

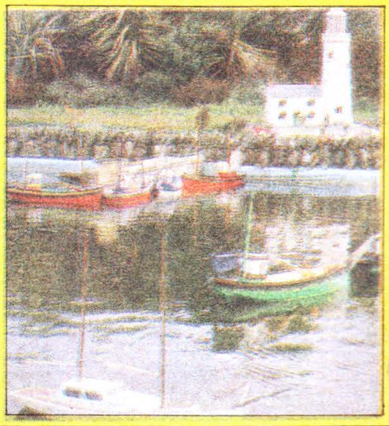

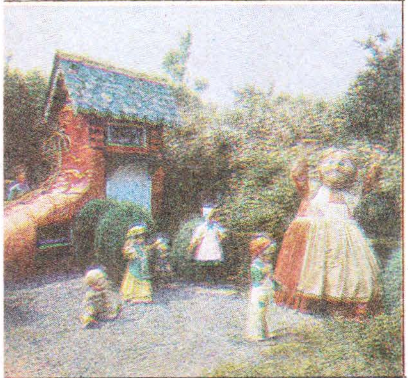

উপরে রাইম-মডেল রুমে 'উয়োম্যান ইন এ শু'র মডেল-পুতুলরা

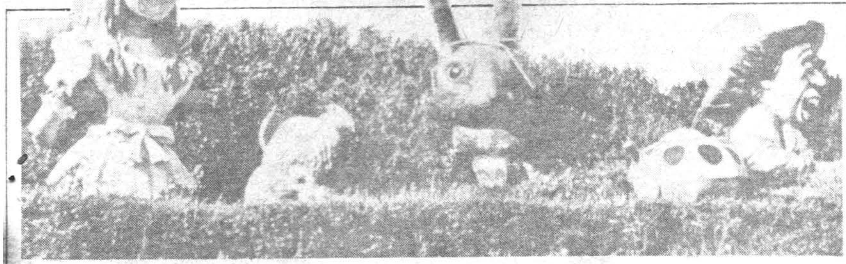

হও, তোমার মতিগতি পাল্টায়, তখন ভেবে দেখব'খন"।

"'ঠিক আছে,' বলে দৈত্য চলে গেল। তারপর দিনের পর দিন কেটে যায়। দৈত্যের সেই তর্জন-গর্জন শোনা যায় না। সে এখন বনের ফলপাকুড় খায়। সে এখন খুব শান্তশিষ্ট, ভালমানুষ। এবার সে একদিন সাহস করে অ্যাগনিসাসকে গিয়ে বলল, 'দ্যাখো, আমি আর আগের মতো নেই। এবার আমায় বিয়ে করবে তো?'

ভাঙা- রস্টরমেল দুর্গ

"'আর-একটা পরীক্ষা তোমাকে দিতে হবে। তুমি এত জন্তু-জানোয়ার মানুষ খেয়েছ যে, তোমার শরীর দূষিত হয়ে গেছ। সেই শরীর এখন শুদ্ধ করতে হবে। তারপর বিয়ের কথা বোলো।...ওই যে দেখতে পাচ্ছ চ্যাপেল পোর্থ, ওখানে গিয়ে প্রেয়ার বক্সের সামনে দেখবে একটি ছোট্ট গর্ত। তোমার রক্তে ওই গর্তটা যদি ভরে ফেলতে পারো, তা হলেই ব্যস্। তোমার শরীর পবিত্র।'

"বেশি কথায় আর কাজ কী। যে-ভাবেই হোক, গর্তটা রক্তে ভরে ফেলতে হবে। কিন্তু যত রক্ত দেয়, গর্ত আর কিছুতে ভর্তি হয় না। ক্লান্ত, নির্জীব বলস্টার লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। ঠিক সেই সময় অ্যাগনিসাস এসে দাঁড়ায় বলস্টারের সামনে। বলে, 'ওঠো বলস্টার, তুমি এখন শুদ্ধ। পবিত্র। তাকিয়ে দ্যাখো, স্বর্ণরথ নিয়ে দেবদূতেরা দাঁড়িয়ে আছেন তোমার সামনে। তোমার এই পবিত্র আত্মা নিয়ে স্বর্গে চলে যাও। আজ থেকে 'বলস্টার' নামে আর কোনও দৈত্য রইল না। তুমি আজ থেকে সেন্ট অ্যাগনিস।'"

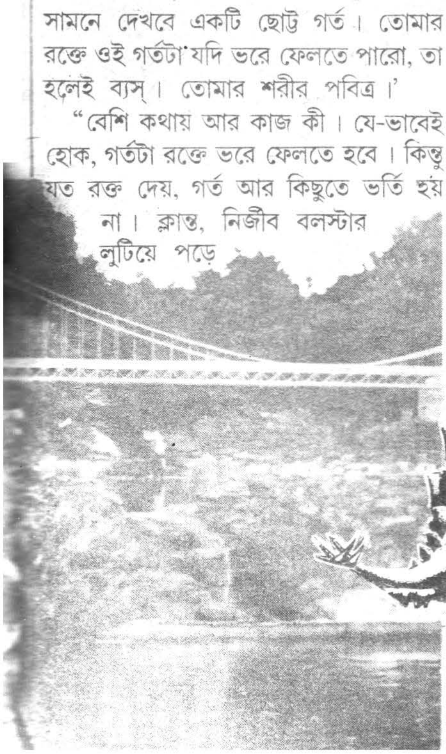

গল্প শেষ করলেন অহীন্দ্রবাবু। তারপর বললেন, "দেখুন, সত্যি এই নামে কোনও দৈত্য ছিল কি না আমি জানি না, তার আত্মা এখনও এখানে ঘুরে বেড়ায় কি না বলতে পারব না, তবে এখন যেখানে আমরা থামব, সেটা সেন্ট অ্যাগনিস পার্ক, সেন্ট অ্যাগনিস ভ্যালিতেই আছে। জায়গাটার কোনও তুলনা নেই। চোখ-জুড়নো ছবির মতো। বলতে পারেন, স্বপ্নপুরী।"

স্বপ্নপুরীই বটে। ভেতরে ঢুকতে লাগে বড়দের এক পাউণ্ড আর ছোটদের আধ পাউণ্ড। এই প্রবেশমূল্য থেকেই পার্কের যাবতীয় খরচ ওঠে। কোনও সরকারি সাহায্য নেওয়া হয় না। শীতকালে এখানে খুব বরফ পড়ে বলে অ্যাগনিস পার্ক খোলা থাকে আটমাস, মার্চ থেকে অক্টোবর।

অহীন্দ্রবাবু বললেন, "অ্যাগনিস পার্ককে চার অংশে ভাগ করতে পারেন। এক-এক অংশে এক-একরকম দর্শনীয় জিনিস আছে। ২৮ একর জায়গা জুড়ে এই পার্কটাকে ভালভাবে দেখতে পাঁচ-ছ' ঘণ্টা তো লাগেই।"

আমরা প্রথমে যে-অংশটায় ঢুকলাম, সেটা মিনিয়েচার কর্নওয়াল। অর্থাৎ কর্নওয়াল কাউন্টির উল্লেখযোগ্য সবকিছুর মডেল করে এখানে দেখানো আছে। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ি সামনের মডেলের দিকে। এটা হচ্ছে ট্রেরিন ম্যানর হাউস। ১৫৭০ সালে তৈরি করেন কর্নওয়ালের বিখ্যাত আরনল্ড পরিবার। অহীন্দ্রবাবু আমাদের বোঝান, "পাশেই দেখছেন যে চার্চ, এটা হচ্ছে ট্রুরো ক্যাথিড্রাল মডেল। সপ্তম এডওয়ার্ড এই চার্চের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। আর ওই দেখুন বলডুইন ব্রিজ। ব্রিজের পিছনে প্রাচীন কর্নওয়াল সরকারের ভাঙা রস্টরমেল ক্যাস্‌ল। আরও দেখুন, এই কর্নওয়ালে যে খড়ের বাড়ি হত, তার একটা মডেল। কোয়েকার মিটিং হাউস। সে-সময় এরকম বাড়ি করতে ৬৬ পাউণ্ড লাগত। এ ছাড়া ওখানে রয়েছে টিন-মাইন, গোলাকার দেওয়ালের রাউণ্ড হাউস, হেলিপোর্ট, মাইনিং ভিলেজ, রয়্যাল নেভাল এয়ার স্টেশন, কাউণ্টি হল।"

সত্যিই চমৎকার। যত দেখছি, বিস্ময় বেড়ে যাচ্ছে। হঠাৎ অহীন্দ্রবাবুর মেয়ে মারিয়া বলে উঠল, "তোমরা আসল জায়গায় যাচ্ছ না কেন? ওই যে লস্ট ওয়ার্ল্ড অব ডায়নোসরস?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যাব," বলতে বলতে অহীন্দ্রবাবু আমাদের নিয়ে যেখানে ঢুকলেন, সেটা অ্যাগনিস পার্কের দ্বিতীয় অংশ। দেখে তাক লেগে গেল। অদ্ভুত এক প্রাগৈতিহাসিক জগৎ!

ফ্যালমাউথ হোটেলের মডেল

ফেয়ারিল্যাণ্ডে ঢুকে থমকে দাঁড়াই একটা জায়গায়। এটা হচ্ছে 'অ্যালিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড' হাউস। আশ্চর্য জগতে পৌঁছে অ্যালিস যেমন অবাক হয়েছিল, আমাদেরও সেইরকম অবাক হওয়ার পালা। ঘুরতে ঘুরতে আরও কত কী যে দেখলাম, লিটল রাইডিং হুড, নোয়াস আর্ক, জিঞ্জার ব্রেড হাউস, স্নো হোয়াইট, আইস প্যালেস, জিপসি ক্যারাভান, গালিভার। প্রত্যেকটি রাইম-মডেল রুমের সামনে দাঁড়িয়ে বারবার অবাক হচ্ছিলাম। চলমান মডেল, পেছন থেকে টেপ-রেকর্ডারে মিষ্টি গলায় চলছে রাইমস ও গল্প। গল্প আর ছড়ার তালে-তালে চলছে নড়াচড়া, চলাফেরা করছে মডেলের পুতুলরা। 'জ্যাক অ্যাণ্ড জিল' হাউসের সামনে দাঁড়িয়ে তাজ্জব হয়ে যেতে হয়। দেখলাম, জ্যাক জল তুলতে গিয়ে পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ছে। আর জিল হাত ধরে টেনে তুলছে তাকে। শব্দ ভেসে আসছে: জ্যাক ফেল ডাউন, অ্যাণ্ড ব্রোক হিজ ক্রাউন, অ্যাণ্ড জিল কেম টাম্বলিং আফ্‌টার।

কী কাণ্ড বলো তো!

এমন চমৎকার একটা জায়গায় একবার কেন, একশোবার যেতেও আমি রাজি।

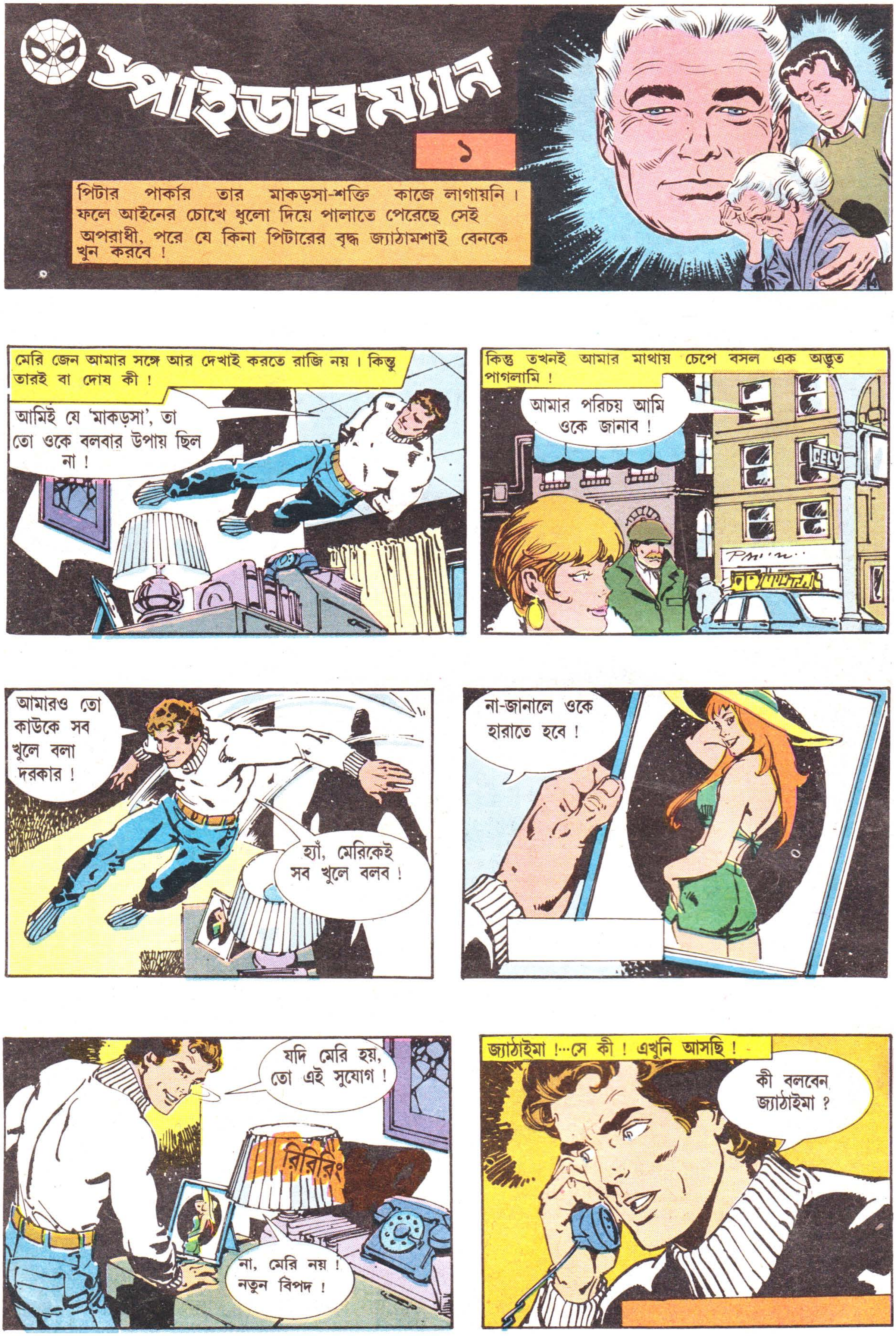

স্পাইডারম্যান
১
পিটার পার্কার তার মাকড়সা-শক্তি কাজে লাগায়নি। ফলে আইনের চোখে ধুলো দিয়ে পালাতে পেরেছে সেই অপরাধী, পরে যে কিনা পিটারের বৃদ্ধ জ্যাঠামশাই বেনকে খুন করবে!
মেরি জেন আমার সঙ্গে আর দেখাই করতে রাজি নয়। কিন্তু তারই বা দোষ কী!
আমিই যে 'মাকড়সা', তা তো ওকে বলবার উপায় ছিল না!
কিন্তু তখনই আমার মাথায় চেপে বসল এক অদ্ভুত পাগলামি!
আমার পরিচয় আমি ওকে জানাব!
আমারও তো কাউকে সব খুলে বলা দরকার!
হ্যাঁ, মেরিকেই সব খুলে বলব!
না-জানালে ওকে হারাতে হবে!
যদি মেরি হয়, তো এই সুযোগ!
রিরিরিরিং
না, মেরি নয়! নতুন বিপদ!
জ্যাঠাইমা!...সে কী! এখুনি আসছি!
কী বলবেন, জ্যাঠাইমা?

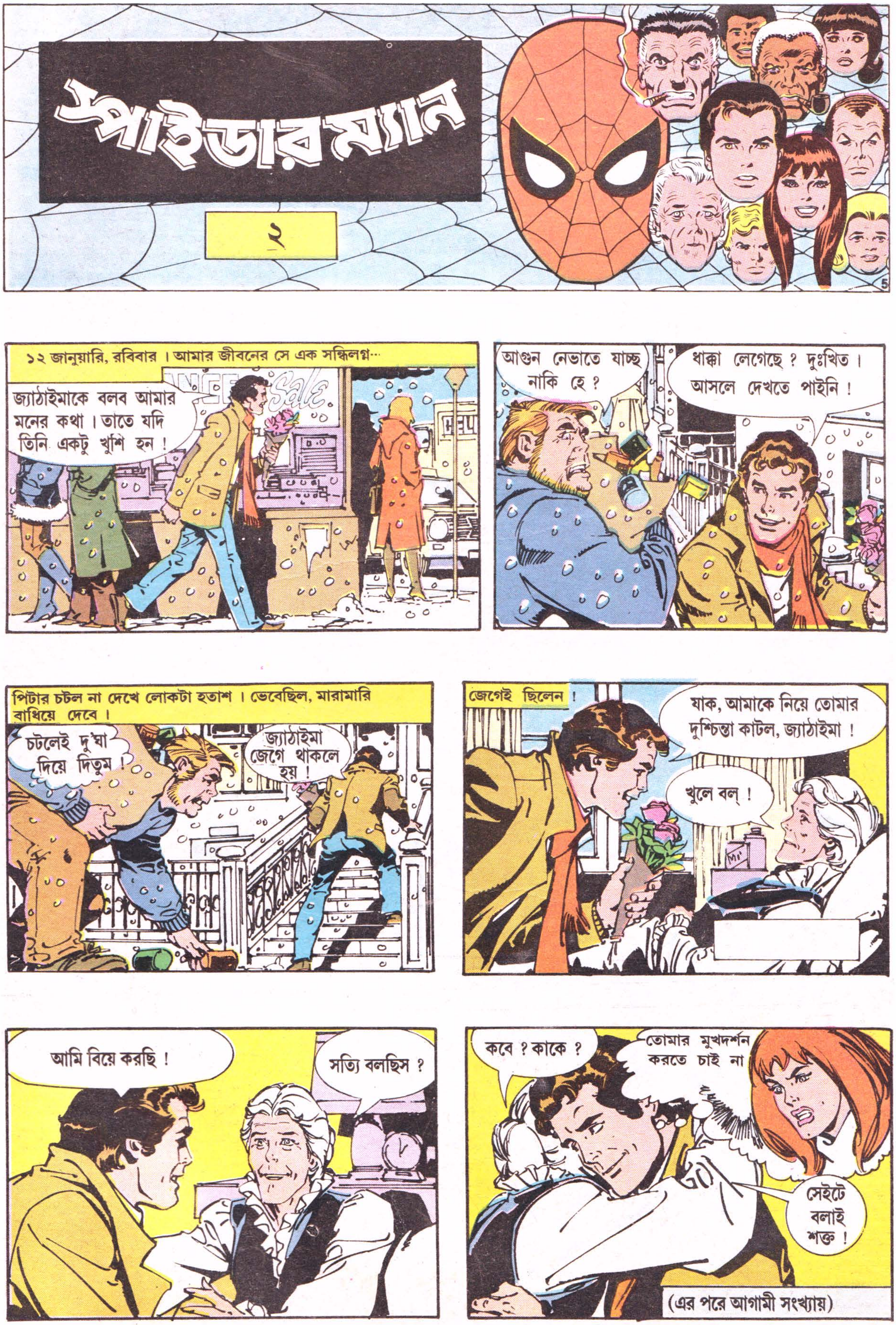
স্পাইডারম্যান
২
১২ জানুয়ারি, রবিবার। আমার জীবনের সে এক সন্ধিলগ্ন···
জ্যাঠাইমাকে বলব আমার মনের কথা। তাতে যদি তিনি একটু খুশি হন!
আগুন নেভাতে যাচ্ছ নাকি হে?
ধাক্কা লেগেছে? দুঃখিত। আসলে দেখতে পাইনি!
পিটার চটল না দেখে লোকটা হতাশ। ভেবেছিল, মারামারি বাধিয়ে দেবে।
চটলেই দু'ঘা দিয়ে দিতুম!
জ্যাঠাইমা জেগে থাকলে হয়!
জেগেই ছিলেন!
যাক, আমাকে নিয়ে তোমার দুশ্চিন্তা কাটল, জ্যাঠাইমা!
খুলে বল্!
আমি বিয়ে করছি!
সত্যি বলছিস?
কবে? কাকে?
তোমার মুখদর্শন করতে চাই না
সেইটে বলাই শক্ত!
(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

আপনি কি...
ভালো কোয়ালিটি পাবার জন্যে বেশী দাম দিচ্ছেন?
না, বাজে কোয়ালিটি কিনছেন?

বিজ-এর সুষমতা
গ্রহণ করুন!

দামে

আগে পরিষ্কার করার পাউডার দু'রকমের হত। এক তো খুব উঁচু কোয়ালিটির, যার দাম চোকাতে গিয়ে পকেট খালি হয়ে যায়, আর অন্যটি একদম সস্তা কোয়ালিটির, যার দাম নিশ্চয়ই কম, তবে কোয়ালিটি ...মাফ করবেন!

তারপর এলো বিজ

বিজ—দামে আর কোয়ালিটিতে এক অসাধারণ সুষমতা বজায় রাখে। আসলে বিজের দাম থেকে দ্বিগুণ লাভ পাওয়া যায়, দেখুন কি করে—সুপার বিজ অন্য নামকরা পাউডারের তুলনায় ২৫% কম দামে পাওয়া যায়, আর এটি অন্য সস্তা পাউডারের চেয়ে কম পরিমাণে ব্যবহার করতে হয়—অথচ ফল হয় তেমনিই ঝকঝকে ... ঝলমলে!

কাজে

সুপার বিজে বাড়তি ডিটারজেন্ট আছে,—যা তেলচিটেভাব সহজে, আর দাগ-ময়লা-কালি নিমেষে সাফ করে। সুপার বিজে চট করে ফেনা হয়, তাই অনেক তাড়াতাড়ি, অনেক ভালো করে আর অনেক সহজে সাফ করতে পারে।

সুপার বিজ মসৃণ বা খরখরে সবকিছুর ওপরই সমান প্রভাবশালী। স্টীলের বাসন বা কাঁচের, কাঁটা-চামচ বা সিঙ্ক আর মেঝে — প্রায় সবকিছুই এই দিয়ে সাফ করতে পারেন। পরিষ্কার করার সমস্যা যত রকমেরই হোক না কেন, তার সমাধানের জন্যে যখন বহুপযোগী সুপার বিজ রয়েইছে, তখন আর আলাদা আলাদা দামী পাউডার কেনবার দরকার কি? সাশ্রয় আর কোয়ালিটি কোনোটাই হারাবেন না! বিজের দারুণ সাশ্রয় আর দারুণ কাজের সুষমতা গ্রহণ করুন!

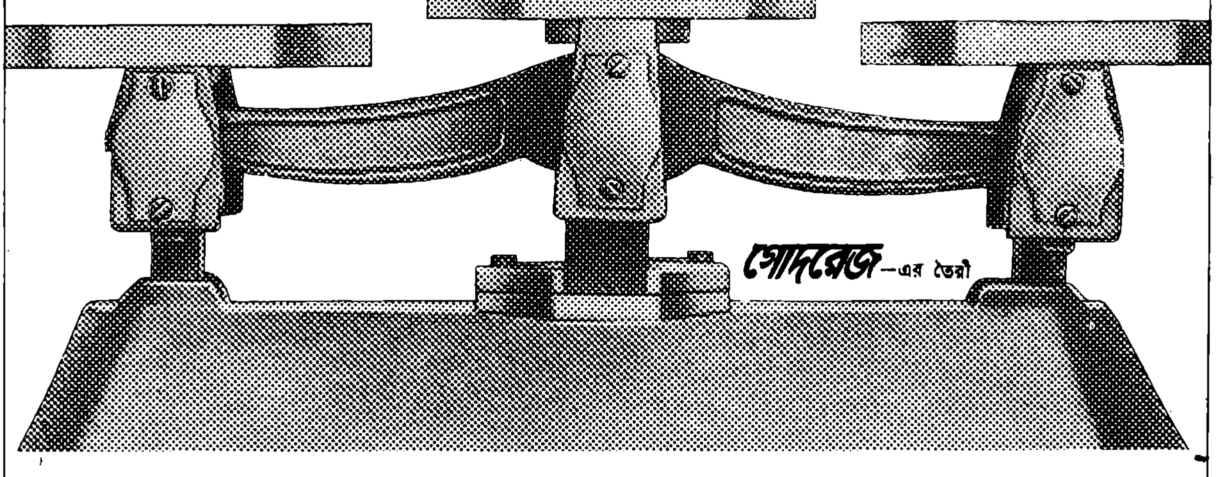

দাম কম হলে কি হয়, তেমনিই ঝকঝকে...ঝলমলে রয়!

CASGS-163-244BEN

মিলির স্বপ্ন

"কী সুন্দর ছোট্ট কুঁড়েঘরটা !" মিলি বিদেশী পত্রিকার ছবিটা তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছিল, আর ভাবছিল। পেছনে সবুজ পাহাড়, সামনে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে ছোট্ট পাহাড়ি নদী।

Milly looked at the picture for a long time. She couldn't stop looking at it, it was so beautiful. "Now, where have I seen a cottage like that?" she thought. "Was it in a dream?"

She often has dreams in which she sees beautiful places. Once she had a dream in which she found herself in a strange country. She still remembers the dream vividly. She remembers looking around her with joy and surprise and saying to herself, "I've never seen a sky so blue. I've never seen grass so green. I've never heard birds singing so sweetly. It must all be a dream."

Alas, it was all a dream.

That day she wrote in her diary, "That was a dream, but some day it may come true. Some day I may hear a bird sing like that. Some morning I may wake up and see the sun come up in the world of my dream."

We, too, would like to see that happen, wouldn't we?

এই যে ইংরেজি বাক্যের কাঠামো ঃ
Subject-Verb-Object.
এই কাঠামোতে বাক্যটা এ-রকমও হতে পারে :
She/couldn't stop/looking.
She/remembers/looking (around her).
She/remembers/saying (to herself).

I/may *hear*/a bird sing.
I/may *see*/the sun come up.

The policeman/*noticed*/the thief enter the house.
I/*watched*/him perform his tricks.

প্রসাদ

তাঞ্জাম…তমসুক…

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিভার স্পর্শে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য রাতারাতি ঐশ্বর্যময় হয়ে উঠেছিল। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।' ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' বঙ্গউপন্যাসের রাজপথ নির্মাণ করে দিয়েছে। নীচের শব্দগুলি ও বাক্যাবলি বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা থেকে নেওয়া। প্রতিটি শব্দের পাশে কয়েকটি আনুমানিক অর্থ দেওয়া আছে। যেটি ঠিক মনে হবে, তাতে দাগ দেবে। সবশেষে উত্তরের সঙ্গে মেলাবে।

১। **কৃতান্ত**—(ক) মৃত্যু, (খ) যম, (গ) যমদূত, (ঘ) ভয়ংকর।

২। **নিদাঘ**—(ক) বজ্র, (খ) তপ্ত মেঘ, (গ) বৈশাখ, (ঘ) গ্রীষ্মকাল।

৩। **ভদ্রাসন**—(ক) উচ্চাসন, (খ) শিবের আসন, (গ) বসত বাটী, (ঘ) ভদ্রজনের বসার আসন।

৪। **তাঞ্জাম**—(ক) অশ্ব, (খ) পাল্‌কি, (গ) অপ্রকটিত শকট, (ঘ) ডুলি।

৫। **তমসুক**—(ক) ঋণের দলিল, (খ) ছাড়পত্র, (গ) দানপত্র, (ঘ) হুণ্ডি।

উত্তর : ১। **কৃতান্ত**—(খ) যম। মূল অর্থ, যে বিনাশ করে। যেমন, 'আয়েষা বুঝিলেন, কৃতান্তের গ্রাস পূর্ণ হইবার আর বিলম্ব নাই।' ২। **নিদাঘ**—(ঘ) গ্রীষ্মকাল। মূল অর্থ, যা নিয়ত দগ্ধ করে। যেমন, 'নিদাঘের প্রথম বিদ্যুৎ—সে আমার মৃত্যু।' ৩। **ভদ্রাসন**—(গ) বসত বাটী। মূলে এর অর্থ ছিল শ্রেষ্ঠ আসন বা সিংহাসন। বাংলায় এর অর্থ যে বাড়িতে বাস করা হয়। যেমন, 'চন্দ্রশেখর উত্তরীয় মাত্র গ্রহণ করিয়া ভদ্রাসন ত্যাগ করিয়া গেলেন।' ৪। **তাঞ্জাম**—(খ) পালকি। এ পালকি কাঠের নয়, ধাতু দিয়ে তৈরি সুসজ্জিত

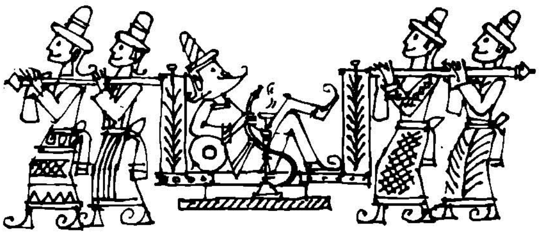

এবং খোলা। সে আমলে রাজপুরুষেরা ব্যবহার করতেন। যেমন, 'নবাব মিরকাসেম আলি খাঁ তাঞ্জাম হইতে অবতরণপূর্বক এই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।' ৫। **তমসুক**—(ক) ঋণের দলিল, যার অর্থ ঋণ-স্বীকারপত্র। মূলে আছে আরবি শব্দ তমস্‌সুক্‌। যেমন, 'এ দানপত্র নহে তমসুক।'

দেব-সেনাপতি

টিনটিন * হার্জ

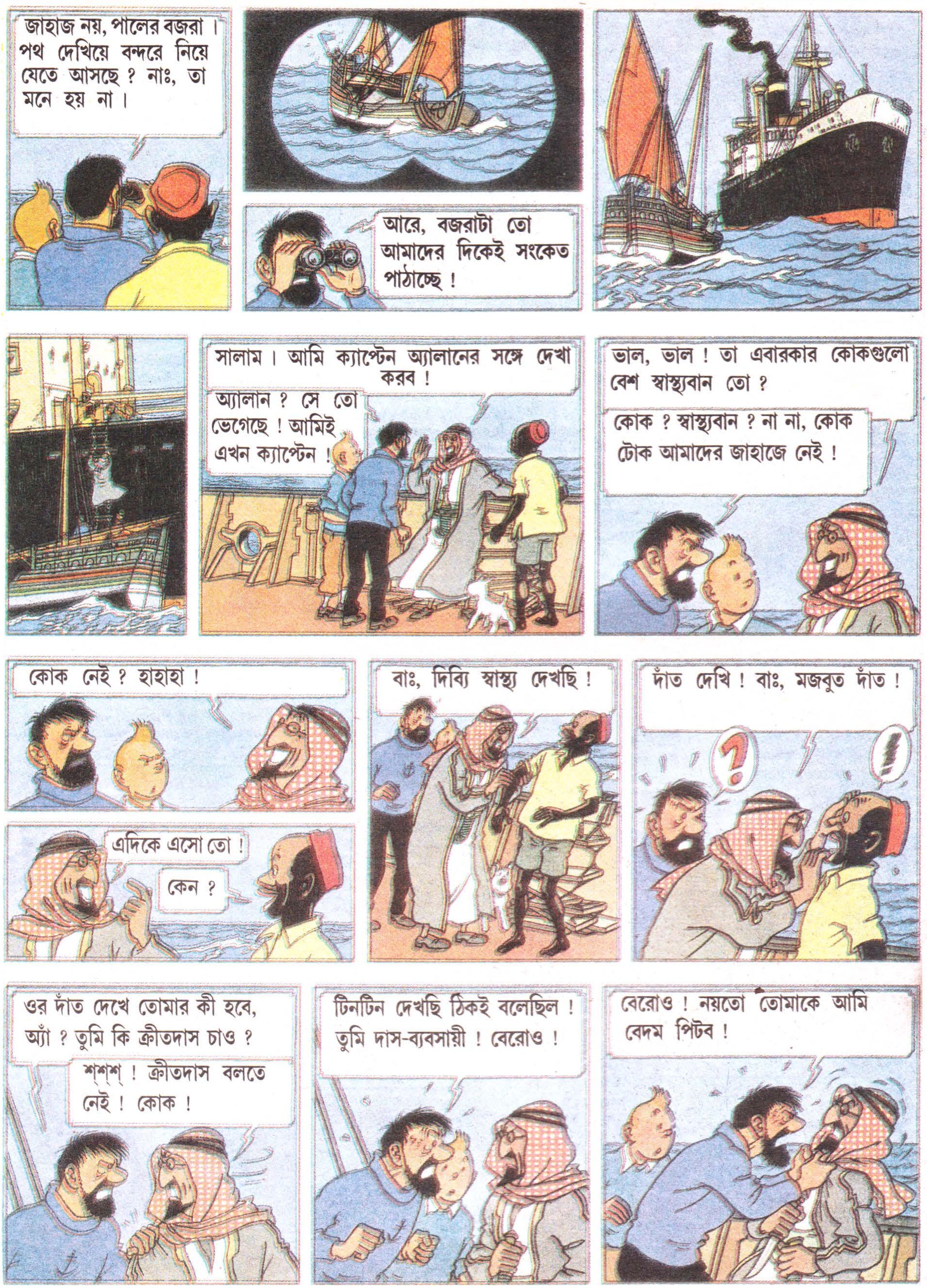
জাহাজ নয়, পালের বজরা। পথ দেখিয়ে বন্দরে নিয়ে যেতে আসছে ? নাঃ, তা মনে হয় না।
আরে, বজরাটা তো আমাদের দিকেই সংকেত পাঠাচ্ছে !
সালাম। আমি ক্যাপ্টেন অ্যালানের সঙ্গে দেখা করব !
অ্যালান ? সে তো ভেগেছে ! আমিই এখন ক্যাপ্টেন !
ভাল, ভাল ! তা এবারকার কোকগুলো বেশ স্বাস্থ্যবান তো ?
কোক ? স্বাস্থ্যবান ? না না, কোক টোক আমাদের জাহাজে নেই !
কোক নেই ? হাহাহা !
এদিকে এসো তো !
কেন ?
বাঃ, দিব্যি স্বাস্থ্য দেখছি !
দাঁত দেখি ! বাঃ, মজবুত দাঁত !
ওর দাঁত দেখে তোমার কী হবে, অ্যাঁ ? তুমি কি ক্রীতদাস চাও ?
শ্‌শ্‌ ! ক্রীতদাস বলতে নেই ! কোক !
টিনটিন দেখছি ঠিকই বলেছিল ! তুমি দাস-ব্যবসায়ী ! বেরোও !
বেরোও ! নয়তো তোমাকে আমি বেদম পিটব !

লোহিত সাগরের হাঙর

কপিরাইট : কাস্টারম্যান এস. এ.

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

সুকুমার সেন বলছেন তাঁর ছেলেবেলার কথা

কার্তিক মজুমদার

আচার্য সুকুমার সেনের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হয় ইনি যেন বঙ্গের বোধিদ্রুম। চিন্তা বা জ্ঞানের কোনও সমস্যার উত্তাপ যখনই পীড়িত করে, তখন তাঁর বিশাল ছায়ায় এসে দাঁড়ালে শান্ত সমাধান মেলে। অগাধ পাণ্ডিত্য, আশ্চর্য স্মৃতিশক্তির অধিকারী এই পুরুষটি একাধারে কঠোর-কোমল। 'আনন্দমেলা' পত্রিকার তরফ থেকে সেদিন তাঁর কাছে গিয়ে জানালাম, "আপনার ছেলেবেলার কথা জানবার জন্যে কিছু জিজ্ঞাসা করব।" উনি সহাস্যে বললেন, 'যত খুশি—।'

প্রশ্ন যখন খুবই ছোট ছিলেন, সেই সময়ের কথা কি আপনার মনে পড়ে?

উত্তর হ্যাঁ, পড়ে বইকি। আমার যখন আড়াই বছর বয়স, তখন বাবার মুখে 'বেলা যে পড়ে এল, জলকে চল' কবিতার পাঠ শুনেছি। তখন রবীন্দ্রনাথের ওই কবিতার অর্থ কিছুই বুঝিনি। কিন্তু মনের মধ্যে তা দোলা দিয়ে গিয়েছিল।

প্রশ্ন আপনার ছেলেবেলা কোথায় কেটেছে?

উত্তর : আমার জন্ম হয়েছিল কলকাতায়, গোয়াবাগানে মামার বাড়িতে, উনিশ শো' সালের জানুয়ারি মাসে। জন্মাবার পর ছ'মাস আমি একটানা কলকাতায় কাটিয়েছি। তারপর চলে যাই আমাদের গ্রাম গোতানে। গোতান বর্ধমান জেলারই একটা গ্রাম। তিন বছর বয়সে দু-তিন দিনের জন্যে মামার বাড়ি এসেছি বটে, কিন্তু শহরের ইটকাঠের গারদ আমার ভাল লাগত না। ছেলেবেলায় বড্ড একগুঁয়ে ছিলুম, কিছুতেই কলকাতায় যেতে চাইতুম না।

ছেলেবেলার কথা মনে করলেই আমার মনের মধ্যে ভেসে ওঠে গোতান গ্রাম আর সেখানকার মাঠ, পেয়ারাতলা, তালপুকুর আর তিনটি মুখচ্ছবি। বড়মায়ের, দাদার ও বাবার। বড়মা হলেন আমার বাবার জ্যাঠাইমা, তিনি আমার বাবাকেও শৈশবে কোলে করে মানুষ করেছিলেন। সেই মৌরসি স্বত্ব আমারও ছিল বছর পাঁচেক বয়স পর্যন্ত, মানে তাঁর মৃত্যু অবধি। আমার দাদা অর্থাৎ পিতামহ ছিলেন অন্নদাপ্রসাদ সেন, তাঁরও বড় আদরের ধন ছিলুম আমি। আর বাবা হরেন্দ্রনাথ সেনের স্নেহ লাভ করেছি দীর্ঘজীবন। মা থাকতেও আমি বড়মায়ের কাছেই সবসময়ে থাকতুম। বড়মা আর দাদার ভালবাসার তুলনা ছিল না।

প্রশ্ন আপনি বলেছিলেন, ছেলেবেলায় খুব একগুঁয়ে ছিলেন। ওঁদের উপর দৌরাত্ম্য করতেন না?

উত্তর হ্যাঁ, করতুম। যতখানি শক্তিতে কুলোত। বড়মা'র আহ্নিক, শিবপুজো থেকে ভাতরাঁধা তক তাঁর গা ঘেঁষে থাকতুম। রাত্রে তাঁর সঙ্গে ঘুমোতুম। তিনি রোজ ভোরে গঙ্গামাটির শিব গড়ে পুজো করতেন। আমি বায়না ধরলুম, আমিও শিবপজো করব। আমার খুব সর্দির ধাত ছিল। মাটি ঘেঁটে শিব গড়লে সর্দি হবে ভেবে আমার জন্যে ব্যবস্থা হল শ্বেতপাথরের শিব। সে শিব এখনও আছেন। তিন বছর বয়সে দাদার সঙ্গে বসে ভাত খেতুম। তাঁর সঙ্গে ঘুমোতুম দুপুরে। 'আয় রে ভুনি, আয় রে ভুনি' আওড়াতে আওড়াতে পিঠ চাপড়ে চাপড়ে তিনি আমায় ঘুম পাড়াতেন। দাদা আফিং খেতেন, অতএব আমিও আফিং খাব। আমার জন্যে যে গুলিটি বরাদ্দ থাকত, সেটি অবিশ্যি আমসত্ত্বের তৈরি। ফাঁক পেলেই দাদার হুঁকো টানতুম, হুঁকোর জলের ঝাঁঝ আর মিষ্টি স্বাদে বড় আনন্দ পেতুম। তাঁর চশমা, হুঁকো আমি অনেক ভেঙেছি। আমার খেলার জন্যে তিনি একটা ছোট হুঁকোও করে দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন ছেলেবেলায় খেলাধুলো কী ছিল আপনার?

'বাড়িতে দুর্গাপূজা হত। দুর্গাপূজার ক'টা দিন আনন্দ আর খাই-খাই করে কাটত। পূজার প্রধান আকর্ষণ ছিল পাঁঠা কাটা। কিন্তু কাটবার সময়টিতে চোখ বুজে বসে থাকতুম।'

উত্তর : শৈশবের খেলাধুলো বলতে ছিল ঠাকুরপুজো। তখন হাডুডু বা নুনচিক খেলার খুব প্রচলন ছিল। আমরা ছোটরা আনিমানি আর দৌড়াদৌড়ি খেলতুম। ঘরে বসে খেলার মধ্যে ছিল বাবার দেওয়া কলের খেলনা নিয়ে খেলা। তারপর নেশা হল ফুটবল খেলায়। বাবা আমাকে একটা তিন নম্বর ফুটবল কিনে দিয়েছিলেন, বন্ধুদের সঙ্গে ফুটবল খেলতুম। তবে ভাল খেলতে পারতুম না। কিন্তু খেলা দেখার নেশা খুব ছিল। বর্ধমানে তখন বনবিহারী কাপুর চ্যালেঞ্জ শিল্ডের খেলায় বাইরের ভাল ভাল টিম খেলতে আসত। সেসব খেলা দেখতুম।

প্রশ্ন আপনার যখন ছেলেবেলা, তখন বাংলার গ্রামে গ্রামে তো বারোমাসে তেরো পার্বণ হত?

উত্তর ঠিক বারোমাসে তেরো পার্বণ না থাকলেও পূজা উৎসব প্রায় লেগেই থাকত। রোজকার আনন্দ ছিল গৃহদেবতা রঘুনাথের পূজার পর তুলসীতলায় বাতাসা ছড়িয়ে হরির লুট। বাড়িতে দুর্গাপূজা হত। দুর্গাপূজার ক'টা দিন আনন্দ আর খাই-খাই করে কাটত। পূজার প্রধান আর প্রবল আকর্ষণ ছিল পাঁঠা কাটায়। কিন্তু কাটবার সময়টিতে চোখ বুজে বসে থাকতুম। প্রতিমা বিসর্জনের পরে সবাই কলাপাতায় একশো আটবার দুর্গানাম লিখতুম। পা ঢেকে বসে শান্তিজল নিতুম। কালীপূজার আগের দিন বাঁশ খড় ও তালপাতার তৈরি প্রকাণ্ড উঁচু ঘরে আমরা ছোট ছেলেরা 'এঁজোল পেঁজোল' বলতে বলতে মশাল দিয়ে আগুন ধরাতুম। দীপাবলির দিন বড়রা প্রদীপ জ্বালাতেন, আমরা সাহায্য করতুম। সরস্বতী পূজা আমাদের বাড়ি ঘটে হত। তিলেখাজা, কুল আর নানা ভাজাভুজি ছিল তার বড় আকর্ষণ। দোলের দিন সবাই পিচকারি রঙ নিয়ে মাতামাতি করত। কিন্তু আমায় রং খেলতে দেওয়া হত না সর্দির ধাত ছিল বলে। রঘুনাথের শেতল-ক্ষীরের প্রসাদ সবটাই ঠাকুরমশাই নিয়ে যেতেন। সেটা আমার একটা ক্ষোভের বিষয় ছিল।

প্রশ্ন পড়াশুনোর পাট কবে থেকে শুরু হয়েছিল আপনার?

উত্তর : আমার প্রথম শিক্ষাগুরু বড়মা। বর্ণমালা শিখি তাঁর কাছ থেকেই। প্রথম ভাগে তিনি আমায় এগিয়ে দিতেই আমি 'হাসিখুশি' ধরি। আর দ্বিতীয় ভাগের পর

'শিশুশিক্ষা'। তখন আমার বয়স সাড়ে পাঁচ বছর। পাঁচ বছর যখন বয়স, তখন বড়মায়ের তিরোধান ঘটেছে। ওই সময়ে আমার জীবনে এমন একটা দুর্ঘটনা ঘটল, যাতে আমার লেখাপড়া হয়তো চিরদিনের মতো ঘুচে যেত। সেবারে মা ও আমাদের ভাইবোনকে কলকাতায় মামার বাড়িতে রেখে বাবা কটকে গেছেন, সেখানে সার্ভে পরীক্ষা দিয়ে জগন্নাথ দর্শন করে ফিরবেন। সামনের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলুম, ফিরে এলুম শীতে কাঁপতে কাঁপতে, প্রচণ্ড জ্বর নিয়ে। তারপরেই অজ্ঞান হয়ে গেলুম, জ্ঞান ফিরেছিল দেড় মাস পরে। মারাত্মক অসুখ হয়েছিল আমার। মাথার খুলির হাড় নরম হয়ে গিয়েছিল। মরার কয়েক ঘণ্টা আগে মানুষের বাক্‌রোধ হয়, আমি ওই অবস্থায় ছিলুম বাইশ দিন। টেলিগ্রাম পেয়েই বাবা জগন্নাথ দর্শন ফেলে কলকাতায় ছুটে এলেন আমাকে দেখতে। সেই ঘোর অজ্ঞান অবস্থায় আমি নাকি আকুল হয়ে বলেছিলুম, 'বাবা, আমাকে বাঁচাও।' সেকথা বাবার মনে লেগেছিল। কলকাতার নামজাদা যত ডাক্তার কবিরাজ সকলকেই ডেকেছিলেন। মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল কর্নেল লিউকিস থেকে কুমারটুলির দুর্গাচরণ কবিরাজ, কেউ বাদ যাননি। অসুখের সমস্ত কালটা মা আমাকে কোলের কাছে রেখে আহার নিদ্রা ভুলে দিনরাত সেবা করেছিলেন। বাবা-মায়ের আশীর্বাদে আমি বেঁচে উঠেছিলুম। তবে চোখে ভাল দেখি না, দাঁড়াতে পারি না, কথা বলি আধো-আধো। খুব ধীরে-ধীরে সুস্থ হতে লাগলুম হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ইউনান সাহেবের চিকিৎসায় আর মা নবনলিনী দেবীর শুশ্রূষায়। বাবা একটা বাসা নিলেন শ্যামবাজারের কলুটোলায়। সেই বাসাবাড়িতে জানলার শিক ধরে আমি আবার দাঁড়াতে শিখলুম। সেটা আমার দ্বিতীয় জন্ম।

'দৌড়ে নীচে এসে দেখি,...একটু দূরে ওভারব্রিজের পাটাতনের তলায় দাঁড়িয়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ।...ঋজু দীর্ঘদেহ, ধবধবে রঙ, কালো জোব্বা গায়ে, মাথায় কালো টুপি, অপূর্ব সুন্দর মূর্তি।'

প্রশ্ন : ওই বয়সে কী কী বই পড়তেন আপনি?

উত্তর : বলছি। ওই সময়ে বাবা একদিন দু'খানা বই কিনে আমায় দিলেন। শক্ত মলাটের বড় আকারের পাতলা বই। নাম 'রাক্ষস-খোক্কস' ও 'ভূত-পেত্নি'। লেখক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। ওই দুটি বই পড়ার ভাল লাগাই আমার জীবনের লেখাপড়ার পথে নামিয়ে ঠেলে দিয়েছিল। বই দুখানির

যেমন ঝরঝরে ভাষা, তেমনি বর্ণনা। এরপর শ্যামবাজারের বাসা ছেড়ে আমরা চলে আসি বর্ধমান শহরে। ওই সময়ে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'আরব্য-উপন্যাস', দক্ষিণাচরণ মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি', উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর 'টুনটুনির বই', চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রবিনসন ক্রুসো' এইসব বইয়ের নাম মনে পড়ে। ইস্কুলে পড়ার কালে বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে পাঁচকড়ি দে'র উপন্যাস পর্যন্ত সবকিছুই গোগ্রাসে গিলেছি। ইংরেজি গল্পের বই পড়া ধরি ক্লাস এইট থেকে। বর্ধমানে এসে বাবা বর্ধমান রাজ লাইব্রেরির মেম্বার হলেন। আমাকে যথেচ্ছ বই নেবার অধিকার দিলেন। তখনও আমার পায়ে জোর হয়নি। আধ মাইল রাস্তা খানিকটা হেঁটে, খানিকটা দাসীর কোলে চড়ে বই নিয়ে আসতুম। নাম সই করতুম রঘুনাথ সেন।

প্রশ্ন : ওই নামে কেন?

উত্তর : আগে আমার নাম ছিল অনিল। গৃহদেবতা রঘুনাথের কৃপায় কঠিন অসুখে রক্ষা পেয়েছিলুম বলে রঘুনাথ নাম দেওয়া হয়েছিল। কিছু পরে রঘুনাথ সুকুমারে রূপ পেল। বাবা পেশায় উকিল ছিলেন, কিন্তু নানা বিষয়ের নানা বই তিনি পড়তেন। আমাকে শুধু বইয়ের রাজ্যে ছেড়ে দেননি, নানা বিষয়ে কৌতূহল জাগাতে চেষ্টা করতেন। সাদা কথায় উশকে দিতেন। ওই হল আসল শিক্ষাদান। উপদেশও তিনি আমায় দিতেন না। তাঁর কাছে আমার ঋণের সীমা নেই।

প্রশ্ন : ইস্কুলের পড়াশুনা কোথায় করেছিলেন আপনি?

উত্তর : যখন আমি বড় হয়ে ইঞ্জিন ড্রাইভার হবার স্বপ্ন দেখছি, সেই সময়ে ১৯১২ সালে আমায় মিউনিসিপ্যাল স্কুলে ক্লাস সিকস্-এ ভর্তি করে দেওয়া হল। আমি এক নতুন জগতে এসে পৌঁছলুম। সেখানে বেঙ্গল রিডার, প্যালগ্রেভের 'চিলড্রেন'স ট্রেজারি অব ইংলিশ ভর্স', ব্যাকরণের 'চাইল্ড'স ইজি গ্রামার', 'চারুপাঠ', 'পদ্যপাঠ' বাংলা ব্যাকরণ, অঙ্ক, জ্যামিতি, নানা গলায় মেশানো হৈহৈ, ঘণ্টার আওয়াজ, সব নিয়ে মনে হল—এলেম নতুন দেশে।

প্রশ্ন : তখনকার দিনের মাস্টারমশাইদের কথা কিছু বলুন।

উত্তর : তখনকার দিনে মাস্টারমশাইদের আমরা ভয় ও শ্রদ্ধা দুইই করতুম। পড়াশুনোয় ফাঁকি দিলে শাস্তি দিতে তাঁরা কসুর করতেন না। গালমন্দ, মারধোর, বেত মারা, সবই ছিল। আবার পিঠ চাপড়ে 'ভেরি গুড, ভেরি গুড' বলে উৎসাহ দিতে এক মুহূর্ত বিলম্ব হত না। অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞান ছিল তাঁদের। যাঁর যতখানি জ্ঞান, তা ছাত্রদের উজাড় করে দিতেন। নির্দয়ভাবে অঙ্ক কষিয়ে নিতেন। ঠিক যেন বাপ-খুড়ো-জ্যাঠার ব্যবহার পেয়েছি তাঁদের কাছ থেকে। তাঁরা কেউই ধনবান ছিলেন না, কিন্তু লোকে তাঁদের গভীর শ্রদ্ধা করত। উনিশ শো সতেরো সালে আমি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিই। কতকাল আগের কথা, তবু ইস্কুলের মাস্টারমশাইদের মুখ আজও আমার চোখের সামনে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

'বাবা একদিন দু'খানা বই কিনে আমায় দিলেন। শক্ত মলাটের বড় আকারের পাতলা বই। নাম 'রাক্কস-খোক্কস' ও 'ভূত-পেত্নি'। লেখক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। ওই বই দুটি পড়ার ভাল লাগাই আমার জীবনের লেখাপড়ার পথে নামিয়ে ঠেলে দিয়েছিল।'

প্রশ্ন : বর্তমানে বিদ্যালয়ের যে পাঠক্রম, সে সম্বন্ধে আপনি কী বলেন?

উত্তর : বলার অনেক আছে, তবু সংক্ষেপে বলি। সংস্কৃত বাংলাভাষার ধাত্রী-মাতা। তাকে যদি অষ্টম শ্রেণীতে বিসর্জন দেবার রীতি হয়, তবে তার চেয়ে শিক্ষার দুর্দশা আর কী হতে পারে? সংস্কৃতের যে ডিসিপ্লিন, তা জানারও সৌভাগ্য শিক্ষার্থীর হয় না। কয়েকটা হরফ শিখে সে বড়জোর হিন্দিতে লেখা পড়তে পারবে। নিজের মাতৃভাষাও সে এলোমেলো করে শিখবে। কেউ বোঝে না যে, ভারতের সংহতি রক্ষার জন্য সংস্কৃতের বিশেষ প্রয়োজন। মাতৃভাষাকে সম্মান দেবার নামে ইংরেজি এখন ক্লাস সিক্স-এ শুরু করা হয়। যে বয়সে সে অনায়াসে দাঁতে চিবিয়ে খেতে পারে, সেই বয়সে তাকে সুদৃশ্য ফিডিং বোতলে দুধ খাওয়ানো হচ্ছে। ইংরেজি প্রাইমারি ক্লাস থেকেই শুরু করা উচিত। তা না হলে শিক্ষা ও শিক্ষার্থীর নিদারুণ ক্ষতি হবে। এরপর আবার পরীক্ষা তুলে দেওয়া! জাঁতা ঘোরানোর পর ছাঁকনিতে দিয়েই তো বুঝতে পারা যায়, কোনটা গম আর কোনটা ময়দা। বর্তমানে শিক্ষার পাঠক্রম দেখে আমার আতঙ্ক হয়। মনে হয়, ভবিষ্যতে এ-রাজ্যে দেখব একদল সমৃদ্ধশালী গয়লা আর তাদের গোয়ালে শান্ত তৃপ্ত গোরুর দল জাবর কাটছে।

প্রশ্ন : ইংরেজি, সংস্কৃত ভাষা অবহেলা করায় শিক্ষার্থীর সমূহ ক্ষতি হবে আপনি বলছেন, কিন্তু বাংলাভাষার কী ক্ষতি হবে?

উত্তর : রবীন্দ্রনাথ যে ভাষাকে সুদৃঢ় করে গেছেন, তার কেউ ক্ষতি করতে পারবে না।

প্রশ্ন : শৈশবের ছাত্রজীবনের বিস্ময়কর স্মৃতি কিছু মনে পড়ে?

উত্তর : ওই জীবনের প্রতিটি দিনই তো ছিল বিস্ময়। দামোদরের বন্যা দেখেছি ছেলেবেলায়। দূর থেকে মনে হল চকচকে একটা শিকল। তারপরে দেখলুম, জল গড়িয়ে আসছে, যেন একটা বড় বোড়া সাপ গড়াগড়ি খেতে খেতে আসছে। তারপরেই জল হুহু করে বেড়ে গেল, দেশ ভেসে গেল ১৩২০ সালের সেই ভয়ংকর বন্যায়। আর একটি বিস্ময়কর মধুর স্মৃতি এখনও উজ্জ্বল হয়ে আছে। তখন ইস্কুলে ক্লাস এইট-এ পড়ি। আমরা সহপাঠী তিন বন্ধু বর্ধমান স্টেশনে বেড়াতে যেতুম, মাঝে-মাঝে। সেদিন ওভারব্রিজে দাঁড়িয়ে হঠাৎ দেখলুম দু'নম্বর প্ল্যাটফরমে নামানো একটা বড় চৌকো সাইজের ট্রাঙ্ক, আর তার ডালায় সাদা অক্ষরে লেখা Mr. R. N. Tagore. দেখেই চমকে উঠলুম। বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে দৌড়ে নীচে এসে দেখি, ট্রাঙ্ক থেকে একটু দূরে ওভারব্রিজের পাটাতনের তলায় দাঁড়িয়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ। সম্ভবত ট্রেনের অপেক্ষায়। ঋজু দীর্ঘদেহ, ধবধবে রঙ, কালো জোব্বা গায়ে, মাথায় কালো টুপি—অপূর্বসুন্দর মূর্তি। তখনও ভাবতে পারিনি মানুষ এত সুন্দর হয়। মনে হল আমিই তাঁর আবিষ্কর্তা। আমাকে তো কেউ দেখিয়ে দেয়নি রবীন্দ্রনাথকে।

অজ্ঞাত সৈনিকের সন্ধে

কৃষ্ণা বসু

মণিপুরের পার্বত্য এলাকায় একটি ছোট নীরব, নির্জন গ্রামের নাম নিঙথুকঙ। গ্রামের পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ছোট-ছোট কুটিরগুলি যেন শান্তির নীড়। মণিপুরের লোকেরা বেশির ভাগই বৈষ্ণব। তাই কোনও কোনও কুটিরের দরজায় বাঁশি হাতে কৃষ্ণের ছবি আঁকা।

যদি সুহৃদদা হঠাৎ চাকরি নিয়ে কলকাতার বাইরে চলে না যেত, তবে এই অখ্যাত গ্রামের নাম আমি জীবনেও শুনতে পেতাম না। আর আজকের এই কাহিনী লিখতে বসারও কোনও প্রশ্ন উঠত না। সুহৃদদা হল আমার দাদার কলেজের বন্ধু। কলেজের পড়া শেষ করার পর কিছুদিন একটা খবর কাগজে কাজ করছিল। তারপর কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ মণিপুর গভর্নমেন্টের একটা চাকরি নিয়ে লোকটাক চলে গেল। লোকটাক্ ওয়াটার সাপ্লাই প্রোজেক্টের কাজটা মন্দ নয়। তবুও ইম্ফল শহর থেকে অনেক দূরে, লোকালয়ের বাইরে ও যেন নিজেকে নির্বাসিত করল।

ওর নির্জন-বাসের শান্তিভঙ্গ করার জন্য সেবার ইস্কুলের পুজোর ছুটি হতেই আমি সেখানে হাজির হয়ে গেলাম। ইম্ফল এয়ারপোর্টে আমাকে রিসিভ করতে এসে সুহৃদদা বললে, "কী রে বুম্বিটো, কলকাতার পুজো ছেড়ে এই জঙ্গলে এলি, তোর কি ভাল লাগবে?"

পুজোর ক'দিন ওদের প্রোজেক্টের জিপে চড়ে আমরা খুব এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ালাম। সুহৃদদার মণিপুরী ড্রাইভার ইনাখুম্বা যেমন চমৎকার গাড়ি চালায়, মানুষটিও তেমনি ভাল। লোকটাক্ লেকের ওপর পাহাড়ের গায়ে চমৎকার একটি ট্যুরিস্ট বাংলো আছে। তার তিনদিকে লেকের জল আর একদিক থেকে রাস্তা এসে উঁচুতে পাহাড়ে উঠে গেছে।

এই বাংলোতে আমরা পুজোর ক'দিন কাটালাম।

ইনাখুম্‌বা একদিন বললে, "আমরা যদি চাই ও আমাদের ওর দেশের গ্রাম চূড়াচাঁদপুরে নিয়ে যাবে। এখান থেকে খুব বেশি দূর হবে না।"

সুহৃদদা বললে, "কাল তো বিজয়া দশমী, কাল তা হলে আমরা তোমার বাড়ি যাব। মণিপুরী-ভোজ খাওয়াবে তো?"

ইনাখুম্‌বা খুব খুশি। বললে, "সেদিন আমাদের বাড়িতে এমনিতেই আত্মীয়-কুটুম্ব সব একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া হবে, যাবেন আপনারা?"

আমাদের প্ল্যান ঠিক হল, সেদিন সকালে আমরা তল্পিতল্পা গুটিয়ে বেরিয়ে পড়ব। তারপর ইনাখুম্‌বা গ্রামে সারাদিন কাটিয়ে সোজা ইম্ফল ফিরে যাব। ইম্ফলে গোবিন্দজির মন্দির ছাড়াও আরও কী সব দেখার জিনিস আছে, সে-সব দেখতে হবে তো!

পরদিন সকালে চূড়াচাঁদপুরের পথে ময়রাং বলে এক গ্রামে আমরা কিছুক্ষণ থামলাম। ময়রাংয়ের নাম আগেও শুনেছিলাম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আজাদ হিন্দ ফৌজ এইখানে প্রথম জাতীয় পতাকা তুলেছিল। সুহৃদদার ময়রাংয়ের বন্ধু মণীন্দ্র সিং আমাদের ওখানকার আই· এন· এ· ওয়ার মেমোরিয়াল দেখিয়ে দিলে। সে-সব দিনের যুদ্ধের কথা ওরা খুব গর্বের সঙ্গে বলতে ভালবাসে। যে চালাঘরটিতে আজাদ হিন্দ ফৌজের হেডকোয়ার্টার্স ছিল, বুলেটের দাগ-টাগ সুদ্ধু সেই ঘরটিও ওরা রেখে দিয়েছে। যে-সব মণিপুরী বীর আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদেরও কেউ-কেউ এখনও রয়েছেন।

ইনাখুম্‌বার গ্রামে আমরা পৌঁছতে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল, কলকাতা থেকে অতিথি এসেছে। ওদের বাড়ির উঠোনের চারপাশে চালাঘর, মাঝখানে ঠাকুরদালানের মতো উঁচু উঠোন, তার মাথায় টিনের ছাদ। সেই দালানে সারি-সারি পাত পড়েছে। একপাশে বড়-বড় হাঁড়িতে রান্না হচ্ছে। সবাই সারি বেঁধে বসে খাওয়া হল। তা তিরিশ-চল্লিশজন হবে। কলাপাতায় মোটা চালের ভাত, আর অন্তত কুড়িরকম তরিতরকারি। আর কলাপাতা দিয়ে চমৎকার বাটির মতো বানিয়েছে, সেই বাটিতে ডাল আর মাছের ঝোল। শেষপাতে আমাদের পায়েসের মতো একটা মিষ্টান্ন, তা থেকে ভুরভুর করে কর্পূরের গন্ধ বার হচ্ছে। খুব তৃপ্তি করে খাওয়া হল।

খেয়েদেয়ে গল্পগুজব হচ্ছিল, ইনাখুম্‌বার মা পান সাজছিলেন। দেখলাম ইনাখুম্‌বার মা'র খুব ইচ্ছে সে-রাতটা ছেলে বাড়িতে থেকে যায়, দূর-দূর থেকে আত্মীয়-কুটুম্ব এসেছে তো!

সুহৃদদা বললে, "ইনাখুম্‌বা, তুমি থাকো না। আমি জিপ চালিয়ে চলে যাব। তুমি কাল সকালে একটা বাস ধরে চলে এসো।"

একটু না-না করে ইনাখুম্‌বা রাজি হয়ে গেল।

বিকেলে চায়ের সময় ওর মা কয়েকটা কাপ, আর প্লেটে কিছু বিস্কুট নিয়ে এলেন। ভেবেছিলাম চা। দেখি দুধ এনেছেন। এরা খুব দুধ খায়, আর অতিথি এলে দুধ দেয়। দুধ-বিস্কুট খেয়ে ওদের গ্রামটা ঘুরেফিরে দেখে সন্ধের মুখে সুহৃদদা আর আমি রওনা হয়ে পড়লাম।

পথে আবার ময়রাং পার হয়ে গেলাম। সকালে মণীন্দ্র সিংয়ের বলা যুদ্ধের গল্পগুলো মনে পড়ছিল। এখানকার গ্রামের লোকেরা খুব যুদ্ধ দেখেছে। প্রথমে ইংরেজরা রিট্রিট করে গেল, যাবার সময় ধানের গোলা জ্বালিয়ে দিয়ে গেল, যাতে অপর পক্ষ এসে খাবারদাবার না পায়। তারপর আজাদ হিন্দ ফৌজ এসে ঘাঁটি গেড়ে বসল। তিনমাস এইসব এলাকা স্বাধীন ছিল। তারপর নামল বর্ষা। সে কী বর্ষা! খাবারদাবারের অভাবে খুব কষ্ট পেয়েছিল আজাদি সৈন্যেরা। ইংরেজরা আবার ফিরে দখল করে নিল এইসব গ্রাম।

জিপের মধ্যে বসে বেশ তন্দ্রা এসে গিয়েছিল আমার। তার ওপর যা খাওয়াদাওয়া হয়েছে দুপুরে! হঠাৎ একটা ঝাঁকুনিতে চমকে সোজা হয়ে বসলাম। সুহৃদদা বলে উঠল, "এই সেরেছে।" চোখ মেলে দেখি কখন অন্ধকার নেমে এসেছে। আকাশে চাঁদ আছে বটে, কিন্তু তার ঘোলাটে আলোতে সবকিছু আরও অস্পষ্ট দেখাচ্ছে। রাস্তার পাশে জিপটা দাঁড় করিয়ে বনেট খুলে সুহৃদদা কী-সব দেখতেটেখতে লাগল। এটা-ওটা করে বারকতক স্টার্ট করবারও চেষ্টা করলে। কিন্তু জিপ একেবারে নট নড়ন-চড়ন।

সুহৃদদা বললে, "কী করি বল তো বুম্বিটো! মুশকিলে পড়লাম। খানিকদূর এগিয়ে গেলে বিষেনপুর গ্রাম পাব, চেনাশুনো লোক আছে। লোকজন ডেকে গাড়িটা ঠেলে নিয়ে বিষেনপুরে রাত কাটানো যায়। তবে মোটর মেকানিক পেতে হলে আরও একটু এগিয়ে নামবোলবাজার যেতে হবে।"

ঘড়িতে দেখলাম রাত ন'টা। রাত বেশি নয়, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন নিশুতি রাত। সুহৃদদা বললে, "তোর কি ভয় করবে? নয়তো জিপে একলা খানিকক্ষণ বসতে পারবি? আমি একটু এগিয়ে দেখি কিছু সাহায্য পাওয়া যায় কি না। অফিসের জিপ, জিনিসপত্রও রয়েছে, ফেলে যাওয়া ঠিক হবে না।"

আমি একটু শুকনো হেসে বললাম, "না না, ভয় করবে কেন!"

মনে-মনে ভাবলাম, কী জানি, খবর কাগজে তো এদিকে সব বৈরী মিজো, নাগাদের অতর্কিত আক্রমণের গল্প পড়ি, সেরকম কিছু না হলেই বাঁচি। তবে ভয় পেলে চলবে না, কিছু একটা তো করতেই হবে। তা ছাড়া সুহৃদদা যদি এই অন্ধকারে একলা অতটা পথ যেতে ভয় না পায়, আমিই বা কেমন করে কিছু বলি।

পিছনের ব্যাগ থেকে একটা কম্বল বার করে দিয়ে সুহৃদদা বললে, "ভাল করে জড়িয়ে বোস, শীত করবে। আমি খুব পা চালিয়ে যাব আর আসব।"

সুহৃদদা চলে গেল, তারপরেই সময় যেন থেমে গেল একেবারে। চারিদিকে গাছপালা, বাঁশঝাড় সবই যেন স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। সত্যি করে হয়তো খুব দেরি হয়নি, কিন্তু আমার মনে হতে লাগল, যেন অনন্তকাল ধরে আমি এই পথের পাশে বিকল হয়ে যাওয়া জিপে বসে আছি। চারিদিকে চেয়ে একটা জীবন্ত প্রাণীর জন্য আমার মনটা ছটফট করে উঠল। আর বেশিক্ষণ এভাবে থাকলে আমার দম বন্ধ হয়ে যাবে।

আমি জিপ থেকে নেমে পড়লাম। ডান দিকে একটু দূরে একটা আলো চোখে পড়ল, জিপটা ছেড়ে যাওয়া হয়তো

উচিত নয়, কিন্তু আমার মনে হল খুব তো দূরে নয়। একটু লোকজনের সাড়া না পেলে আমি মরেই যাব।

ডান দিকে পায়ে চলা পথ, একটু দূরে গিয়ে ধানখেতে শেষ হয়েছে। আমি আলো লক্ষ করে আল ধরে হাঁটতে লাগলাম। ধান-খেতের শেষে একটা কলাগাছের ঝাড়। হঠাৎ আলোটা আড়াল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কলাগাছের ঝাড়টা পার হতেই দেখতে পেলাম একটা ছোট চালাঘর। দরজা বন্ধ, একপাশে বেশ উঁচুতে একটা জানালা। সেটা দিয়েই দেখা যাচ্ছে ভিতরে আলো জ্বলছে। আমি দরজায় গিয়ে ঘা দিলাম, "কোই হ্যায় ?"

হিন্দি বুঝবে তো ? মণিপুরীদের অক্ষর হল বাংলা, কিন্তু ভাষাটা একদম অন্য। সুহৃদদা বলছিল, বর্মি ভাষার কাছাকাছি। হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে লোকজন। আরও জোরে দরজায় ধাক্কা দিলাম, "কোই হ্যায় ?"

ভিতর থেকে এবার প্রশ্ন এল ইংরেজিতে, "হু'জ দেয়ার ?"

পুরুষের গলা, বেশ মার্জিত কণ্ঠস্বর। যাক্, অনেকক্ষণ পরে যেন সভ্য জগতে ফিরে এলাম। বললাম, "প্লিজ ওপেন দ্য ডোর।"

বেশ সুন্দর উচ্চারণে ভিতর থেকে গৃহকর্তা বললেন, "কাম্ ইন, দ্য ডোর ইজ ওপেন।"

এতক্ষণ ধাক্কালাম, দরজা খোলা আছে তা তো বুঝিনি। এবার ঠেলা দিতেই দরজা খুলে গেল। ছোট, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একখানা ঘর। সামনের দেওয়ালে ঝুলছে একটা রাইফেল, তার নীচে তক্তপোশে একটা বিছানা গোটানো। প্রথমে গৃহকর্তাকে দেখতেই পাইনি। যেদিকে জানালা, সেদিকে একটা টেবিলে লণ্ঠন জ্বলছে, পিছন ফিরে বসে একজন সেই আলোতে কিছু লিখছে। চেয়ারটা আমার দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে সে এবার জিজ্ঞেস করল, "হোয়াট'স দ্য ম্যাটার, কী হয়েছে ?"

আমি তো একটুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। আমার সামনে চেয়ারে বসে আছেন একজন আর্মি অফিসার, পুরো ইউনিফর্ম পরা। কাঁধে, পকেটে কীসব রেজিমেন্টাল ব্যাজ-ট্যাজও লাগানো। আমি আশ্চর্য হলাম সেজন্য নয়। আমাদের সীমান্তে নানারকম পেট্রোল করার ব্যবস্থা আছে, ছোটখাটো সামরিক ঘাঁটি থাকাও বিচিত্র কিছু নয়। কিন্তু এই অফিসারটির রঙ চমৎকার ফর্সা, আর চোখ দুটি সুন্দর নীল, একেবারে ইউরোপিয়ান চেহারা, বয়সেও বেশ তরুণ। ভাবলাম, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান অফিসার হবেন হয়তো।

আমি তাঁকে আমাদের জিপ বিকল হবার কাহিনী সবিস্তারে ইংরেজিতে গড়গড় করে বলে গেলাম। তিনি আমাকে তক্তপোশে বসতে বলে বললেন, "স্যরি, তোমাকে তো কিছু অফার করতে পারব না। নো টি, নাথিং।"

আমি বললাম, "না, না, তার কোনও দরকার নেই। আমি কি আপনাকে ডিসটার্ব করলাম ? আপনি কী লিখছিলেন ?"

তিনি বললেন, "আমি আমার মাদারকে চিঠি লিখছিলাম, অনেক দূরে আছি, মা খুব চিন্তা করেন।" তিনি বেশ উদাসভাবে বলতে লাগলেন, "এইসব যুদ্ধবিগ্রহ ব্যাপারটা বড়ই খারাপ, বুঝেছ ? কত ফ্যামিলি ছন্নছাড়া হয়ে যায়। মানুষ শান্তিতে থাকতে চায়, স্বস্তিতে থাকতে চায়। এই তো আমি

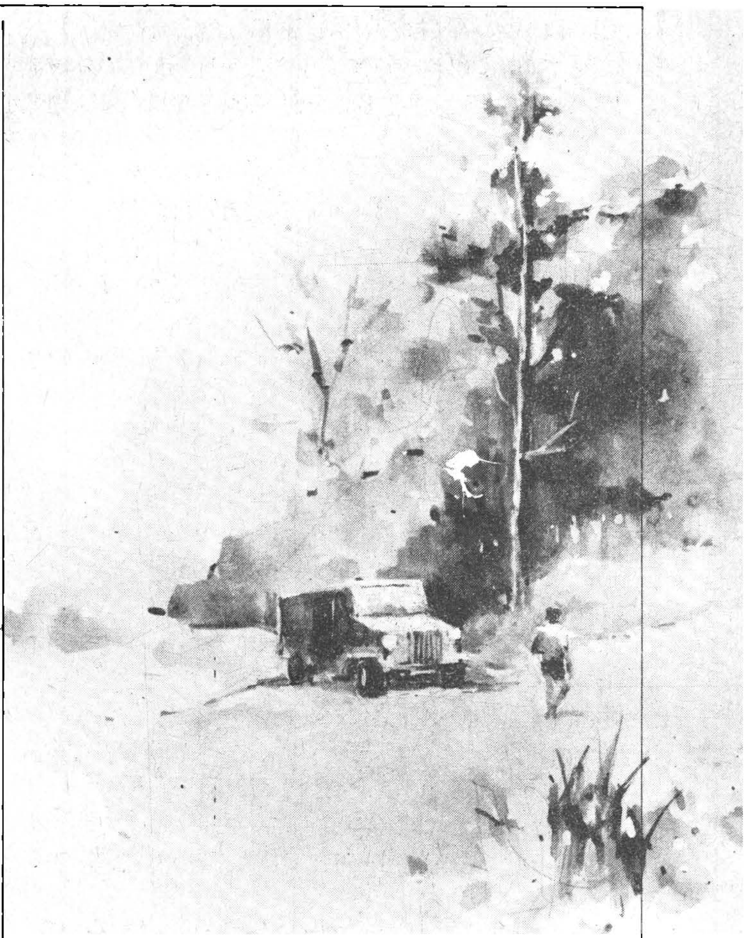

কলেজের পড়া শেষ না করেই আর্মিতে জয়েন করলাম। আমার মা একদম চাননি।"

আমি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, "তা কাউকে কাউকে তো কর্তব্য করতেই হবে। সীমান্ত পাহারা দেওয়াটা তো খুব জরুরি কাজ।"

তিনি অন্যমনস্ক ভাবে বললেন, "সীমান্ত পাহারা ? সে তো বটেই। তবে কী জানো, যুদ্ধে কেউ কখনও জেতে না, সকল পক্ষই হেরে যায়। মৃত্যু যখন আসে, তখন কে বা ভিক্টর, আর কে বা ভিক্টিম্ !"

আমি বললাম, "সৈনিক না হয়ে তোমার তো দার্শনিক হওয়া উচিত ছিল।"

তিনি বললেন, "আমি তো ইউনিভার্সিটিতে দর্শনেরই ছাত্র ছিলাম। পড়াটা আর শেষ হল না।"

"কোন্ ইউনিভার্সিটিতে পড়ছিলেন আপনি ?" আমি জিগ্যেস করলাম।

তিনি বললেন, "অক্সফোর্ড।"

আমি বেজায় চমকে গেলাম। নিশ্চয় খুব ভাল অ্যাকাডেমিক কেরিয়ার ছিল, তাই ফেলে আর্মিতে এলেন ? একটু বোকার মতো আমি প্রশ্ন করলাম, "মানে, আপনি ইণ্ডিয়ান আর্মিতে আছেন তো ?"

তিনি বললেন, "অফকোর্স, আমি ইণ্ডিয়ান আর্মিতে আছি।" কী একটা রেজিমেন্টের নামও বললেন, ধরতে পারলাম না।

কথা পালটাবার জন্য আমি বললাম, "জানেন আমার এক দাদা কেমব্রিজে পড়ছে, সেও খুব পড়াশুনোয় ব্রিলিয়ান্ট। সে কিন্তু পড়া ফেলে আপনার মতো করত না।"

তিনি আবার অন্যমনস্ক উদাস হয়ে গিয়ে বললেন, "কিন্তু যখন কান্ট্রি ইজ ইন্ ডেঞ্জার, দেশ যখন বিপদে, তখন নিজের কথা ভাবা যায় না, সবকিছু তুচ্ছ মনে হয়।"

হঠাৎ তিনি উৎসুকভাবে আমার দিকে চেয়ে বললেন, "আমার একটা কাজ করবে, প্লিজ ? এখানে এই জঙ্গল থেকে মা'কে চিঠি লিখি, কতদিন লেগে যায় পৌঁছতে, মায়ের হাতে পৌঁছয় কি না তা-ই বা কে জানে ! তুমি ফিরে গিয়ে তোমার দাদাকে লিখে দেবে আমার মা'কে যেন একটা খবর দেয়। আমার নাম রিচার্ড, রিচার্ড মার্টিন টেলর। আমার মা'র নাম মার্গারেট, মিসেস মার্গারেট টেলর।"

আমি কেমন বিহ্বল বোধ করতে লাগলাম। এই সাহেব পাগল নন তো ? নাকি মাতাল ? এঁর বাড়ি কোথায় ? আমার দাদা কাকে খবর দেবে ? এঁর মা কি বিলেতে থাকেন ? ইনি তা হলে আমাদের আর্মিতে কী করছেন ?

আমার সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে মনে হল। তারই মধ্যে আমি শুনতে পেলাম, আমি বলছি, "আপনি কি কোনও মেসেজ্ দিতে চান আপনার মা'কে ?"

তিনি বললেন, "হ্যাঁ, বলবে রিচার্ড লাভ্স্ ইউ ভেরি মাচ্, হি হ্যাজ নট ফরগট্ন ইউ, তোমার ছেলে তোমাকে খুব ভালবাসে, সে তোমাকে ভোলেনি। মনে থাকবে তো ? রিচার্ড, রিচার্ড লাভস্ ইউ···রিচার্ড লাভস ইউ, রিচার্ড···।"

বহুদূর থেকে যেন লোকজনের আওয়াজ ভেসে আসছে। সুহৃদদা আমাকে ঠেলা দিচ্ছে, "নে, ওঠ্, ওঠ্ । সামান্য একটা তার ঢিলে হয়ে গিয়েছিল, তার জন্য কী দুর্ভোগ। তুই তো খুব ঘুম দিয়েছিস্।"

চোখ মেলে দেখি সুহৃদদার সঙ্গে আর-একটি লোক যন্ত্রপাতি হাতে দাঁড়িয়ে আছে। "এ আমার বন্ধু তম্বি সিং," সুহৃদদা পরিচয় করিয়ে দিলে, "বুঝলি, হেঁটে যেতে হল নামবোলবাজার, সেখান থেকে তম্বিকে ধরে আনলাম। পাশের ছোট গ্রামটা হল নিঙথুকঙ, সেখানে কাউকে পেলাম না।"

জিপটা স্টার্ট দিচ্ছে, আমি ডান দিকে দেখিয়ে বললাম, "ওদিকে একটা ঘরে আলো জ্বলছিল। ডান দিকে সরু পথ, ধান-খেত, কলার ঝাড়, সবই আছে, কিন্তু আলোটা কই ?"

সুহৃদদা বললে, "কী বিড়বিড় করছিস ? তোর দেখি ঘুম ভাঙেনি ভাল করে। চল্, বাকি রাতটুকু নিঙথুকঙে কাটিয়ে সকালে রওনা দেব। তম্বির শ্বশুরবাড়ি এই গ্রামে।"

তম্বির শ্বশুর যোগেন্দ্র সিং খুব বুড়ো মানুষ। আমাদের জন্য সেই শেষরাত্রে চা বানালেন। চা খেতে-খেতে আমি সুহৃদদাকে বলেই ফেললাম, "একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছিলাম, জানো। কিন্তু এমন সত্যি মনে হচ্ছিল !"

সুহৃদদা হালকাভাবে বললে, "এ হল মণিপুরী অতিভোজনের ফল।"

কিন্তু যোগেন্দ্র সিং আমার স্বপ্নের কাহিনীটা শুনে তাঁর সরু চোখ আরও সরু করে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর নিজেদের ভাষায় কী সব বলাবলি করলেন তম্বির সঙ্গে। যোগেন্দ্র বললেন, "কাল একবার জায়গাটা আমাকে দেখিও তো।"

পরদিন সকালে ইনাখুম্বা এসে হাজির। সে বাসে যেতে-যেতে পথের পাশে আমাদের জিপ দেখে নেমে পড়েছে।

সকালের আলোয় আমার সেই পায়ে-চলা পথ, ধানখেত, কলাঝাড় সবই খুব সুন্দর ও স্বাভাবিক মনে হল। যোগেন্দ্র সিং আল ধরে আমাদের নিয়ে হেঁটে চললেন। কিন্তু কলাঝাড়ের ওপাশে সেই চালাঘর নেই। একটা ভিত আছে, হয়তো কোনও কালে কিছু ছিল।

যোগেন্দ্র, তম্বি সিং, ইনাখুমবা সকলে মিলে উত্তেজিত হয়ে কী-সব বলাবলি করছিলেন মণিপুরী ভাষায়। সামনের রবিবার ওঁরা এখানে ভাল করে নাকি পুজো দেবেন। পুজো ? কেন !

যোগেন্দ্র বললেন, "তোমরা তো জানো না, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই এলাকাতে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছিল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আর্মি আর আজাদ হিন্দ ফৌজে। কত লোক যে মারা গিয়েছিল, তার কোনও হিসেব নেই। আমাদের এই নিঙথুকঙ গ্রামে যুদ্ধের পর বেজায় ভূতের উপদ্রব হয়েছিল। তা আমরা ভাল করে পুজো দিলাম, তাতে শান্তি ফিরে এসেছিল। কিছুকাল আগে এই রাস্তাটা চওড়া করার সময় মাটি খুঁড়তে আবার অনেক হাড়গোড় বার হয়েছে। তখনই বলেছিলাম, পুজো দেওয়া বিশেষ দরকার।"

সুহৃদদা বললেন, "যত্ত সব আজগুবি গল্প !"

ইনাখুম্বা বলে উঠল, "না, বাবু, সাহেবদের মিলিটারি বইতে নিঙথুকঙ গ্রামের কথা আছে।"

সুহৃদদা আমার দিকে কটমট করে চেয়ে বললে, "ফের যদি আজগুবি স্বপ্ন-টপ্ন দেখবি তো নেকস্ট্ ফ্লাইটে কলকাতা পাঠিয়ে দেব। মাসিমা আমাকে বলবে কী !"

আমি চুপ করে রইলাম।

ইম্ফলে পৌঁছে গোবিন্দমন্দির দেখা হল। বিকেলে ইনাখুম্বা আমাকে নিয়ে গেল কমনওয়েলথ্ গোরস্থান দেখাতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহতদের গোরস্থান কমনওয়েলথ অ্যাসোসিয়েশন কী যে সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছে। সবুজ ঘাসে ঢাকা মাঠে সারি-সারি তামার পাতে মৃত সৈনিকদের নাম লেখা ফলক, সুন্দর ফুল ফুটে আছে সে-সব ঘিরে। কোনও কোনও তাম্রফলকে লেখা আন্‌নোন্ সোলজার—অজানা সৈনিক। বেশির ভাগেই অবশ্য নামধাম লেখা। ছবি নেবার জন্য ক্যামেরা ফোকাস করলাম একটি তাম্রফলকে, তার একপাশে লাল গোলাপের ঝাড়, অন্যদিকে সাদা গোলাপ, কালারে যা আসবে না !

হঠাৎই ক্যামেরার লেন্স-এ চোখ রেখে আমি যেন পাথর হয়ে গেলাম। ধীরে-ধীরে চোখ থেকে ক্যামেরা সরালাম। না, আমি ভুল দেখিনি, তামার ফলকে স্পষ্ট খোদাই করা আছে—মাই বিলাভেড্ সান্ রিচার্ড মার্টিন টেলর, জন্ম ৭ নভেম্বর ১৯২০, মৃত্যু ১৯ মার্চ ১৯৪৪। তারপর ইংরেজি কবিতার একটি লাইন **Farewell. Thou art too dear for** my possessing. নীচে লেখা : বিরিভ্ড মাদার—শোকসন্তপ্ত মা' মার্গারেট জেনিফার টেলর !

ছবি কৃষ্ণেন্দু চাকী

যোগাসনের উদ্দেশ্য

স্বাস্থ্যচর্চার অন্যান্য যত প্রকার পদ্ধতি আছে, যোগাসন পদ্ধতি তাদের সকলের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। কারণ এই পদ্ধতি কেবল শরীরের যন্ত্রাদি, পেশী অথবা শারীরিক গতিবিধির ওপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে শিক্ষা দেয় না, যে জাগ্রত শক্তি শরীরের মাংসপেশী সমেত প্রতি তন্ত্রীতে-তন্ত্রীতে তেজ ও জীবনীশক্তি নিয়ে সুনিহিত রয়েছে, তাকে উজ্জীবিত করে তোলে। এই জন্য যোগাসন-অভ্যাসকারী মাত্রেই উপলব্ধি করতে পারেন যে, যোগাসনে দেহের শক্তির সঙ্গে-সঙ্গে মনের দৃঢ়তাও সংযুক্ত।

ভারতীয় যোগীরা তাঁদের শরীর ও মনকে দৃঢ়ভাবে গঠিত করবার জন্য স্বাস্থ্যচর্চার এই কৌশলগুলি অভ্যাস করতেন। ইচ্ছাশক্তি দ্বারা দেহ গঠিত হয়, আবার সেইসঙ্গে এই যোগব্যায়াম চর্চায় ইচ্ছাশক্তি সুদৃঢ় হয়, এইভাবে শরীর ও মন একে-অপরের সহায়তায় সুগঠিত হয়ে ওঠে।

যোগব্যায়াম শরীরের সকল ক্ষয়প্রাপ্ত মাংসপেশী ও তন্ত্রীকে কোনও বিশেষ শক্তি প্রয়োগ না করে, স্বাভাবিক এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শক্তিশালী করে তোলে। কীভাবে শরীরের শিথিল মাংসপেশী ও অপরাপর তন্ত্রীগুলিকে পুনরুজ্জীবিত এবং শক্তিশালী করে নবজীবন লাভ করা যায়, এ-পদ্ধতি সেই শিক্ষাই দেয়। এর প্রকৃত ব্যবহারে ক্ষয়গ্রস্ত হাড় ও দেহের অপরিপুষ্ট তন্ত্রীগুলি সুগঠিত হয়ে ওঠে। তা ছাড়া, এই পদ্ধতি হৃদ্‌যন্ত্র, ফুসফুস, পাকস্থলী ও অন্ত্রসমূহ, শিরা-উপশিরা, রসধারণকারী গ্ল্যাণ্ডসমূহ, মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডস্থিত স্নায়ুকেন্দ্র প্রভৃতি মানবদেহের অনায়ত্ত ও অনিচ্ছাধীন যন্ত্রাদিকে অতিরিক্ত পরিশ্রান্ত না করে (যা অন্যান্য বলপ্রয়োগ-সমন্বিত ব্যায়ামে সচরাচর হয়ে থাকে), তাদের কার্যের উন্নতিসাধন করে। শরীরের যে-সমস্ত অভ্যন্তরীণ ক্রিয়া-পদ্ধতি আমাদের ইচ্ছাধীন নয়, যোগব্যায়াম সেগুলিরও সজ্ঞান সামঞ্জস্য ও সুব্যবস্থার বিধান করে, যেটি সাধারণত বর্তমান শরীর-গঠন পদ্ধতিতে উপেক্ষিত হয়ে থাকে।

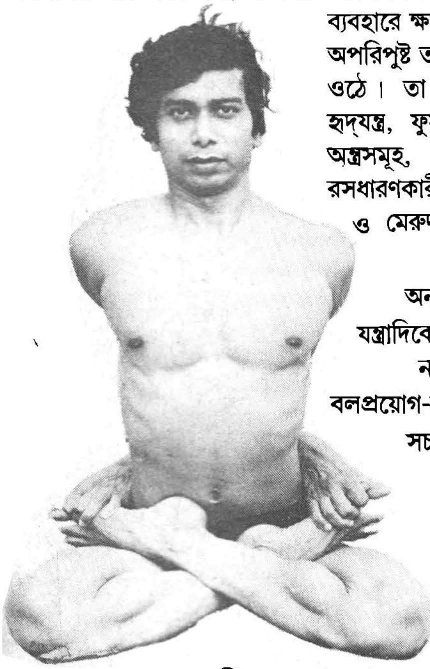

স্বাস্থ্য মানে বহু বর্ষ ধরে কায়ক্লেশে বেঁচে থাকা বা কোনও প্রকারে জীবনটাকে শরীরের মধ্যে ধরে রাখা নয়। কিছুকাল ডাক্তারের সাহায্য না নিয়ে হাসপাতাল থেকে দূরে থাকলেই স্বাস্থ্যলাভ করা হল না। শরীরে রোগ-প্রতিষেধক শক্তি উৎপাদন করা, শ্রম ও কষ্ট সহ্য করার মতো শরীরকে সুদৃঢ় করা, অফুরন্ত মানসিক শক্তি সঞ্জননে আনন্দ উপভোগ করাই যোগাসনের প্রধান উদ্দেশ্য।

বিশ্বনাথ ঘোষ, প্রেমসুন্দর দাস

সর্দি গরমি এড়াতে হলে

এই সময়ে দুরন্ত গরম, আর দুরন্ত গরমে দুরন্তপনা করলে দুরন্ত নানা রোগ দেখা দেয়। সেইজন্যে এই সময়ে একটু শান্তশিষ্ট হয়ে থাকতে হয়।

প্রথমেই যে দুরন্ত রোগের কথা মনে পড়ে, তার নাম সর্দিগরমি বা হিট -ফিভার। রোদে বেশি ঘুরলে সারা গায়ে আর মাথায় রোদের তাত লাগে। আমাদের শরীরের মধ্যে যে হিট কন্ট্রোলিং সেন্টার আছে, মানে মস্তিষ্কের যে কেন্দ্র থেকে আমাদের শরীরের স্বাভাবিক উত্তাপ রক্ষিত হয়, গরমের তাড়সে সেই কেন্দ্র খুব গরম হয়ে যায়। এত গরম হয়ে যায় যে, শরীরের স্বাভাবিক উষ্ণতা আর বজায় থাকে না, একশো চার পাঁচ ডিগ্রি ফারেনহাইট হয়ে যায়। চোখ দুটো লাল হয়ে যায়, ঘনঘন বমি হয়। অনেক সময়ে লোকে জ্ঞান হারায়। এমনকী, মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

তা হলেই বুঝতে পারছ, কী দুরন্ত রকমের রোগ এই সর্দিগরমি। যাতে এই রোগ না হয়, সেদিকে অতি অবশ্য খেয়াল রাখতে হবে, তা না হলে যে কোনওদিন অঘটন ঘটে যেতে পারে।

এই রোগ এড়ানোর সবচেয়ে ভাল উপায় হল রোদ না লাগানো। কিন্তু ইস্কুলে কলেজে যেতে হলে তো মাথায় রোদ লাগবেই। রোদ এড়াবার সবচেয়ে ভাল উপায় হল ছাতা ব্যবহার করা। ছাতা ছাড়া কখনও রোদ্দুরে বেরোবে না। ছাতা মাথায় দিলে সূর্যের তাপ ছাতার কাপড়ের ওপর পড়ে, ফলে মাথায় সরাসরি রোদ লাগে না। কালো ছাতা হলে আরও ভাল, কারণ কালো ছাতা সূর্যের সব রশ্মিগুলোকেই ধরে নেয়, ফলে মাথায় আর সূর্যের রশ্মি লাগে না। ছাতা বর্ষাকালে যত দরকারি গরমকালে তার চেয়ে অনেক বেশি দরকারি। টুপি পরে লাভ নেই, কারণ টুপি গরম হয়ে যাবার পরেই মাথা তেতে গরম হয়ে উঠবে। টুপি যদি পরতেই ইচ্ছে হয় তা হলে শোলার হ্যাট পরলে মাথায় রোদের তাত কম হবে। শোলার ভেতর দিয়ে গরম ততখানি ভেদ করতে পারে না, কারণ শোলা হল যাকে ইংরিজিতে বলা হয় নন-কণ্ডাক্টর। আগেকার কালের সাহেবরা রোদে কাজ করার সময় সেইজন্যেই শোলার হ্যাট মাথায় দিয়ে কাজ করতেন।

রোদ থেকে এসে কখনও ঠাণ্ডা জল ঢকঢকিয়ে খাবে না। শরীরের বাইরেটা তখন ভীষণ গরম, সেইসময় যদি বরফ-ঠাণ্ডা জল চোঁচোঁ করে খাও, তা হলে শরীরের ভেতরটা হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়ে যায়। গরমে কোষগুলি স্ফীত হয়, আর ঠাণ্ডায় হয় সংকুচিত। ঠাণ্ডা গরমে কোষগুলো বারবার সংকুচিত আর স্ফীত হয়। ফলে কোষ থেকে একরকমের রস বেরোয়, যার নাম হিস্টামিন। হিস্টামিনের তাড়সে আমাদের সর্দি-জ্বর হয়, সেইজন্যে রোদ থেকে এসে ছায়ায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে, ধীরেসুস্থে ঠাণ্ডা জল খাবে।

(ডাঃ) বিশ্বনাথ রায়

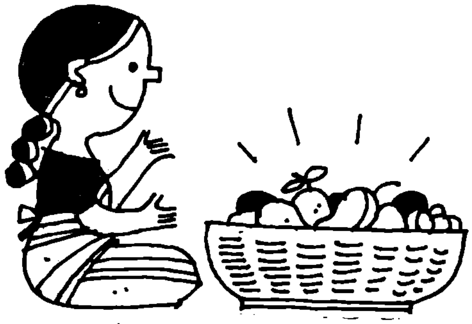

আম থেকেই আমরা পৌঁছে গেলাম ধাঁধায়। সেজোদাদু আমের ভক্ত, মানে একটু বেশি রকমের ভক্ত আর কি, নইলে আম খেতে আর কার না ভাল লাগে! তা, সেজোদাদু আম খেতে-খেতে বললেন, "আমগাছের আরেক নাম যে রসাল, তা কি আর এমনি-এমনি? রস বেশি বলেই আমের এই নাম।"

কথাটা শুনে ছোট্‌কা একটু ঠোঁট টিপে হাসল। তারপর মজার মুখ করে বলল, "তাই আমজনতার আম এত পছন্দ।"

ছোট্‌কার কথায় সবাই একেবারে হেসে আকুল। ছোড়দি বলল, "তোমার কথাটা শিবরাম চক্রবর্তীর কথা নয় তো ছোট্‌কা?"

"হতে পারে। শিবরামের মধ্যেও তো আম রয়েছে, তাই না?" ছোট্‌কা সঙ্গে-সঙ্গে জবাব দিল।

আবার হাসির হুল্লোড় উঠল।

সেই রাত্রেই ছোট্‌কা শোনাল আম নিয়ে নতুন একটা ধাঁধা।

প্রথম ধাঁধা ॥ একটি মেয়ে অল্প কয়েকটি আম নিয়ে বাজারে এসেছে। প্রথম খদ্দেরকে সে বিক্রি করল মোট আমের অর্ধেক ও আরও আধখানা।

দ্বিতীয় খদ্দেরকে বিক্রি করল অবশিষ্ট আমের অর্ধেক ও আরও আধখানা।

তৃতীয় খদ্দেরকেও একইভাবে বাকি আমের অর্ধেক ও আরও আধখানা বিক্রি করল। তার আম তখনই শেষ হয়ে গেল।

শুনতে আধখানা হলে হবে কী, সে কিন্তু মোটেই ছুরি দিয়ে আম দু'ভাগ করেনি। মানে, করবার দরকারই হয়নি।

বলো তো, ক'টা আম নিয়ে বাজারে এসেছিল মেয়েটি?

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ নীচের শব্দটার মধ্যে একটা ছদ্মনাম লুকনো আছে। সেটা বার করো, কার ছদ্মনাম—তাও বলো,

মার্তণ্ডকেশরী

তৃতীয় ধাঁধা ॥ জট ছাড়াও—

হিলোনীতল

গতবারের উত্তর ॥ (১) ২৯ টাকা। (২) প্রসূন। অন্যগুলি পদ্মের প্রতিশব্দ। (৩) নেকনজর।

সত্যসন্ধ

"ফুটবল স্টেডিয়ামের ভেতরটা এত ঠাণ্ডা কেন বলো তো?"

"প্রত্যেকটা সিটেই যে 'ফ্যান'।"

"এক বছর আগে এই চাকরির জন্য আপনি ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন না?"

"হ্যাঁ, স্যার।"

"তখন আপনাকে বলিনি যে, আমাদের বয়স্ক লোকের দরকার?"

"এক বছরেও আমার বয়স বাড়েনি বলতে চান?"

"তোমার কাছে আমার দাম কত মা?"

"কোটি কোটি টাকা বাবা।"

"তা হলে ওর থেকে আমাকে দুটো টাকা ধার দেবে? আইসক্রিম খাব।"

পোষা তোতাপাখিটিকে দেখিয়ে অজয়বাবু বন্ধুকে বললেন, "বাঁ পায়ের শিকল ধরে টানলে পাখি আবৃত্তি করে শোনাবে, ডান পায়েরটা টানলে গাইবে জাতীয় সঙ্গীত।"

"যদি দুটো শিকল একসঙ্গে টানি?" অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন বন্ধু।

"আচ্ছা বেকুব তো! আমি পড়ে যাব না?" ঝটপট উত্তর দিল তোতাপাখি।

ছবি: দেবাশিস দেব

মজার খেলা

পাঁচ থেকে তিন বিয়োগ করলে যে দুই হয়, এ তো আমরা সবাই জানি। কিন্তু ধরো, যদি উলটো করে একটা অঙ্ক দেওয়া হয়! কীভাবে অঙ্কটা দেওয়া হবে ভাবছ?

খুব সোজা। দশটা পোড়া দেশলাইকাঠি নাও, আর কাঠি দশটাকে নীচের ছবির মতো সাজিয়ে ফেলো—

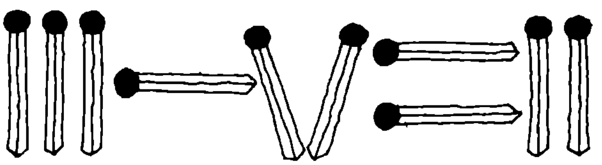

কী, এবার দেখছ তো, কীভাবে উলটো অঙ্ক দেওয়া হয়েছে?

হ্যাঁ, এই ভুল অঙ্কটাকেই একটা ঠিক অঙ্কের চেহারা দেব আমরা।

আর, সেই কাজটা করব, একটা মাত্র কাঠিকে এক জায়গা থেকে সরিয়ে অন্য জায়গায় ফের বসিয়ে দিয়ে।

তা হলে এবার কাজটা শুরু করো।

খুব কঠিন লাগছে বুঝি?

আসলে কিন্তু একেবারেই কঠিন নয়। শুধু একটু ভেবে-ভেবে বার করা, কোন্ কাঠিটা সরবে, আর ঠিক কোন্ জায়গায় বসবে।

তুমি ভাবতে থাকো। আমার হয়ে গেছে।

কী হয়েছে দেখবে? বেশ, দেখেই নাও—

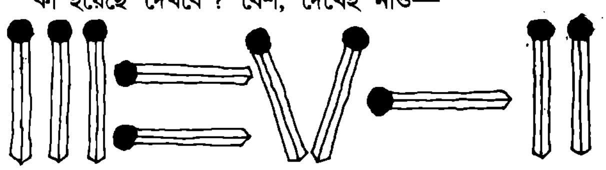

পাঁচ থেকে দুই বিয়োগ যাচ্ছে এবার। উত্তরও ঠিকঠিক মিলে যাচ্ছে। তাই না?

মজারু

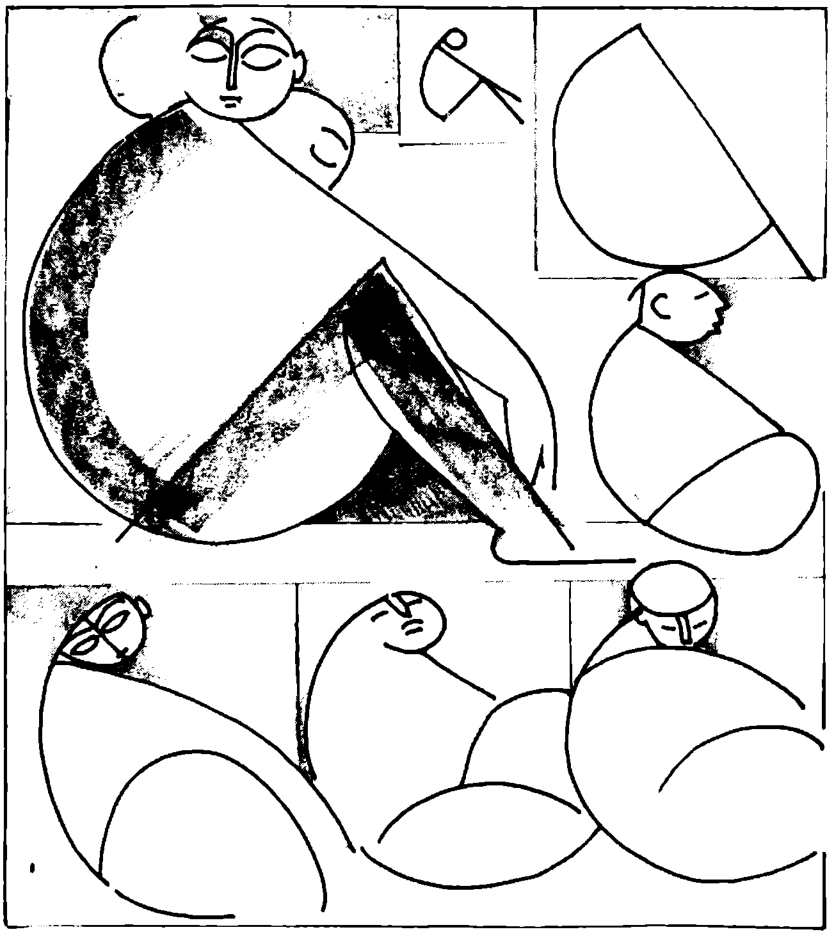

মানুষ আঁকার জন্য সব সময় নজর রাখতে হবে শিরদাঁড়ার ছন্দের ওপর। প্রত্যেকটি নমুনায় লক্ষ করে দেখো সেটি। এই ছন্দের সঙ্গে আরও একটা ব্যাপার সব সময় খেয়াল রাখবে। সেটা হল যা করতে যাচ্ছ, তার বিশেষ চরিত্র। চরিত্রের মজাটি ধরতে পারলে, আঁকার কলমও চলবে সহজ ভাবে।

একটি শিরদাঁড়ার বাঁককেই রেখে কতভাবেই ধরা যায় আকারকে। এই ছকের পরিবর্তনে তুমিও খুঁজে পাবে হাজারো ভঙ্গি। একবার শুরু করে দেখোই না। দেখবে, এক অজানা জগতের দরজা খুলে যাচ্ছে তোমার সামনে। এই যে তুমি ছবি আঁকা শিখতে বসেছ, এই শেখাটাই তখন হয়ে উঠবে আনন্দময়।

সামনের বারে দেখবে, আকারকে আরও কতভাবে ধরা যায়।

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

১		■	২	■	৩	৪
	■	৫			■	
৬	৭	■		■	৮	
■	৯					■
১০		■		■	১১	১২
	■	১৩			■	
১৪		■		■	১৫	

সংকেত : পাশাপাশি : (১) প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্র। (৩) রজ্জু। (৫) মধু পান করে যে। (৬) ঘোড়ার পাদুকা। (৮) সর্পমাতা। (৯) একলব্য নিজের আঙুল কেটে দ্রোণকে কী দিয়েছিলেন? (১০) গোপালের পরিচয়। (১১) বিরাট জলাশয়। (১৩) বৃষ্টি। (৪) পাহারাদার। (১৫) অসৎ নয়।

উপর-নীচ : (১) লাঞ্ছনার পরেই কোন্ শব্দ? (২) জনৈক মহাকবি। (৪) পঞ্চনদের একটি। (৭) কোন গুড় কেউ খেতে চায় না? (৮) জনৈক দার্শনিক মুনি। (১০) ভাণ্ডার। (১২) সবুজ

(সমাধান আগামী সংখ্যায়) রঞ্জন

(গত সংখ্যার সমাধান)

পা	ট	নী	■	পা	মি	র
গ	ম	■	ঘ	■	জ	জ
লা	ট	■	টো	■	রা	নী
■	ম	হো	ৎ	স	ব	■
বা	■	■	ক	■	■	জ
দ	■	পে	চ	ক	■	ম্বু
শা	য়ে	স্তা	■	শা	মু	ক

গোলিয়াথও যাঁদের কাছে নেহাত ছেলেমানুষ

ডেভিড আর গোলিয়াথের গল্প তোমরা শুনেছ। গোলিয়াথ ছিল দারুণ দীর্ঘ। শোনা যায়, তার দৈর্ঘ্য ছিল ন' ফুট সাড়ে ছ' ইঞ্চি। তবে একালের লোকেরা বলেন, অত দীর্ঘ সে ছিল না, আসলে তার দৈর্ঘ্য ছিল ছ' ফুট দশ ইঞ্চি। তা সেও কি কম হল?

গোলিয়াথের কথা থাক। যে-কথা বলতে চাই সেটা এই যে, দারুণ রকমের দীর্ঘ মানুষ একালেও মাঝে-মাঝে চোখে পড়ে। কিছুকাল আগে টেল আভিভের একজন লোকের খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল। লোকটির নাম এডি কারমেল। তিনি নাকি ন' ফুট দীর্ঘ। ইরান থেকেও এসেছিল এই রকমের একটি মানুষের খবর। শোনা গিয়েছিল, তাঁর দৈর্ঘ্য দশ ফুট ছ' ইঞ্চি। হাসপাতালে লোকটির মাপ নেওয়া হয়েছিল। তাতে দেখা গেল, লোকটি আসলে সাত ফুট আড়াই ইঞ্চি উঁচু।

এই রকমের আরও কয়েকজন মানুষের খবর দিচ্ছি। বাফেলো শহরের জন এফ ক্যারল ছিলেন আট ফুট সাড়ে সাত ইঞ্চি। টেনেসির জন উইলিয়াম রোগান ছিলেন আট ফুট ছ' ইঞ্চি। ডেন্টনের ডন কেহ্লার ছিলেন আট ফুট দু ইঞ্চি। আইওয়ার বার্নার্ড কয়েন ছিলেন আট ফুট দু' ইঞ্চি।

বুঝতেই পারছ, গোলিয়াথ সম্পর্কে একালের ধারণাটাই যদি সত্যি হয়, তা হলে গোলিয়াথও এঁদের কাছে এমন-কিছু দীর্ঘ মানুষ নয়।

নতুন চাকরি

সার আর্থার কোনান ডয়েল

আগে যা ঘটেছে : বার্মিংহাম যাওয়ার পথে ট্রেনে বসে হল্ পাইক্রফট তাঁর অভিজ্ঞতার কথা শোনাচ্ছিলেন। কক্সটন অ্যান্ড উডহাউস থেকে চাকরি যাওয়ার পর ভদ্রলোক নামজাদা স্টকব্রোকার কোম্পানি মসন অ্যান্ড উইলিয়ামস-এ চাকরি পান। চাকরির ব্যাপারটা পাকাপাকি হওয়ার দিন সন্ধেবেলা তাঁর ঘরে পিনার নামে এক অচেনা লোকের আবির্ভাব। তারপর...

একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন পাইক্রফ্‌ট। তারপর ফের শুরু করলেন তাঁর কথা। "ভদ্রলোকের কথা শুনে তো আমি অবাক। যে-চাকরি আমি পেয়েছি, ইনি তো তাকে কোনও গুরুত্বই দিচ্ছেন না,অথচ এই চাকরি জোগাড় করতে আমার কালঘাম ছুটে গিয়েছিল। তাই বললুম, 'মিঃ পিনার, অধিকাংশ লোক কিন্তু আমার চাকরি সম্পর্কে অমন কথা মনে করে না। নিজের কথা বলতে পারি, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এই যে চাকরিটি আমি জুটিয়েছি, এতেই আমি সত্যি-সত্যি খুব খুশি।' কিন্তু আমার কথা শুনে তিনি হো-হো করে হেসে উঠলেন। 'আরে ছোঃ ছোঃ। তোমাকে আরও ওপরে উঠতে হবে। এই চাকরি মোটেই তোমার উপযুক্ত নয়। আচ্ছা, আমার কথাটা তোমাকে খুলেই বলি। আমি তোমাকে যে প্রস্তাব দিচ্ছি তা মোটেই তোমার যোগ্যতার উপযুক্ত নয়। তবে মসন তোমাকে যা দিচ্ছে তার তুলনায় অবশ্য অনেক ভাল। ভাল কথা, তুমি কবে থেকে মসনের চাকরিতে যোগ দিচ্ছ?'

"'সোমবার।'

"'হা-হা, আমি বাজি ধরে বলতে পারি যে, সোমবার তুমি সেখানে কাজে যোগ দিতে যাচ্ছ না।'

"'মসনের ওখানে সোমবার যাচ্ছি না?'

"'না হে, না। ওইদিন তুমি ফ্রাঙ্কো মিডল্যাণ্ড হার্ডওয়ার কোম্পানির ম্যানেজার হিসেবে সবকিছু দেখাশোনা করবে। ব্রাসেলস আর সানরেমোর আপিস দুটো বাদ দিলে ফ্রান্সের বিভিন্ন জায়গায় আমাদের একশো চৌত্রিশটি শাখা আছে।'

"'ভদ্রলোকের কথা শুনে আমি তো থ। 'আমি তো এই আপিসের নাম শুনিনি,' আমি ভদ্রলোককে বললুম।

"'খুবই সম্ভব। ব্যাপারটা আমরা যথাসম্ভব গোপন রেখেছি। এর বেশির ভাগ টাকাটাই লগ্নি করেছেন কয়েকজন লোক, যাঁরা বাইরের লোককে অংশীদার করতে চান না। আমার ভাই হ্যারি পিনার এই কোম্পানির ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। এই কোম্পানিটাকে দাঁড় করানোর পেছনে তার হাত অনেকখানি। সে যখন জানতে পারলে যে আমি ইংল্যাণ্ডে আসছি, তখন আমাকে বলেছিল যে, চোখকান খোলা, কাজের অথচ কমবয়সী কোনও লোকের সন্ধান রাখতে। পারকার আমাকে তোমার কথা বলেছিল, সেই জন্যে আমি এখানে এসে হাজির হয়েছি। অবশ্য প্রথমে আমরা তোমাকে পাঁচশো পাউণ্ডের বেশি দিতে পারছি না—'

"'বছরে পাঁচশো পাউণ্ড?'

"'গোড়ায় তাই। তবে বিক্রির ওপর শতকরা এক ভাগ কমিশন তুমি পাবে। আর সেটাও তোমার মাইনের চেয়ে বেশি হবে তো কম হবে না।'

"'কিন্তু হার্ডওয়ার সম্বন্ধে আমার কোনও ধারণাই নেই।'

"'সেটা কোনও কথাই নয়। তুমি তো ব্যবসার কাজকর্ম জানো।'

"আমার তো মাথা ভোঁ-ভোঁ করতে লাগল। আমি চেয়ারে বসতে পারছিলুম না। হঠাৎ আমার মনে একটা সন্দেহ দানা বাঁধতে লাগল।

"আমি বললুম, 'দেখুন আপনাকে সত্যি কথা বলা উচিত। মসন আমাকে বছরে দুশো পাউণ্ড দেবে ঠিকই, তবে বাজারে ওদের নাম আছে। মুশকিল হচ্ছে যে, আপনাদের কোম্পানির সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না।'

"ভদ্রলোক খুব খুশি হয়ে বলে উঠলেন, 'বাঃ, বাঃ, বেশ চালাক ছোকরা তো তুমি। ঠিক তোমার মতো লোকই আমরা

খুঁজছি। তোমায় বেলায় শুধু কথায় চিঁড়ে ভেজানো যাবে না। ঠিকই তো! যদি তুমি আমাদের কোম্পানিতে যোগ দিতে চাও, তবে এই যে একশো পাউণ্ডের নোটটা দেখছ এটা তোমার জামার পকেটে রেখে দাও। এটা তোমাকে মাইনের থেকে আগাম দেওয়া হল।'

"'ধন্যবাদ। আমাকে কবে কাজে যোগ দিতে হবে?'

"'কাল একটা নাগাদ অবশ্যই বার্মিংহাম চলে এসো। আমি তোমাকে একটা চিঠি দিয়ে দিচ্ছি, সেটা আমার ভাইকে দেখাবে। ১২৬বি, করপোরেশন স্ট্রিটে আমরা একটা কাজ চালাবার জন্যে আপিস ভাড়া নিয়েছি। তোমার চাকরির পাকাপাকি ব্যবস্থা অবশ্য আমার ভাইই করবে। তবে চিন্তা কোরো না, সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে।'

"'সত্যি মিঃ পিনার, কী বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাব তা ভাবতে পারছি না,' আমি বললুম।

"'কিছু বলবার দরকার নেই। তুমি তোমার যোগ্যতায় এই চাকরি পেয়েছ। তবে একটা ব্যাপার পরিষ্কার করে নিতে হবে। একটা সাদা কাগজে এই ক'টি কথা তোমাকে লিখতে হবে: আমি নিজের ইচ্ছেয় পাঁচশো পাউণ্ড মাইনেতে ফ্রাঙ্কো মিডল্যাণ্ড হার্ডওয়ার কোম্পানির ম্যানেজারের চাকরিতে যোগ দিচ্ছি।'

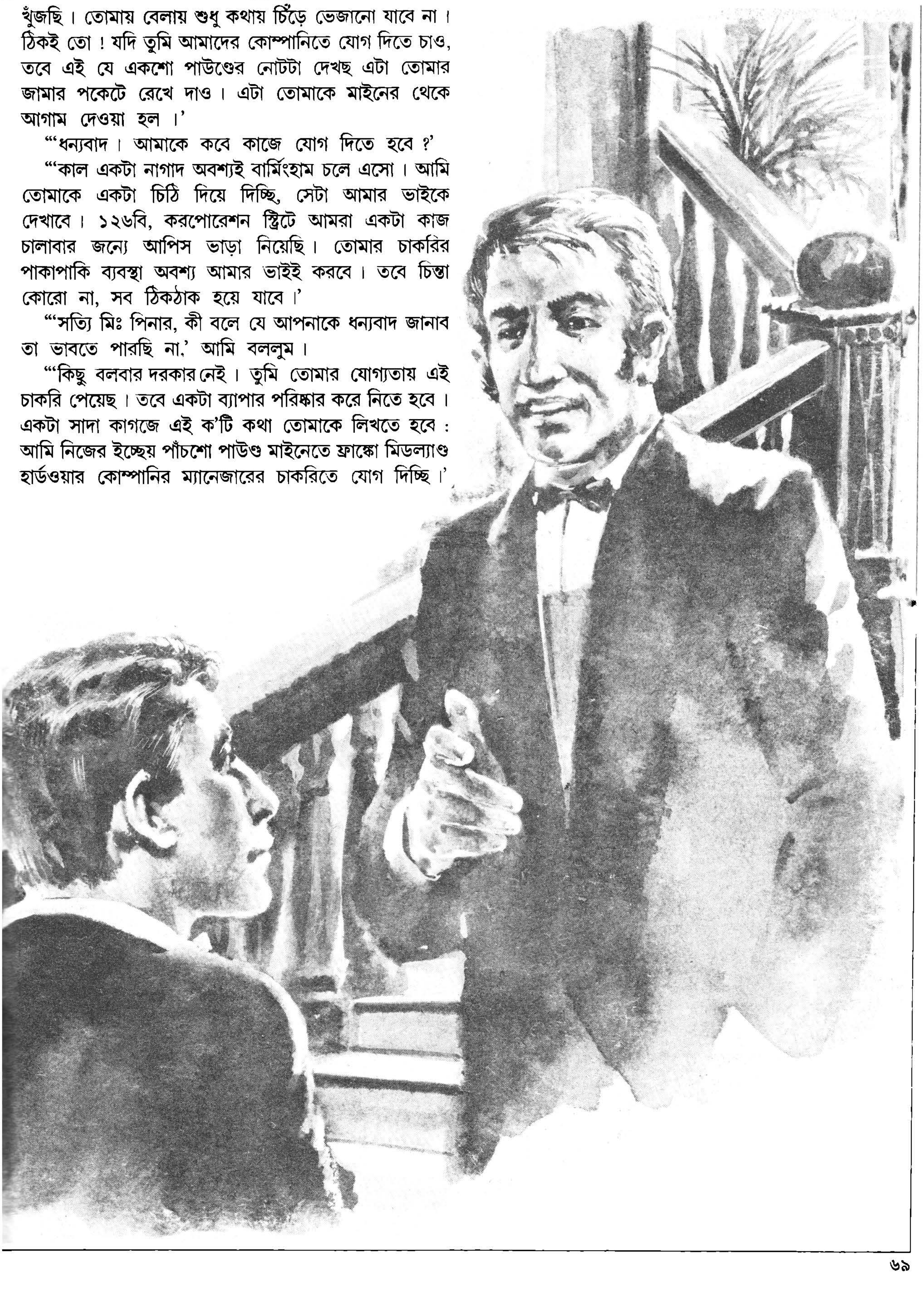

"আমি মিঃ পিনারের কথামতো একটা কাগজে কথাগুলো লিখে দিলুম। তিনি কাগজটা পকেটে পুরে নিলেন।

"'আর একটা কথা আছে। মসনের ব্যাপারটা কী করবে ?'

"আনন্দের চোটে মসন কোম্পানির কথা আমার খেয়াল ছিল না। 'আমি চিঠি লিখে ইস্তফা দিয়ে দেব।'

"'ঠিক ওই কাজটি কোরো না। তোমাকে নিয়ে মসনের ম্যানেজারের সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়ে গেছে। আমি তোমার সম্পর্কে একটু খোঁজ-খবর করতে গিয়েছিলুম। লোকটা এমন অসভ্যের মতো ব্যবহার করলে যে, বলা যায় না। বলে কিনা যে আমি তোমাকে ওদের ওখান থেকে ভাঙিয়ে নেবার চেষ্টা করছি ! রাগে আমার শরীর একেবারে জ্বলে যাচ্ছিল। ভাগ্য ভাল যে, দু-চার ঘা লাগিয়ে দিইনি।' আমি বললুম, 'সত্যি যদি কাজের লোক চাও তো ভাল মাইনে দাও।' তার উত্তরে লোকটা বললে, 'আরে বাদ দাও। ও তোমার বেশি মাইনের চাকরি ছেড়ে আমাদের কম মাইনের চাকরি করবে।' আমি বললুম, 'বেশ, পাঁচ পাউণ্ড বাজি ধরছি। তোমরা ওর কাছ থেকে কোনও খবরই পাবে না।' লোকটা বললে, 'বেশ, রাজি। ওকে আমরা আঁস্তাকুড় থেকে তুলে এনেছি। ও চট করে আমাদের ছেড়ে যাবে না।'

"বিশ্বাস করুন ডাঃ ওয়াটসন, কথাগুলো শুনে আমার এত খারাপ লাগল যে নিজেকে সামলাতে পারলুম না। 'আচ্ছা অভব্য লোক তো। লোকটাকে আমি এর আগে কোনওদিন দেখিনি পর্যন্ত। ও ভেবেছে কী ? ঠিক আছে, আপনার কথামতোই আমি কাজ করব। ওদের কোনও খবরই দেব না।'

"'ঠিক। তা হলে তুমি আমাকে কথা দিচ্ছ তো যে, ওদের সঙ্গে কোনওরকম যোগাযোগ করবে না। তবে এই নাও তোমার আগাম বেতন একশো পাউণ্ড আর এই চিঠি। ঠিকানাটা মনে রেখো, ১২৬বি, করপোরেশন স্ট্রিট। কাল দুপুর একটার সময় তোমাকে হাজির হতে হবে।....আমার ভাইয়ের জন্যে একজন সত্যিকারের কাজের লোক জোগাড় করতে পেরে আমার যে কত আনন্দ হল তা বলে বোঝাতে পারব না। আজ তবে চলি। আশা করি তোমার উন্নতির এই সবে শুরু।'

"মিঃ পিনারের সঙ্গে আমার এ ছাড়া আর কোনও কথা হয়নি। ডাঃ ওয়াটসন, আপনি নিশ্চয়ই আমার মনের অবস্থা কল্পনা করতে পারছেন। আনন্দের চোটে আমার তো সারারাত ভাল ঘুমই হল না। আমার এত সৌভাগ্য আমি নিজেই বিশ্বাস করতে পারছিলুম না। বার্মিংহাম যাবার প্রথম যে ট্রেনটা পেলুম সেটায় চেপেই রওনা হলুম। আমার একটার সময় পৌঁছবার কথা। আমি তার ঢের আগে পৌঁছে গেলুম। আমি প্রথমে নিউ স্ট্রিটের হোটেলে আমার জিনিসপত্র নিয়ে উঠলুম। তারপর সেই ঠিকানার খোঁজে বেরোলুম।

"একটা বাজবার পনেরো মিনিট আগেই সেই ঠিকানায় পৌঁছে গেলুম। আমার মনে হয়েছিল একটু আগে থেকেই হাজির থাকা হয়তো ভাল। ১২৬বি বাড়িটায় যেতে গেলে দুটো বড় দোকানের মাঝখানে একটা সরু গলি দিয়ে যেতে হয়। গলিটা দিয়ে এগিয়ে গেলেই সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেলে তলায় তলায় নানান আপিস। সিঁড়ির এক পাশের দেওয়ালে আপিসের নাম আর কোন্ তলার কোন্ ফ্ল্যাটে সেই আপিস তা লেখা আছে। কিন্তু ফ্র্যাঙ্কো মিডল্যাণ্ড হার্ডওয়ার কোম্পানি লিমিটেডের নাম নেই। আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আগাগোড়া সব ব্যাপারটাই কি ধাপ্পা ? সব কেমন গোলমাল হয়ে যেতে লাগল। এমন সময় ওপর থেকে একজন ভদ্রলোক নেমে এলেন। আমার কাছে কাল রাত্তিরে যে ভদ্রলোক গিয়েছিলেন তার সঙ্গে এঁর চেহারায় অদ্ভুত মিল আছে। শুধু এঁর দাড়ি-গোঁফ নিখুঁত ভাবে কামানো আর মাথায় অল্প টাক।

"ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি মিঃ হল পাইক্রফট ?'

"আমি বললুম, 'হ্যাঁ।'

"'ও হো। আমি তো আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি। আপনি অবশ্য একটু আগেই এসে পড়েছেন। আজ সকালেই আমি আমার ভাইয়ের কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছি। সে তো আপনার প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ।'

"'আমি আপিসের ঘরটা খুঁজছিলুম, এমন সময় আপনি এসে পড়লেন।'

"'আমরা এখনও আমাদের নাম এখানে লাগাইনি। গত সপ্তাহেই তো এই ঘরটা ভাড়া নিয়েছি। তা ছাড়া এখানে তো আমরা অস্থায়ীভাবে আছি। আসুন, ওপরে বসেই আপনার সঙ্গে সব কথা হবে।'

"ভদ্রলোকের পিছনে-পিছনে উঁচু-উঁচু সিঁড়ি দিয়ে আমরা একদম চিলে-কোঠায় পৌঁছে গেলুম। সেখানে দুটো ঘর। ঘরগুলোর মেঝেয় কার্পেট নেই, জানলায় কোনও পর্দা টাঙানো নেই। আমার ধারণা হয়েছিল, কোম্পানির আপিসটা বেশ বড়সড় হবে, সারি সারি টেবিল, সেখানে অনেক লোক কাজ করছে। ও হরি, কোথায় কী ! ঘরে একটা সাধারণ টেবিল আর টেবিলের দুপাশে দুটো খুবই শস্তার চেয়ার। টেবিলের ওপরে একটা লেজার আর নীচে একটা বাজে কাগজ ফেলার ঝুড়ি।

"আমার মুখ দেখে ভদ্রলোক বুঝতে পেরেছিলেন আমি খুবই হতাশ হয়েছি। 'ঘাবড়াবেন না মিঃ পাইক্রফট। রোম একদিনে গড়ে ওঠেনি। আমাদের টাকা পয়সার ঘাটতি নেই। আমরা এখনও পর্যন্ত সব গুছিয়ে উঠতে পারিনি। বসুন। কই আপনার চিঠিটা দেখি।'

"আমি চিঠিটা বের করে ভদ্রলোককে দিলুম। ভদ্রলোক খুব মন দিয়ে চিঠিটা পড়লেন। (ক্রমশ)

অনুবাদ : সুভদ্রকুমার সেন ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

ডোরাকাটা জামা

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : লজেন্স কিনতে গিয়ে হরেনদার দোকানে নিতুকে দেখল রুকু। নিতুর গায়ে ডোরাকাটা নীল জামা। ইস্কুলের ফাংশানে পলাশ দুষ্টুমি করে নিতুর ঘাড়ে দোষ চাপাবার চেষ্টা করেছিল। সুকু উঠে পলাশকে ঘুসি মারে। পুলিশ পলাশের বাবাকে হাতকড়া পরায়। পলাশের বাবা চোরাই-কারবারের দায়ে গ্রেফতার। সুকু এ-ব্যাপারে হদিস দেওয়ায় জেলাশাসক তাকে পরিত্যক্ত একটি চিড়িয়াখানা উপহার দেন। হরেনদার খাওয়ার বহর দেখে কমল ভৌমিক তাঁকে ব্যায়াম করাতে বদ্ধপরিকর। তারপর…

ডঃ মুখার্জি বললেন, "আপনি নির্ভয়ে বসুন। ব্যায়ামের কথায় কান দেবেন না আপনি। আপনার শরীর আমার হাতে। ট্যাবলেট আর ক্যাপসুলের যুগ। শরীরকে কষ্ট দিয়ে লাভ কী। বসুন। বসুন।"

ভরসা পেয়ে হরেনদা বসলেন আবার। কমল ভৌমিক বসলেন হাত-তিনেক দূরে আর একটা চেয়ারে। পেছনে একটা বড় ফুলগাছের টবে একটা পামগাছ লকলক করছে। পামগাছের পাতার একটা কোণ কমলের ঘাড়ের কাছে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। তিনি ঘাড়টা এপাশ-ওপাশ করছেন।

ডঃ মুখার্জি বললেন, "চেয়ারটা একটু সামনে টেনে নিন না, পাতাটা অসুবিধে করছে।"

আধবোজা-চোখে কমল বললেন, "বেশ ফাসক্লাস লাগছে। কেমন সুড়সুড়ি দিচ্ছে। গাছ ছাড়া মানুষকে কে আর এত ভালবাসবে বলুন।"

"আপনার ভাল লাগছে? তা হলে বসুন ওখানে।"

হরেনদা বললেন, "ডন-বৈঠকের ঠেলায় কাকাবাবুর গল্পটা কিন্তু হারিয়ে গেল।"

কমল ভৌমিক বললেন, "আমার কাকাবাবু হারাবেন? মামলায় তাঁকে কেউ কোনওদিন হারাতে পারেনি, পারবেও না। আমরা তাঁর নাম রেখেছি মামলাকাকু। তা হলে শুনুন। আমাদের শিমুলিয়ার বাড়িতে যে কাজ করে তার নাম শুভঙ্করী। এখন তার অনেক বয়েস। আমাদের ছেলেবেলায় তার কিন্তু অত বয়েস ছিল না।"

হরেনদা জিজ্ঞেস করলেন, "কেন?"

"কী আশ্চর্য কাণ্ড বলুন তো। আমাদের ছেলেবেলায় কাকাবাবুরও অত বয়েস ছিল না। এই সুন্দর চেহারা। খাড়া গোঁফ। সকালে হাজার ডন না মেরে ছোলা খেতেন না।"

হরেনদা বললেন, "এই রে, আবার ডন আসছে?"

কমল ভৌমিক বললেন, "ভয় পাবেন না, এ হল কাকাবাবুর ডন। হাজারটা ডন মারা মুখের কথা নয়। একবার মেরে দেখুন না। কাকাবাবু ছিলেন ডন-সিদ্ধ পুরুষ।"

হরেনদা বললেন, "এই এক জ্বালা, আপনি যেখান থেকেই কথা শুরু করুন না, ঘুরে ঘুরে ঠিক চলে আসবে ডনে।"

"আহা যার যেমন বাড়ি। আমাদের বাড়িটাই যে ডন-বৈঠকের। সেই জন্যে আমাদের বাড়ির নাম বৈঠকখানা। গেলেই দেখতে পাবেন, সামনে মার্বেল ফলক। কালো অক্ষরে লেখা: 'বৈঠকখানা'। শুনুন মশাই, আজ একটা সার কথা

বলে যাই, শক্তি, শক্তিই হল সব। স্ট্রেংথ। আগ্নেয়গিরি দ্যাখেননি, তবে শুনেছেন, সেই আগ্নেয়গিরি হতে হবে। কেঁচো হয়ে অনেক দিন হয়তো বাঁচা যায়, তবে বাঘের আনন্দ পাওয়া যায় না, সিংহের সম্মান পাওয়া যায় না। ওই যে ছেলেটি, ওই যে আমার সুকু, ওকে আমি কাল রাত থেকে ভীষণ ভালবেসে ফেলেছি; ওরই টানে আজ আমি খুঁজে-খুঁজে চলে এসেছি। ওকে আমি মানুষের মতো মানুষ করব। শক্তিতে, শিক্ষায়, চরিত্রে। আমি জানি মানুষকে কীভাবে মানুষ করতে হয়। সব সময় মনে-মনে বলতে হবে অ্যারাইজ অ্যাওয়েক। উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত। ওঠো, জাগো।"

ডঃ মুখার্জি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন কমল ভৌমিকের মুখের দিকে। একটা যেন জ্যোতি বেরোচ্ছে। জল এসে গেছে তাঁর চোখে। তাঁর ছেলের প্রতি অপরিচিত একজন মানুষের এত ভালবাসা। এতক্ষণ তাঁর মনে হয়েছিল, ব্যায়ামট্যায়াম করে, গুলিটুলি দেখিয়ে ঘুরে বেড়ায়, বড়-বড় করে বোকা-বোকা কথা বলে, ভেতরে বিশেষ কিছু নেই। সে ধারণা পালটাতে হল। অসাধারণ একজন মানুষ।

ডাক্তার চেয়ার ছেড়ে উঠে এগিয়ে গেলেন কমল ভৌমিকের দিকে। নিজের দু'হাতে তাঁর দুটো হাত জড়িয়ে ধরে বললেন, "আমার ভাই ছিল না, আজ থেকে আপনি আমার ভাই হলেন। আপনার এত ভালবাসা!"

দরজার সামনে রাজ্যেশ্বরী এসে দাঁড়িয়েছেন। চোখের সামনে অদ্ভুত সেই দৃশ্য। ডাক্তারের চোখে জল। কমল ভৌমিকের চোখে জল। ছেলে দুটো হাঁ হয়ে গেছে। হরেনদা বড়-বড় চোখে তাকিয়ে আছেন। রাজ্যেশ্বরী ঘরে ঢুকে টেবিলের ওপর একে-একে চায়ের কাপ সাজাতে লাগলেন।

হরেনদা বললেন, "বউদি, দৃশ্যটা দেখছেন। স্বর্গীয়। পৃথিবীতে আপন-পর বলে কিছু নেই। ভালবাসা, ভালবাসা। ভালবাসাই সব। শুনুন মশাই, কাল থেকে আমি করব।"

রাজ্যেশ্বরী বললেন, "কী করবেন?"

"আপনাকে বলতে লজ্জা করছে। বয়েস হয়েছে তো!"

কমল ভৌমিক বললেন, "কাল থেকে উনি ব্যায়াম করবেন। শরীরটা দেখছেন না, বেঢপ হয়ে গেছে। কোনও ছন্দ নেই। মানুষের শরীর হল কবিতার মতো, সঙ্গীতের মতো।"

সুকু কমল ভৌমিকের কাকাবাবুর গল্প শোনার জন্যে ছটফট করছিল। মনে করিয়ে দিলে, "তারপর সেই কাকাবাবু। কাকাবাবুর গল্পটা বলুন।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার সেই মামলাকাকু। শুভঙ্করী একতলা থেকে তিনতলায় জল তোলার সময় দোতলার সিঁড়িতে একটু জল ফেলে রেখেছিল।"

হরেনবাবু চোখ বড়-বড় করে বললেন, "অ্যাঁ, বলেন কী, কলকাতার মতো শহরে আপনাদের তিনতলা বাড়ি। আপনি তো মশাই বড়লোক। ডন-বৈঠক মেরেও তা হলে পয়সা হয়।"

"বাড়িটা আসলে তিনতলা নয়, পাক্কা চারতলা। তবে চারতলাটা আমরা ব্যবহার করতে পারি না। ওখানে একটা ভূত থাকে।"

"ভূত মানে?"

"ভূত মানে ভূত। রিয়েল ভূত। সে আবার আর-এক গল্প।"

"তা হলে ডন-বৈঠককে চারতলা হয় ?"

"হবে না! ইংরেজিতেই তো আছে, হেল্‌থ ইজ ওয়েলথ।"

সুকু বললে, "ধুর, আসল গল্পটা আর শেষই হচ্ছে না।"

কমল বললেন, "এইবার আমি গড়গড় করে শেষ করে দিচ্ছি। আর অন্য কথা নয়।"

হরেনদা বললেন, "তা হলে ভূতটা কখন হবে ?"

"রাত্তিরে। ভূত রাত ছাড়া আসে না। তা সেই শুভঙ্করী, তার আর কী দোষ বলুন! কেউ কি আর ইচ্ছে করে জল ফেলে!"

হরেনদা সমদারের মতো ঘাড় নাড়লেন, "ঠিকই তো, ঠিকই তো, জলই বলুন আর চা-ই বলুন, আর দুধই বলুন, তরলের ধর্মই হল উপচে কি টাল খেয়ে পড়ে যাওয়া। আর পারা যায় না মশাই। অসম্ভব ব্যাপার।"

"অ্যায়, ধরেছেন ঠিক, ধর্ম। মানুষের ধর্ম কী, বলুন তো!"

"এই আপনার দোষ। ছাত্র ভেবে বড় পালটা প্রশ্ন করেন।"

"মানুষের ধর্ম হল মনুষ্যত্ব ভুলে গিয়ে জানোয়ারের মতো ব্যবহার করা। ভগবান রামকৃষ্ণ বলতেন, মান আর হুঁশ দুয়ে মিলে মানুষ। হুঁশটি হারালে মানুষ আর মানুষ থাকে না। শুধু ডাম্বেল বারবেল নয়, কিঞ্চিৎ লেখাপড়াও করেছি।"

"ইশ্, এটা না বললেই পারতেন ; কিঞ্চিৎ গর্বের প্রকাশ হল। আপনারে বড় বলে বড় সেই নয়। লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয়।"

কমল ভৌমিক হেসে বললেন, "টাকার অহঙ্কার ছাড়া অন্য সব অহঙ্কার করা যায়। ভগবান রামকৃষ্ণ বলে গেছেন, সতের অহঙ্কার ভাল। তা আমি আপনার কথা শুনব; না তাঁর কথা শুনব!"

সুকু বললে, "আবার গল্প হারিয়ে যাচ্ছে।"

কমল বললেন, "শোনো বাবু সুকু-মাস্টার, গল্পের ধর্মই হল নদীর মতো হারিয়ে যাওয়া। মাঝে-মাঝে পাতাল-প্রবেশ। নদীর মতো গল্পেরও শাখা-প্রশাখা বেরোয়। এক দিকে যেতে যেতে আর-এক দিকে চলে যায়। তুমি বলো, কোন্ গল্পটা সোজা গড়গড় করে চলে! গল্প তো আর নালা-নর্দমা নয়!"

ডাক্তার মুখার্জি এতক্ষণে কথা বললেন, "ঠিক, ঠিক। আমাদের ছেলেবেলায় মা-ঠাকুমা যে-সব গল্প বলতেন, সে যেন গঙ্গা, আমাজন, ভল্‌গা, মিসিসিপি। তিন রাত, চার রাত, সাত রাত। সে আর শেষই হয় না। আজ তা হলে এইখানেই ক্রমশ লাগান।"

সুকু হৈ-হৈ করে উঠল, "না বাবা, না। আর-একটু হোক।"

"বেশ, আর দু'কদম এগোক। আমাকে এবার উঠতে হবে। ঘড়ি তাড়া লাগাচ্ছে।"

কমল ভৌমিক শুরু করলেন, "আমার সেই মামলাকাকু এইবার সিঁড়ি দিয়ে নামছেন। পরনে গরদ।"

হরেনদা সঙ্গে-সঙ্গে বললেন, "গরদ কেন ?"

"পুজো সেরে নীচে নামছেন।"

"মামলাও করেন, পুজোও করেন!"

"তা কেন করবেন না! পুজোটা তাঁর ভেতরের দিক, মামলাটা তাঁর বাইরের দিক। মানুষ অনেকটা দেয়ালের মতো। ভেতরের দিক, বাইরের দিক। ভেতরে ঠাকুরের ছবি ঝুলছে, বাইরে পোস্টার পড়ছে। গোবর-মাসি ঘুঁটে সাঁটছে।"

সুকু বললে, "তারপর!"

কমল হাসলেন, "হ্যাঁ, এইভাবে মাঝে-মাঝে ঠেলেঠুলে দাও মাস্টার। গল্প অনেকটা ব্যাটারি-ডাউন গাড়ির মতো। মাঝে-মাঝে স্টার্ট বন্ধ হয়ে যায়। তখন একটু করে ঠেলে দিতে হয়। পরনে গরদ। দু' হাতে দুটো প্রসাদের থালা। বগলে আসন। মামলাকাকু গুন-গুন করতে করতে নামছেন, ভব সাগর তারণ। নীচে থেকে আমরা সবাই শুনছি। কাকু আসছেন। আমরা হাঁ করে আছি প্রসাদের লোভে। বছরের প্রথম আম, ঠাকুরকে দেওয়া হয়েছে। সত্য'র সাতপাকে বাঁধা গুঁজিয়া।"

সঙ্গে-সঙ্গে হরেনদার প্রশ্ন, "সাতপাকে বাঁধা গুঁজিয়া! হোয়াট ইজ দ্যাট। গুঁজিয়ার ক'টা পাক হয় মশাই ? দেশ থেকে অঙ্কটঙ্ক সব উঠে গেল না কি! গুঁজিয়া তো সাধারণত ইউ-এর মতো দেখতে হয়। তার মানে তিনপাক। বাড়তি চারটে পাক এল কোথা থেকে!"

"পৃথিবীর সবকিছু কি অঙ্ক মেনে চলে। এই তো আমাদের পাড়ায় যে হরেনদা আছেন, তিনি ছ'ফুট লম্বা, রোগা, ফর্সা, গান শেখান, আর সময় পেলেই কেষ্টর দোকানে ব্রেস্ট কাটলেট খান মাস্টার্ড দিয়ে। আপনিও হরেনদা, তিনিও হরেনদা, দু'জনে এক হলেন ? সত্যর গুঁজিয়ার সাতপাক। আমরা বলি সত্য'র সাতপাক। হরেনদা আবার কালোয়াতি গান বেঁধে ফেললেন :

সত্য'র সাতপাক সাত সুরে সাধা
সস সস সস সস সস সস সা ॥

রাগ, ভৈরবী। তাল, ত্রিতাল। শেষ সা-এর ওপর সম।"

(ক্রমশ)

ছবি : দেবাশিস দেব

নতুন বছরের নতুন-নতুন বই

সমরেশ মজুমদারের

দু-দুটি থ্রিলার একসঙ্গে

সীতাহরণ-রহস্য দাম ১৫·০০

আগে ছিল হিপি হবার ঝোঁক, এখন আমেরিকার কিশোরকিশোরীদের নিয়ে অন্যতম সমস্যা, পাঙ্ক হবার প্রবণতা। হিপিদের চেয়েও উগ্র এই পাঙ্ক-সম্প্রদায়। প্রকাশ্যে এরা ব্যঙ্গ করে পুরনো সংস্কার ও রীতিনীতিকে। এক-একটা শহরের সবচেয়ে কুখ্যাত রাস্তায় দল বেঁধে পড়ে থাকে। নিজেদের এলাকাকে যেমন করে তোলে বীভৎস, ভয়াবহ, নিজেদের চেহারা ও সাজপোশাককেও তেমনি কুশ্রী ও কদাকার।

ছিনতাইবাজ, নিষ্ঠুর, নেশাখোর এই পাঙ্কদের দলেই ভিড়েছিল আমেরিকাবাসী বাঙালী মেয়ে সীতা। মেয়েকে বাঁচাতে তাকে নিয়ে ভারতে পালিয়ে এলেন উপেন্দ্রনারায়ণ। কিন্তু কোথায় পালাবেন ? একবার নাম লেখালে পাঙ্কদের হাত থেকে দলত্যাগীর নিস্তার নেই। ফলে, দু-দুবার ঘটল সীতাহরণ। একবার কালিম্পঙে, দ্বিতীয়বার চণ্ডীগড়ে।

সেই দু-দুবার সীতাহরণ-রহস্যেরই দু-দুটি দুর্দান্ত আকর্ষণীয় কাহিনী এই বইতে। দুক্ষেত্রেই রহস্যের জট খুলেছে কিশোর সত্যসন্ধানী অর্জুন ও তার গুরু অমল সোম, সমরেশ মজুমদারের 'খুনখারাপি' গ্রন্থ থেকেই রহস্যভেদী যে-জুটি পাঠকপ্রিয়।

প্রচ্ছদ : জয়ন্ত ঘোষ

বুদ্ধদেব গুহর

এক মলাটে দুটি অসাধারণ উপন্যাস

বাঘের মাংস এবং অন্য শিকার

দাম ১৫·০০

একমুখ সাদা দাড়ি, ঠোঁটে পাইপ, পিঠের রাক্-স্যাকে প্রয়োজনীয় কিছু টুকিটাকি ও প্রিয় কবির কাব্যগ্রন্থ, কাঁধে ভারী দোনলা রাইফেল—সে এক অদ্ভুত বুড়ো শিকারী। দুর্গম পাহাড়ী জঙ্গলে সর্বক্ষণ খুঁজে বেড়াচ্ছে এক বুড়ো বাঘের পায়ের দাগ। আর সেই বুড়হা-বাঘাও একইভাবে সতর্ক চক্ষু ক্ষেত্রে মেলে রেখেছে বুড়ো শিকারীর নরম জুতোর ছাপের দিকে। একজন চেয়েছিল, জীবনে একবার অন্তত বাঁচার মতো বাঁচতে। অন্যজন—সেরা বাঘের জীবন।

এই দুজনকে নিয়েই নতুন স্বাদের কাহিনী—'অন্য শিকার'। এই আশ্চর্য উপন্যাস ছাড়াও আরেকটি দুর্ধর্ষ শিকারকাহিনী, 'বাঘের মাংস', এই বইতে। তারও স্বাদ অন্যরকম। আসলে, শিকারের গল্পে শুধুই রোমাঞ্চকর বর্ণনা শোনাতে চান না বুদ্ধদেব গুহ। উৎকণ্ঠাকে আদ্যন্ত সজীব রেখে তুলে ধরেন জীবনের নানান পরিচয়। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের ছবি যেমন জীবন্তভাবে ফোটায় তাঁর কুশলী কলম, সেইসঙ্গে যোগায় সার্থকভাবে বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা, সাহস এবং প্রেরণা।

প্রচ্ছদ : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

আ ন ন্দ

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, ফোন : ৩৪৪৩৬২

টারজান
এডগার রাইস বারোজ
গুলি করে মেরে ফেললেই ল্যাঠা চুকে যায় !
না লাইল, আমরা নরহত্যা করতে আসিনি !
এই, দাঁড়াও !
তিন কোটিপতি মার্কিন চোরাশিকারি টারজানকে শিক্ষা দিতে গিয়ে দেখল যে, টারজানের কাছেই তাদের অনেক কিছু শেখার আছে !
এখান থেকে দূর হও !
দুটো কুপোকাত, একটা বাকি !
কত টাকা চাই তোমার ?
টাকা দিয়ে আমাকে কেনা যায় না !
দেখা যাক, কে হারে, কে জেতে !
(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

বীরসিংহ ভগবতী বিদ্যালয়

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামে অবস্থিত 'বীরসিংহ ভগবতী বিদ্যালয়' মেদিনীপুর জেলার একটি অতি প্রাচীন বিদ্যালয়। শুধু প্রাচীনত্বের দিক থেকেই নয়, জেলায় শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রেও এই বিদ্যালয়ের একটি গৌরবময় ভূমিকা আছে। ১৮৫৩ সালে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর মা ভগবতী দেবীর ইচ্ছানুসারে এই স্কুলটি স্থাপন করেন। গোড়ার দিকে স্কুলটির নাম ছিল 'মডেল ভার্নাকুলার স্কুল'। শোনা যায়, স্কুলের বাড়ি তৈরির কাজ যেদিন শুরু হয়, কোনও লোক পাওয়া যায়নি। স্বয়ং বিদ্যাসাগর তাঁর ভাইদের নিয়ে ভিত-পত্তনের কাজ শুরু করেছিলেন। শুধু তাই নয়, স্কুলের প্রাথমিক কাজকর্মের জন্য একহাজার টাকা তিনি তাঁর বাবা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের বন্ধু প্যারীচরণ সরকার তাঁর লেখা বইগুলি স্কুলের ছেলেদের উপহার দিয়েছিলেন। ১৮৫৯ সালের ২০ মে ইন্সপেক্টর অব স্কুলস্ (সার্ভিস বেঙ্গল) লজসাহেব এই স্কুল সম্পর্কে জানিয়েছিলেন : This school has been established and entirely supported by the well-known Pandit Iswarchandra Vidyasagar. In mere justice to that noble philanthropist, I feel it my duty to observe that he has erected a beautiful bunglow for the school in a very convenient locality, pays some six or seven teachers from his own private resources, the boys are educated free and supplied with all sorts of books, and what is still more to be admired, the poorer students, about 30 in number, are constantly boarded and lodged in his family mansion and now and then supplied with clothes, etc, when considered necessary. Careful medical attendance is also secured for them, and they are all taken care of as if they were so many members of his family বিদ্যাসাগর স্কুলটির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রতি মাসে আর্থিক সাহায্য পাঠাতেন। ১৮৯০ সালে স্কুলটি উচ্চ ইংরেজি স্কুলে পরিণত হয় এবং এর পরের বছর, অর্থাৎ ১৮৯১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে। এই বছরই বিদ্যাসাগর লোকান্তরিত হন।

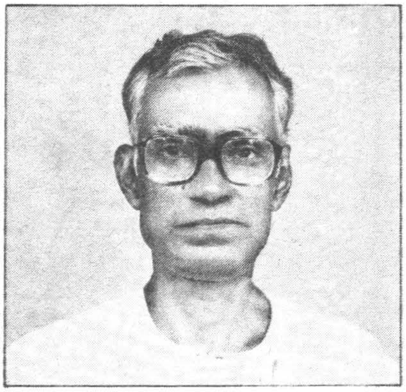

বীরসিংহ ভগবতী বিদ্যালয়ের বর্তমান ছাত্রসংখ্যা প্রায় ৮০০। এই স্কুলের বহু ছাত্র জীবনের নানা ক্ষেত্রে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে যশস্বী হয়েছেন। ভগবতী বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল মোটামুটি ভাল। প্রতিবছরই স্টার এবং ন্যাশনাল স্কলারশিপ থাকে। ১৯৮৫ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার বৃত্তিমূলক শাখায় (কৃষি) এই স্কুলের ছাত্র নকুলচন্দ্র মাইতি পশ্চিমবঙ্গে প্রথম স্থান অধিকার করেছিল, দশম স্থান অধিকার করেছিল দীপককুমার রায়। ১৯৮৩ সালে এই স্কুল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল ৪৬ জন। প্রথম বিভাগ : ৫। দ্বিতীয় বিভাগ : ১০। তৃতীয় বিভাগ : ১৭। ১৯৮৪ সালে পরীক্ষার্থী ৫০। প্রথম : ৫। দ্বিতীয় : ১৪। তৃতীয় : ৩। ১৯৮৫ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল ৩৩ জন ছাত্র। প্রথম বিভাগ : ৭ জন। দ্বিতীয় : ৯। তৃতীয়: ৫।

বীরসিংহ ভগবতী বিদ্যালয়ের বর্তমান প্রধানশিক্ষক শৈলেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৬৮ সালের ১ মে থেকে এই স্কুলে আছেন। এর আগে দীর্ঘদিন হাওড়ার একটি স্কুলে সহকারী শিক্ষক ছিলেন। তিনি এই স্কুলের একজন কৃতী ছাত্র। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভূগোলে এম-এসসি।

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমেই একটু আক্ষেপ করে বললেন, "দেখুন, যে মহাপুরুষের জন্য বীরসিংহ আজ পুণ্যভূমি, সমাজের হিতসাধনের জন্য যিনি নানাভাবে সংগ্রাম করেছিলেন, লেখাপড়ার উন্নতির জন্য যিনি শুধু ভগবতী বিদ্যালয়ই নয়, আরও অসংখ্য বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন, সেই মহামনীষীকে এখনকার ছেলেমেয়েরা প্রায় ভুলতে বসেছে। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবিস্মরণীয় কীর্তির কথা এখন ক'জন ছেলেমেয়ে জানে। তাঁর মায়ের নামে, তাঁর নিজের হাতে গড়া এই স্কুল। এই স্কুলটির জন্য তাঁর ভালবাসা আর দরদের অন্ত ছিল না। এখন যারা পড়ুয়া, তারা সবাই এই বিদ্যায়তনকে ভালবাসে। পুণ্যশ্লোক

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চিঠির একাংশের প্রতিলিপি

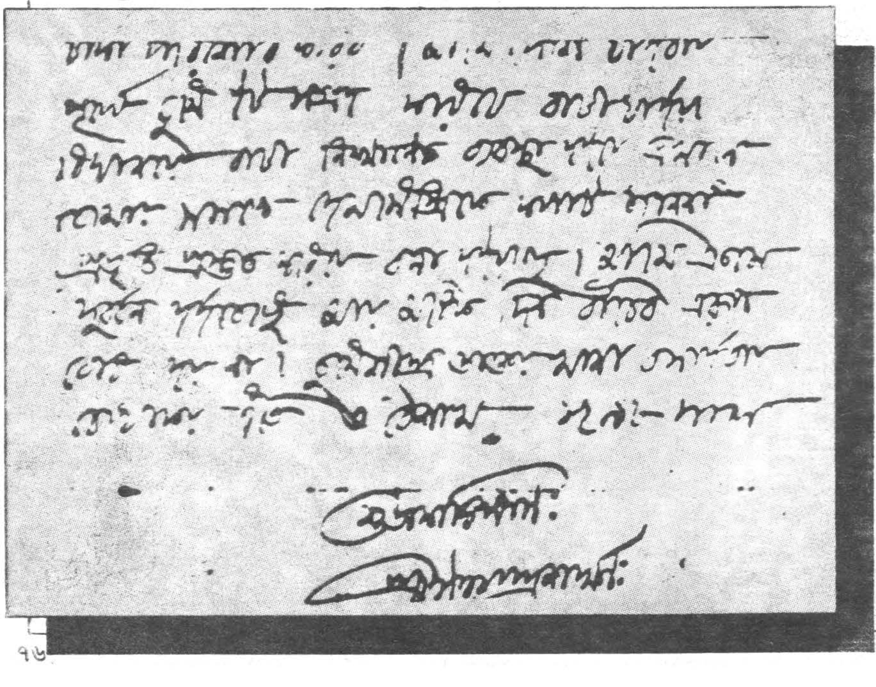

বিদ্যাসাগরের স্মৃতিবিজড়িত প্রতিষ্ঠানটিকে শ্রদ্ধা করে, সমীহ করে। ছাত্রাবাসটির জীর্ণ দশা, তা সত্ত্বেও দূর-দূরান্তের ছেলেরা হাসিমুখে এখানে থাকে। কষ্ট আছে, কিন্তু কোনও ক্রোধ নেই। অভিযোগ নেই। এ আমাদের কাছে মস্ত আনন্দের ব্যাপার।

"এই বিদ্যালয়ের উন্নতির মূলে প্রাক্তন প্রধানশিক্ষক পার্বতীচরণ চক্রবর্তীর অবদান উল্লেখযোগ্য। বিদ্যাসাগরের ভ্রাতুষ্পুত্র ডাঃ পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছেও এ-প্রতিষ্ঠান নানাভাবে ঋণী। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আর-এক আত্মীয় গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের অবদানও স্মরণযোগ্য।"

কথায় কথায় **পরীক্ষায় ভাল ফল করবার উপায় সম্পর্কে** প্রধানশিক্ষকের অভিমত জানতে চাইলাম। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, "সর্বাগ্রে একটা কথা মনে রাখা দরকার, ছেলেমেয়েরা যেখানে পাঠগ্রহণ করছে, তার পরিবেশ সুন্দর ও সুস্থ হওয়া চাই। শহরাঞ্চলের কথা বলছি না, গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ স্কুলেই ভাল শিক্ষকের খুব অভাব। এই অভাব পরীক্ষার ফলাফলকে যে কিছুটা বিঘ্নিত করে, এতে কোনও সন্দেহ নেই। পড়ুয়া ও শিক্ষকের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠা দরকার। **বেশির ভাগ স্কুলেই ভাল লাইব্রেরি নেই। এদিকে নজর রাখতে হবে। অভিনয়, খেলাধুলো, সাহিত্যচর্চা ইত্যাদির ব্যবস্থাও স্কুলে থাকা দরকার—যা থেকে ছাত্রছাত্রীদের শরীর ও মনের বিকাশ ঘটতে পারে।**"

ইংরেজি প্রসঙ্গে প্রধানশিক্ষকের অভিমত হল, "**ব্যাকরণের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের সম্পর্ক এখন খুব ক্ষীণ। অথচ ব্যাকরণই ভাষার জ্ঞান ও পরিধিকে বাড়িয়ে দেয়।** ব্যাকরণ পড়তে হবে ভাল করে, সেইসঙ্গে অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে পড়তে হবে পাঠ্যবইটিও। পাঠ্যবই পড়ে যদি কেউ নোটবইয়ের সহায়তা নেয়, তা হলে সেটা দোষের নয়। বানান, হাতের লেখা, নিয়ম করে প্রশ্নোত্তর লেখা ও শুধরে নেওয়া, এগুলো যে-কোনও পড়ুয়ার কাছে প্রধান কাজ হওয়া উচিত।"

বাংলা সম্পর্কে এই বিষয়ের প্রবীণ শিক্ষক কৃষ্ণপদ মঙ্গল বললেন, "এখনকার অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই বিজ্ঞানমুখী, ফলে সাহিত্যের উপর তেমন টান নেই। পঠনপাঠনেরও অবনতি ঘটছে। তার ফলও হচ্ছে মারাত্মক। প্রতিবছরই বাংলায় বিস্তর ছেলেমেয়ে ফেল করছে। **বাংলা মাতৃভাষা বলে তাকে হেলাফেলা করার কিছু নেই।**"

অঙ্কের শিক্ষক ভোলানাথ মঙ্গল তাঁর বিষয় সম্পর্কে জানালেন, "**অনুশীলনই অঙ্কের প্রথম ও শেষ কথা।** মুখস্থ করা উচিত নয়। তবে জ্যামিতির কিছু সংজ্ঞা ও অ্যালজেবরার ফরমুলা মুখস্থ রাখতে হবে।"

ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট বয়

বীরসিংহ ভগবতী বিদ্যালয়ে ক্লাস নাইন থেকে ফার্স্ট হয়ে টেন-এ উঠেছে প্রদীপকুমার পাল। প্রদীপ গোড়া থেকেই এই স্কুলে পড়ছে। ফার্স্ট হচ্ছে এইট থেকে। স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষায় মোট ৯০০ নম্বরের মধ্যে প্রদীপ পেয়েছে ৬৫৬। প্রদীপের বাবা শ্রীবিমলাকান্ত পাল, মা শ্রীমতী গীতারানী পাল।

প্রদীপ সারাদিনে সাত-আট ঘন্টা পড়ে। ছুটির দিনে একটু বেশি সময় দেয়। একজন গৃহশিক্ষক আছেন। তিনি অঙ্ক দেখিয়ে দেন।

প্রদীপ গল্পের বই পড়তে ভালবাসে। পড়ার ব্যাপারে সে তেমন বাছবিচার করে না। তাই আলাদা করে তার কোনও প্রিয় লেখক নেই।

খেলাধুলোর দিকে তেমন টান নেই। কিন্তু অবসর সময়ে ছবি আঁকে। কিন্তু কী ধরনের ছবি আঁকতে পছন্দ করে প্রদীপ, কোন্ শিল্পীর কাজ তার ভাল লাগে, তার প্রিয় রঙ কী—এসবের উত্তর জিজ্ঞেস করেও জানা গেল না।

পড়াশোনার ব্যাপারে ক্লাসের বই আর মাস্টারমশাইদের পরামর্শ প্রদীপের কাছে যথেষ্ট। সহায়ক-বই খুব একটা দরকার হয় না। আর ভবিষ্যতের স্বপ্ন? এ-ব্যাপারেও প্রদীপ চট্ করে মুখ খুলল না। শুধু একবার লাজুক মুখ করে বলল, "এখন থেকে কি ফলের কথা বলা যায়! সবই ভগবানের উপর নির্ভর করছে!"

প্রদীপ 'আনন্দমেলা'র নিয়মিত পাঠক নয়। স্কুলের লাইব্রেরিতে মাঝে-মাঝে আনন্দমেলা পড়ে। কমিকস্ আর খেলাধুলো বিভাগ খুব ভাল। গল্প-কবিতার সঙ্গে যেসব রঙচঙে ছবি থাকে, সেগুলোও 'বেশ লাগে দেখতে'।

বিজ্ঞান সম্পর্কে এই বিষয়ের শিক্ষক সুনীলকুমার ঘোষ ও অমিতকুমার পানিগ্রাহী দু'জনেই মোটামুটি একই কথা বললেন। তাঁদের বক্তব্য, "**বিজ্ঞান মুখস্থ করা চলবে না। বুঝে পড়তে হবে।** বিজ্ঞানে ব্যবহারিক চর্চা দরকার। বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রকৃতিকে চেনবার ও জানবার চেষ্টা করতে হবে। বিজ্ঞান-শিক্ষার্থীদের ছবির গুরুত্ব সম্পর্কেও অবহিত থাকতে হবে। মাঝে-মাঝে বিজ্ঞান-বিষয়ক সেমিনার করতে পারলে এবং স্কুলে বিজ্ঞান-ক্লাব গড়ে তুলতে পারলে সুফল পাওয়া যাবে।"

শ্রীমতী কৃষ্ণা চক্রবর্তী তাঁর বিষয় ভূগোল সম্পর্কে প্রাঞ্জল আলোচনা করলেন। তিনি বললেন, "**ভূগোল বিষয়টির পরিধি ব্যাপক। এই বিষয়টি থেকে অন্যান্য বিষয়ের উপাদানও পাওয়া যায়।** যে-কোনও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাতে ভূগোলসংক্রান্ত প্রশ্ন থাকে। সামান্য মাপজোখের ব্যাপারেও এই বিষয়টির দিকে আমাদের হাত বাড়াতে হয়। সুতরাং, আমাদের লেখাপড়ার কাজে ভূগোলের গুরুত্ব অসীম।"

ইতিহাস সম্পর্কে এই বিষয়ের প্রবীণ শিক্ষক রতিকান্ত ঘোষ মূল্যবান অভিমত জানালেন। "ইতিহাস একেবারেই তুচ্ছতাচ্ছিল্যের বিষয় নয়। ইতিহাসও নিষ্ঠার সঙ্গে পড়তে হয়। পড়ার সঙ্গে সমানভাবে লেখার চর্চাও দরকার। **ইতিহাসে গুলগল্পের সুযোগ নেই, তথ্য যথাযথভাবে লিখতে হবে।** ছুটিছাটায় ঐতিহাসিক জায়গাগুলি বেড়িয়ে আসতে পারলে ইতিহাসের জ্ঞান অনেক পোক্ত হয়।"

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক পরমেশ্বর চক্রবর্তী, ক্রীড়া-শিক্ষক আলোকরঞ্জন রায়, কর্মশিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক রামানন্দ চক্রবর্তী আমাদের আলোচনায় যোগ দিয়ে তাঁদের বিষয় নিয়ে অনেক প্রয়োজনীয় কথা বলেছিলেন। সহকারী প্রধানশিক্ষক তারাপদ চক্রবর্তী, যিনি ৪০ বছর ধরে শিক্ষকতা করছেন, তিনি তাঁর ছাত্রজীবনের অনেক মধুর অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়েছিলেন। দুঃখের বিষয়, স্থানাভাবে লেখা গেল না।

"আনন্দমেলা'কে শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধানশিক্ষক বললেন, "এই কাগজটি থেকে শুধু ছোটরা নয়, বড়রাও আনন্দ ও জ্ঞানের খোরাক সংগ্রহ করেন। এই কাগজটি আমার মতে, একটি আদর্শ পারিবারিক পত্রিকা।"

শ্যামলকান্তি দাশ

মেক্সিকোয় কে বিশ্বকাপ জিতবে

রত্না শূর

একত্রিশ মে, উনিশশো ছিয়াশি। বিশ্বের ফুটবল-অনুরাগীরা সাগ্রহে এই দিনটির অপেক্ষায় রয়েছেন। কেন, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কে না জানে ত্রয়োদশ বিশ্বকাপ ফুটবলের উদ্বোধনী দিনটির কথা।

দিয়েগো মারাদোনা

মিশেল প্লাতিনি

সত্তর সালের পর মেক্সিকোতে আবার বিশ্বকাপের আসর বসতে চলেছে। ঘটনাটি এই কারণে তাৎপর্যপূর্ণ যে, আজ পর্যন্ত লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে যতবার বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা হয়েছে, প্রতিবারই দক্ষিণ আমেরিকার দেশ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। ১৯৩০ সালে উরুগুয়েতে ও ১৯৫০ সালে ব্রাজিলে উরুগুয়ে চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল, ১৯৬২ সালে চিলিতে ও ১৯৭০ সালে মেক্সিকোয় ব্রাজিল চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল, এবং ১৯৭৮ সালে আর্জেণ্টিনায় আর্জেণ্টিনা চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল। অনুমান করা হচ্ছে, ছিয়াশি সালে বিশ্বকাপ দক্ষিণ আমেরিকাতেই যাবে। এই অনুমানের পিছনে শুধু ইতিহাসের নজির নয়, সঙ্গত কিছু যুক্তিও আছে।

মেক্সিকোর অবস্থান, তাপমাত্রা ও আবহাওয়া অভ্যস্ত দেশগুলির পক্ষে যতটা সুবিধেজনক, অনভ্যস্ত দেশগুলির পক্ষে ততটাই অস্বস্তিকর। জুন মাসে মেক্সিকোর প্রধান সমস্যা হল রুক্ষতা ও প্রচণ্ড গরম। ইউরোপের দেশগুলির পক্ষে এই সমস্যার মোকাবিলা করা সহজ হবে না। মেক্সিকোর অবস্থান সমুদ্রপৃষ্ঠের সাত হাজার ফুট ওপরে। মেক্সিকোর দুটি স্টেডিয়াম ছাড়া অন্যান্য শহরের বাকি যে দশটি স্টেডিয়ামে খেলা চলবে, তার মধ্যে পিউবলা, তোলুকা ও লিও স্টেডিয়ামের অবস্থান আরও ওপরে। জুন মাসের প্রখর সূর্যকিরণ সুউচ্চ এই স্টেডিয়ামগুলিকে রুক্ষতার কোন্ পর্যায়ে নিয়ে যায়, তা সহজেই অনুমেয়। তার ওপর দূরদর্শন কর্তৃপক্ষের শর্ত অনুযায়ী সংগঠকরা প্রতিটি খেলা দিনের 'পিক আওয়ার'-এ খেলানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অর্থাৎ দুপুর বারোটা থেকে চারটের মধ্যে দলগুলিকে মাঠে নামতে হবে। এই পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক খেলা খেলতে কতটা বাড়তি শারীরিক সক্ষমতার প্রয়োজন তা আর ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। মেক্সিকোর আবহাওয়াকে কৌশলে কাজে লাগিয়েই ১৯৭০ সালে বিশ্বকাপের কোয়ার্টার্র ফাইনালে ২-১ গোলে এগিয়ে থাকা ইংল্যাণ্ডের হাতের মুঠো থেকে পশ্চিম জার্মানির কোচ ৩-২ গোলে জয় ছিনিয়ে নিয়েছিলেন।

ইতিহাস ও তাপমাত্রার ভিত্তিতে এবারও দক্ষিণ আমেরিকার দলগুলির মধ্যে থেকেই সম্ভাব্য বিজয়ী খুঁজে নেবার

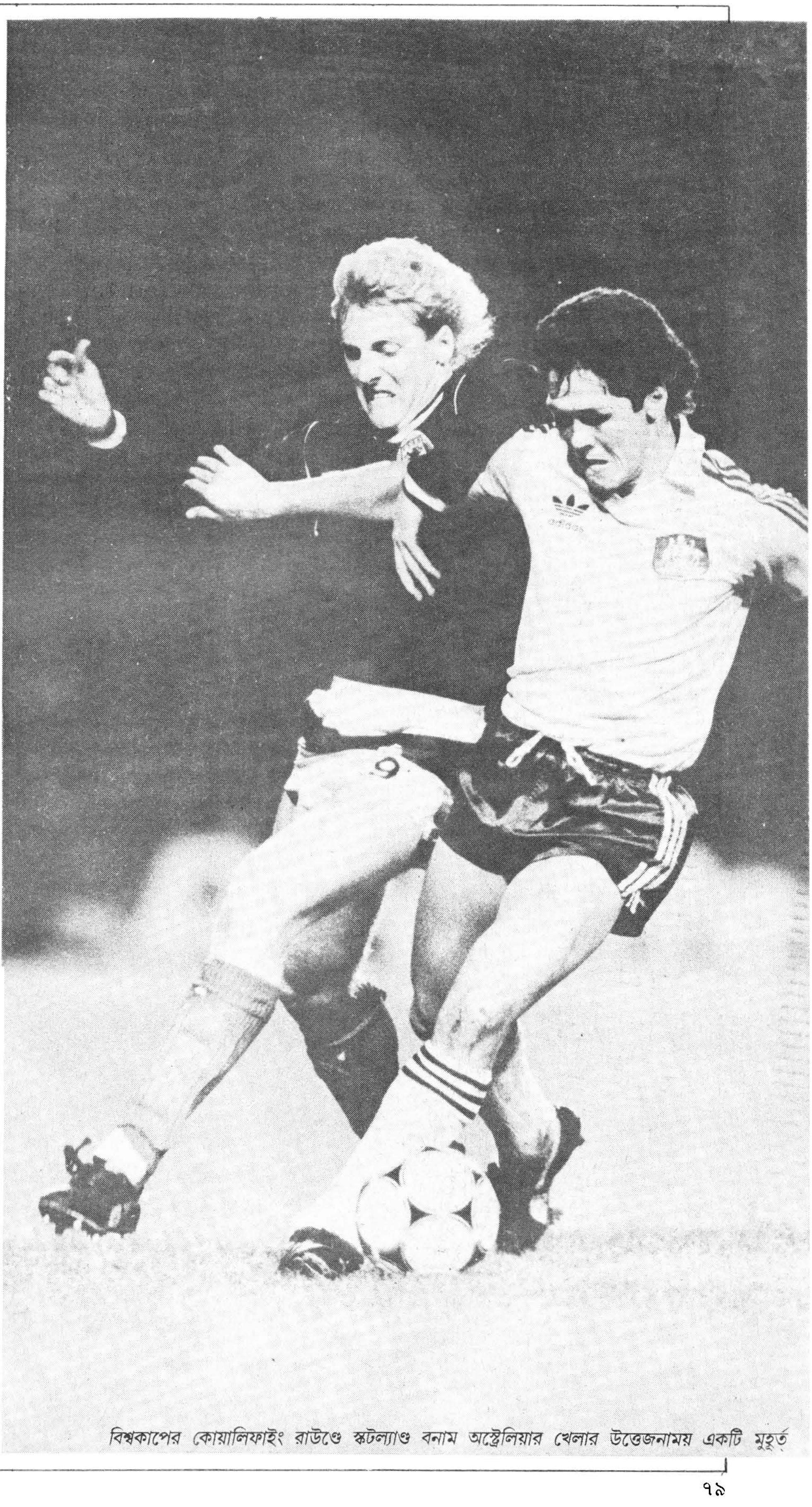

বিশ্বকাপের কোয়ালিফাইং রাউণ্ডে স্কটল্যাণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার খেলার উত্তেজনাময় একটি মুহূর্ত

চেষ্টা অসঙ্গত নয়। কারণ, এই অঞ্চলের দেশগুলির সঙ্গেই মেক্সিকোর আবহাওয়ার পরিচিতি সবচেয়ে বেশি। এবং এই অঞ্চলটিতেই ফুটবলে বলীয়ান বহু দেশ অবস্থিত।

ফুটবল-প্রতিভায় সমৃদ্ধ দক্ষিণ আমেরিকা থেকে যে চারটি দেশ চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে, তার মধ্যে নবাগত প্যারাগুয়ে ছাড়া বাকি তিনটি দেশ উরুগুয়ে, আর্জেন্টিনা এবং ব্রাজিল সেমি-ফাইনাল পর্যন্ত খেলার তো বটেই, বিশ্বকাপেরও দাবিদার হওয়ার সামর্থ্য রাখে।

দু'বারের বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ান উরুগুয়ের সামনে দীর্ঘ আড়াই দশক পর তৃতীয়বার বিশ্বকাপ জয়ের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ১৯৭০ সালে মেক্সিকোয় এই দল সেমি-ফাইনাল পর্যন্ত উঠেছিল। এবার সেই রেজাল্ট কি আরও উন্নত করতে পারবে উরুগুয়ে? ফ্রান্সিসকলি ও ক্যারাসকোর মতো গোল-বুভুক্ষু মিডফিল্ডার এবং দা সিলভা, ক্যাবরেরা ও এগুইলেরার মতো কার্যকরী স্ট্রাইকার রয়েছেন আক্রমণে। রক্ষণে রডরিগসের মতো দায়িত্বশীল ব্যাক আছেন। উরুগুয়ের এই দলটি নিঃসন্দেহে সমর্থকদের প্রত্যাশা জিইয়ে রাখার পক্ষে যথেষ্ট। তবে, ফুটবল-বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এই প্রত্যাশার দৌড় বড় জোর সেমিফাইনাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। এই মুহূর্তে উরুগুয়ের পক্ষে ফাইনালে ওঠাই সম্ভব নয়, বিশ্বকাপ জয় তো দূরের কথা।

অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে বিশ্বকাপের ফাইনালে খেলা ও বিশ্বকাপ জেতার সম্ভাবনা রয়েছে আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিল দলের।

১৯৭৮ সালের চ্যাম্পিয়ান দিয়েগো মারাদোনা সম্প্রতি তার পুরনো ফর্ম ফিরে পেয়েছেন। দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ জয়ের পক্ষে মারাদোনার আট মিলিয়ন ডলার দামের দুরন্ত পা দু'টিকেই যথেষ্ট বলে মনে হয়। কিন্তু একজনের পক্ষে তো আর বিশ্বকাপ জেতা সম্ভব নয়। আর্জেন্টিনা দলে রক্ষণে ও ফিনিশিং পাওয়ারে কিছুটা ত্রুটি থাকলেও সামগ্রিক হিসেবে এই দলের শক্তি ও সামর্থ্য অন্যান্য দলের তুলনায় অনেক বেশি ব্যালান্সড। অভিজ্ঞ পাসারেলা ও ট্রোসেরোদের মজবুত রক্ষণের সামনে থাকবেন মারাদোনা, মারাদোনার পাশে থাকবেন তরুণ বয়সের সঙ্গী বারবাস, এবং সামনে থাকবেন ভালদানোর মতো দুরন্ত সেণ্টার ফরোয়ার্ড। এ ছাড়াও ফিল্লোল, ক্লুসেন, রুসো, রুবোচাগার মতো অভিজ্ঞ ও নবীনরা দলে রয়েছেন। মেক্সিকোতে আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন দেখতেই পারে।

আর্জেন্টিনার মতো ব্যালান্সড দল না হোক, ব্রাজিলেরও বিশ্বকাপ জয়ের সম্ভাবনা প্রায় সমান। ব্রাজিল মেক্সিকোতেই শেষবারের মতো বিশ্বকাপ জয় করেছিল। পেলে, টোস্টাও, জেয়ারজিনহো, গারসনদের মানের ফুটবলারের সংখ্যা ব্রাজিলে কমে এলেও বর্তমান ব্রাজিলের নক্ষত্ররা আজও উত্তর আমেরিকায় তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখেছেন। উত্তর আমেরিকার চ্যাম্পিয়ান

কোয়ালিফাইং রাউণ্ডে ইতালি বনাম পোল্যাণ্ডের খেলায় পোল্যাণ্ডের খেলোয়াড় হেড করে বল ক্লিয়ার করছেন

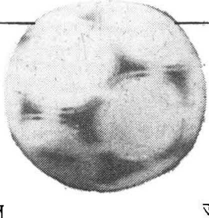

ব্রাজিল বিশ্বকাপের ফেভারিট হিসেবে আর্জেন্টিনার এক কাঠি ওপরে আছে। ডাঃ সক্রেটিস, জিকো, ফালকাও ও সিরেজোর মতো খেলোয়াড়ে সমৃদ্ধ ব্রাজিল মাঝমাঠেই বিশ্বকাপ জিততে পারে। তার ওপর ব্রাজিলীয় রীতির স্টপ-গো ধরনের ফুটবল মেক্সিকোর শুষ্ক আবহাওয়ার সঙ্গে একেবারে মেড ফর ইচ আদার। সেণ্টার ফরোয়ার্ডদের অভাব ব্রাজিলের প্রধান সমস্যা হলেও, ব্রাজিলের মিডফিল্ডাররা গোল করবার বাড়তি দায়িত্ব নিতে সম্পূর্ণ অভ্যস্ত। বিশেষ করে জুনিয়ার ও এডিনহোর মতো অভিজ্ঞ ডিফেণ্ডাররা রক্ষণে থাকলে এগিয়ে গিয়ে গোল করবার ঝুঁকি নিতে অসুবিধে কোথায়?

ইতিহাস ও যুক্তির পাল্লা দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলির দিকে ঝুঁকে থাকলেও ইউরোপের চোদ্দটি দেশ নিশ্চয়ই নিছক প্রকৃতির সৌন্দর্য দর্শনের জন্য মেক্সিকো যাবে না। বিশেষ করে গতবারের চ্যাম্পিয়ান ইতালির কাছ থেকে বিশ্বকাপ ছিনিয়ে নেওয়া সহজ হবে না।

প্রতিভাবান ফরোয়ার্ডদের আকালে পাওলো রসির মতো সেণ্টার ফরোয়ার্ড এবারের বিশ্বকাপেও যদি ঝলসে ওঠেন, তা হলে অনেক হিসেব হয়তো নতুন করে লিখতে হবে। মনে রাখা দরকার, বিরাশি বিশ্বকাপের আগেও পাওলো রসি আজকের মতোই অফ ফর্মে ছিলেন। গত বিশ্বকাপের অন্যতম নক্ষত্র ক্যাবরিনি, ব্যাগনি, অ্যানসিলোটি, বারগোমি, ব্রুনো, কন্তিরাও যদি স্পেনে অর্জিত সম্মান মেক্সিকোতে অক্ষুণ্ণ রাখার প্রতিজ্ঞা নিয়ে ছিয়াশির বিশ্বকাপে খেলেন, তা হলে আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলকে নিশ্চয় ইতালিকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়তে হবে। বিশেষ করে অভিজ্ঞ ম্যানেজার বেয়ারজোতের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার ওপর ইতালির সাফল্য নির্ভর করছে।

'৫৪ ও '৭৪ সালের চ্যাম্পিয়ান ও '৮২ সালের রানার্স আপ পশ্চিম জার্মানি দলে বর্তমানে এমন দুজন ফুটবলার আছেন, যাঁরা মেক্সিকোর রুক্ষ আবহাওয়াতেও বিধ্বংসী ফুটবল খেলতে সক্ষম। একজন অভিজ্ঞ কার্ল হেইনজ রুমেনিগে, অপরজন সাম্প্রতিককালের সবচেয়ে নজর-কাড়া উঠতি মিডফিল্ডার বার্নড শুশ্চা। ইউরোপের ফুটবল-দর্শকরা দ্বিতীয় খেলোয়াড়টির প্রতি ইতিমধ্যেই নজর রাখতে শুরু করেছেন। এ ছাড়াও ইউরোপীয় ফুটবলে সাড়া-জাগানো মিডফিল্ডার ব্রাইগেল, লিটবারস্কি ও গোলরক্ষক শুমাচার দলে রয়েছেন। মেক্সিকোর সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত ম্যানেজার ফ্রানজ বেকেনবাউয়ারের বিশ্বকাপ জয়ের লক্ষ্য থাকতেই পারে।

বর্তমানে বিশ্ব-ফুটবলে একমাত্র ইংল্যাণ্ডেই প্রতিভাবান স্ট্রাইকারের অভাব নেই। ভাগ্যবান ইংল্যাণ্ডে উইনকিন্স, মার্ক হেটলে, গ্যারি লিনেকর ও ক্যারি ডিক্সনদের মতো নবীন প্রতিভার পাশে ব্রায়ান রবসন ও ট্রেভর ফ্রান্সিসদের মতো অভিজ্ঞ ও শক্তিশালী ফুটবলাররা রয়েছেন। সেণ্টার মিডফিল্ডে গ্লেন হুডলের মাথাটুকুই নাকি বিশ্বের সেরা ডিফেণ্ডারদের ঘুম কেড়ে নেবার পক্ষে যথেষ্ট। তা সত্ত্বেও ইংল্যাণ্ডের খেলোয়াড়দের পক্ষে মেক্সিকোর আবহাওয়ার প্রতিকূলতা হয়তো অতিক্রম করা সম্ভব হবে না। গত মেক্সিকো বিশ্বকাপেই তার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

লক্ষ করবার বিষয় হল ছিয়াশি কাপের অধিকাংশ শক্তিশালী দলই মূলত মাঝমাঠ-নির্ভর, মাঝমাঠকেই যদি বিশ্বকাপের ফলাফল নির্ধারণের জায়গা হিসেবে ধরে নিতে হয়, তা হলে ইউরোপের গত দু'বছরের সেরা ফুটবলার মিডফিল্ডার প্লাতিনির ফ্রান্সকে অন্যতম শক্তি হিসেবে গুরুত্ব দিতেই হবে। ইউরোপ চ্যাম্পিয়ান ফ্রান্সের উজ্জ্বল মাঝমাঠের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র প্লাতিনি বিশ্বের বহু সেরা দলের বিরুদ্ধে একাই একশো। এ-কথা ইতিমধ্যে প্রমাণিত। পঁচাশির বিশ্বসেরা ফুটবলার প্লাতিনি আগামী বিশ্বকাপের সম্ভাব্য সেরা খেলোয়াড়ের তালিকারও অন্যতম নক্ষত্র। অবশ্য অধিকাংশ ফুটবল-বিশেষজ্ঞ মেক্সিকোর আবহাওয়ায় অনভ্যস্ত প্লাতিনি ওপর বাজি রাখতে রাজি নন। তাঁদের মতে ছিয়াশির বিশ্বকাপ মারাদোনার বিশ্বকাপ হিসেবেই চিহ্নিত হবে।

আর্জেন্টিনার অধিনায়ক হিসেবে মারাদোনা মেক্সিকোয় জীবনের তৃতীয় বিশ্বকাপ খেলবেন। পঁচিশ বছর বয়সী মারাদোনার এটা নিশ্চয়ই শেষ বিশ্বকাপ খেলা নয়। তা সত্ত্বেও গত দুটি বিশ্বকাপে ব্যর্থ সম্প্রতি ফর্ম ফিরে পাওয়া মারাদোনার বিশ্বকাপে সাফল্য পাওয়া এই মুহূর্তে বড় জরুরি। বিশ্বের সবচেয়ে দামি খেলোয়াড় হিসেবে বিশ্বকাপে নিজেকে প্রমাণ করতে এবারে মারাদোনা নিশ্চয়ই মরিয়া হয়ে উঠবেন, এবং মরিয়া মারাদোনা কোন্ পর্যায়ের ফুটবল খেলতে পারেন, তা অনুমান করে আর্জেন্টিনার সমর্থকরা স্বপ্ন দেখছেন যে, বিশ্বকাপটি দিয়েগো মারাদোনার হাতেই ধরা থাকবে। স্বপ্নের ব্যাপারে ব্রাজিলও অবশ্য কম যায় না। মাঝমাঠেই যদি ফলাফল নির্ধারিত হয়, তা হলে বিশ্বের সেরা মিডফিল্ডই বিশ্বকাপ জিতবে। ব্রাজিলের সমর্থকরা ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির আশায় দিন গুনছেন।

২৯ জুন কার স্বপ্ন পূরণ হবে কে জানে।

আর্জেন্টিনার দানিয়েল বার্তোনি

মেক্সিকোয় বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা শুরু হবে শিগ্‌গির। চোখধাঁধানো চিত্তাকর্ষক খেলা দেখিয়ে দর্শকদের মন জয় করার জন্য এই আসরে হাজির হবেন আর্জেন্টিনার দিয়েগো মারাদোনা, ব্রাজিলের সক্রেটিস, ফ্রান্সের মিশেল প্লাতিনি, ইতালির পাওলো রসি, পশ্চিম জার্মানির কার্ল হেইন্‌জ রুমেনিগের মতো বিখ্যাত ফুটবলাররা। আগামী চার বছরের জন্য ফুটবলের বিশ্ব-শ্রেষ্ঠের শিরোপা কোন্ দেশের মাথায় শোভা পাবে সে প্রশ্নের জবাব পাওয়ার আগে এঁদের সম্বন্ধে দু-চার কথা বলা যাক।

জুনিয়র বিশ্বকাপ জয় করলেন মারাদোনা। ১৯৮২ সালের বিশ্বকাপে খুব একটা ভাল খেলেননি তিনি। কিন্তু এই মুহূর্তে তাঁকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ফুটবলার বললে এতটুকু বাড়িয়ে বলা হবে না। স্কিল, টেকনিক, গতি, পায়ের ক্ষিপ্র কাজ এবং অফুরন্ত দমে তাঁর ধারেকাছে আসার মতো আর কেউ নেই। সাধে কি আর তাঁর বর্তমান ক্লাব ইতালির নেপোলি তাঁকে সাত কোটি টাকা পারিশ্রমিক দিয়েছে! অনেকে পেলের সঙ্গে তাঁর তুলনা করেন, মারাদোনার তা মোটেই পছন্দ নয়। তিনি নিজেকে মারাদোনা ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে চান না।

এবারের বিশ্বকাপের নায়করা

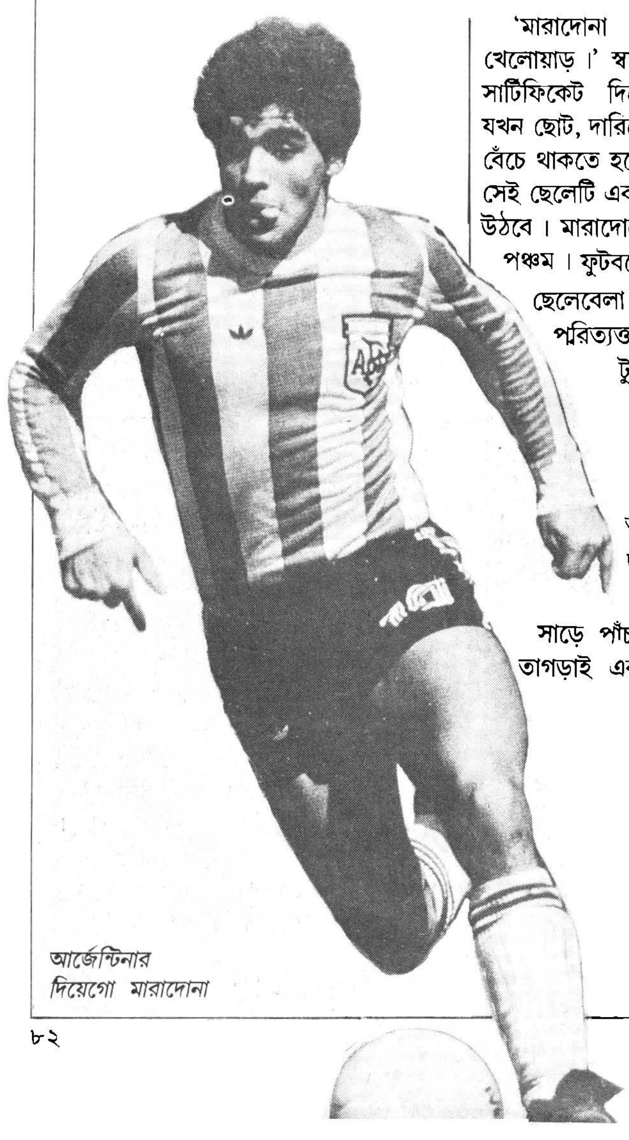

আর্জেন্টিনার দিয়েগো মারাদোনা

'মারাদোনা আমার চেয়েও ভাল খেলোয়াড়।' স্বয়ং পেলে মারাদোনাকে এই সার্টিফিকেট দিয়েছেন। অথচ মারাদোনা যখন ছোট, দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে তাঁকে বেঁচে থাকতে হচ্ছে, তখন কিন্তু ভাবা যায়নি, সেই ছেলেটি একদিন এত বড় ফুটবলার হয়ে উঠবে। মারাদোনা আট ভাইবোনের ভেতরে পঞ্চম। ফুটবলের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছেলেবেলা থেকেই। পয়সার অভাবে পরিত্যক্ত টিন-ক্যান এবং মোজার টুকরো দিয়ে বানানো ফুটবল নিয়ে সারাদিন খেলে বেড়াত এই ছেলেটি। মাত্র তেরো বছর বয়সে আর্জেন্টিনার জাতীয় জুনিয়র দলে যোগ দেন মারাদোনা। তখন তাঁর উচ্চতা ছিল সাড়ে পাঁচ ফুট। আস্তে-আস্তে তিনি তাগড়াই এক জোয়ান হয়ে উঠলেন। ষোলো বছর বয়সে প্রথম ডিভিশনে খেলেন এবং সেবারই হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে আর্জেন্টিনার জাতীয় দলের জার্সি উঠল তাঁর গায়ে। জাতীয় জুনিয়র দলের অধিনায়ক হয়ে ১৯৭৯ সালে টোকিওতে

গত বিশ্বকাপে ব্রাজিলের অধিনায়ক সক্রেটিস এই মুহূর্তে যে-কোনও বিশ্বদলের অপরিহার্য খেলোয়াড়। ব্রাজিলের এই মিডফিল্ডারের পরিচয় শুধুমাত্র একজন উঁচুদরের ফুটবলার হিসেবেই নয়, একজন

বিশ্বকাপের কোয়ালিফাইং রাউণ্ডের খেলা চলছে

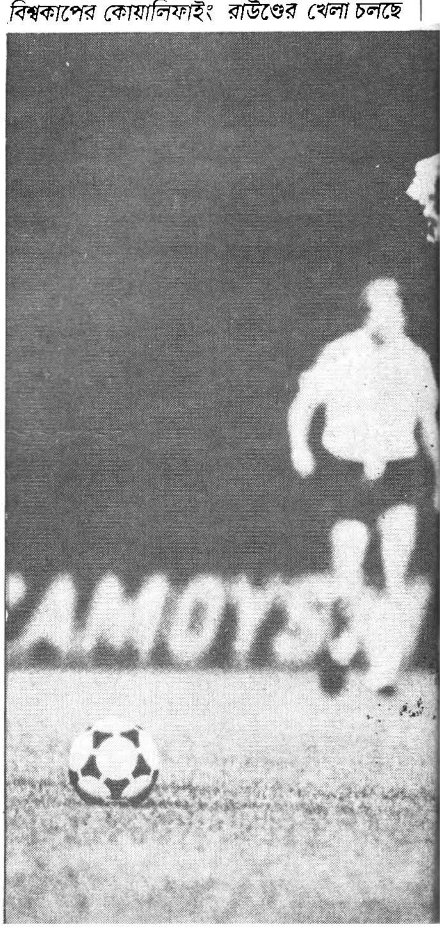

শিশু-রোগবিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিসেবেও তিনি বিখ্যাত। তাঁর পা দুটি বেশ লম্বা এবং হাত হাঁটু পর্যন্ত ছড়ানো। 'আমার চেহারা ঠিক ফুটবলারদের মতো নয়'—এ-মন্তব্য তিনি অনেকবার করেছেন। কিন্তু দৌড়বার সময় তাঁর লম্বা পা দুটি বিপক্ষের বুকে জাগায় আতঙ্ক। পায়ের প্রচণ্ড শটে জয় ছিনিয়ে আনেন। তেমনই অনায়াসে বিপক্ষের আক্রমণ প্রতিহত করেন। পেনাল্টিতে বরাবর গোল দিয়েছেন সক্রেটিস। ১৯৭৮ সালে প্রথম ব্রাজিলের জাতীয় দলে অংশ নেন। ১৯৮২ সালের বিশ্বকাপে তাঁর অসাধারণ খেলাই তাঁকে পরবর্তীকালে দক্ষিণ আমেরিকার 'ফুটবলার অব দি ইয়ার'-এর সম্মান এনে দিয়েছে। বর্তমানে ইতালির ফিওরিনটেনায় ২·৩৫ মিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে খেলছেন।

ফ্রান্সের মিশেল প্লাতিনির নাম শোনেননি এমন ফুটবলপ্রেমী বোধহয় বর্তমানে বিরল। গোলের পর গোল করে ফ্রান্সের এই মিডফিল্ডার প্রতিপক্ষ শিবিরে ত্রাসের সঞ্চার করেন। ডাইরেক্ট ফ্রি-কিক থেকে গোল করতে পারদর্শী প্লাতিনি মেক্সিকোর গরমে কেমন খেলেন সেটিই এখন দেখার বিষয়। ১৯৮৩ সালে তিনি ইউরোপের 'ফুটবলার অব দি ইয়ার' মনোনীত হন। প্রধানত তাঁরই অসাধারণ শিল্পসম্মত খেলার জন্যই ১৯৮৪ সালে ফ্রান্স ইউরোপিয়ান নেশনস কাপ জয়

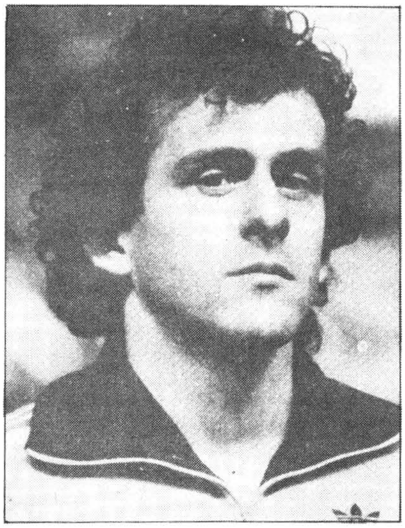

ফ্রান্সের মিশেল প্লাতিনি

করে। প্লাতিনির ওপর তাঁর সতীর্থদের এতটাই বিশ্বাস যে, বল পেলেই তাঁরা প্লাতিনিকে খোঁজেন। তিনিও সতীর্থদের বিশ্বাসের পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ খেলায় গোল করেছেন। মেক্সিকোর বিশ্বকাপই বোধহয় প্লাতিনির শেষ বিশ্বকাপ।

গত বিশ্বকাপের অবিসংবাদিত হিরো পাওলো রসি কি এবারও তাঁর সেই অসাধারণ গোল করার ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে পারবেন ? ছোটখাটো চেহারার রসি ১৯৫৬ সালে ইতালির প্রাতো শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন ফুটবল-অনুরাগী। মাত্র সতেরো বছর বয়সে রসি প্রথমে রাইট-উইংগার হিসেবে ইতালির যুব দলে নির্বাচিত হন। ১৯৭৬ সালে দ্বিতীয় ডিভিশন এক দলের হয়ে খেলার সময় কোচের পরামর্শে সেন্টার ফরোয়ার্ড হিসেবে খেলতে শুরু করেন। অচিরেই সাফল্য পান। ধরতে গেলে রসির একার চেষ্টাতেই তাঁর দল সেবারই প্রথম ডিভিশনে উঠে আসে। ১৯৭৭ সালে রসির রশ্মি ছড়িয়ে পড়ে

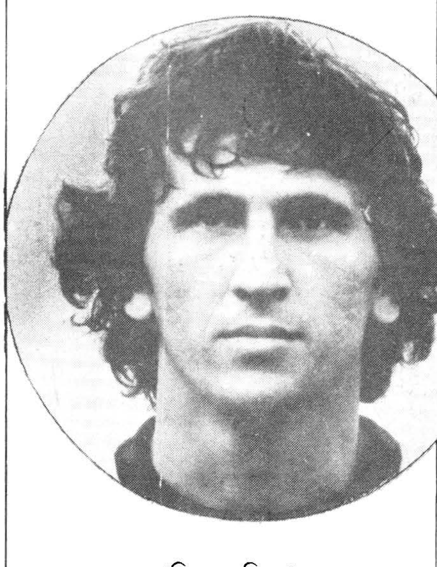

ব্রাজিলের জ়িকো

চারদিকে। রসির দল লিগে রানার্স-আপ হয়। ১৯৭৮ সালের বিশ্বকাপে তাঁর অসাধারণ খেলার দরুন তিনি খ্যাতির চূড়ায় ওঠেন, কিন্তু ঘুষ নেওয়ার অপরাধে তিন বছরের জন্য সাসপেণ্ড হন। এর পরের ঘটনা তো ইতিহাস। জাতীয় দলে নির্বাচিত হয়ে স্পেনে বিশ্বকাপে শ্রেষ্ঠ ফুটবলারের স্বীকৃতিই শুধু নয়, সেমিফাইনাল ও ফাইনালে গোল করে বিশ্বকাপ নিজের দেশেও নিয়ে যান তিনি।

পশ্চিম জার্মানির অধিনায়ক কার্ল হেইনজ রুমেনিগের ওপর নির্ভর করছে তাঁর দল ফাইনালে পৌঁছতে পারবে কি না। ১৯৮০ ও ১৯৮১-এর ইউরোপের 'ফুটবলার অব দি ইয়ার' রুমেনিগে ১৯৫৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর খেলায় আছে নিজস্ব স্টাইল। বড় হয়ে তিনি যোগ দেন বিখ্যাত ক্লাব বেয়ার্ন মিউনিখে। ১৯৭৬ সালে রুমেনিগের অসাধারণ একক চেষ্টায় তাঁর ক্লাব বিশ্বক্লাব কাপ জেতে। রুমেনিগের অধিনায়কত্বে পশ্চিম জার্মানি ১৯৮২ সালে বিশ্বকাপ রানার্স হয়।

কৃশানু ভট্টাচার্য

রোভার্সের রয়
মেলচেস্টার রোভার্স
রয় কি দেড়-কোটি টাকা দিয়ে বদলি-খেলোয়াড় কিনবে ?
জিওফ গাইলসকে বেচে দেওয়ায় রোভার্সের সদস্যারা দারুণ ক্ষুব্ধ। রয়কে সবাই বিদ্রূপ করছে। মেলবরোর সঙ্গে খেলায় রোভার্স ১—২ হেরেছে। দুটো গোলই দিয়েছে গাইলস। রয় এখনও বাড়ি ফেরেনি। টেলিভিশনে খেলার খবর চলছে ...
রয় এখনও ড্রেসিং রুম থেকে বেরোয়নি। ভিতরের আবহাওয়া নাকি দারুণ তপ্ত ...
তবেই তো মুশকিল !
বাইরে কিন্তু মেলবরোর ভক্তদের মধ্যে উল্লাসের জোয়ার বইছে !
রয় অতি রদ্দি !
স্কোর কী রয় ?
ঘন্টাখানেক বাদে রয় বাড়ি ফিরল ...
বড্ড দেরি হয়ে গেল ! আসলে ...
টেলিভিশনে সবই শুনলুম !
সবকিছু তালগোল পাকিয়ে গেছে, তাই না ?
আমাদের চার-পাঁচজন খেলোয়াড় অতি বাজে খেলছে ...
দলের উপরে তার প্রভাব পড়তে বাধ্য !
এই দুর্বলতারই সুযোগ নিয়েছে গাইলস !
তা বদলি-খেলোয়াড়ের কথা ভাবছ, কেমন ?
পোর্ট ডিনের টেরি মার্টিন, ওল্ডফিল্ডের জনি ব্যারেট আর ওয়ালফোর্ডের পিটার টমসনকে আমার পছন্দ, কিন্তু ...
এদের এক-এক জনের দাম অন্তত দেড় কোটি টাকা ! বুঝলে ?
আর-একজনের কথাও তো বলেছিলে ...
কী নাম যেন ?

ও-সব কথা বাদ দাও ! এখন আমি মেলচেস্টার হাসপাতালের শিশুবিভাগে গিয়ে বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলব ! ওদের কথাই এখন আমি ভাবছি !
টিভিতে লক্ষ-লক্ষ লোক দেখছে এই দৃশ্য ...
ছেলেমেয়েরা, কে এসেছেন দ্যাখো ! রয় রেস !
উরিব্বাস !
হুররে !
এইবারে আপনাকে হেড করে ওই উপহারের বাক্স খুলতে হবে !
বেশ তো !
একবার হেড করেই সুটকেসের ডালা খুলে দিলেন !
দ্যাখো কত উপহার !
প্রত্যেকেই উপহার পাবে !
ওরেব্বাস !
রয় যখন অটোগ্রাফ দিচ্ছে ...
একটা প্রশ্ন করব ?
ফুটবল নিয়ে ?
কী জানতে চাও ?
রোভার্সের এই বিপদের সময়েও আপনি হাসছেন কী করে ?
ইয়ান !
বলছি...
এখুনি দিচ্ছি তোমার প্রশ্নের উত্তর !
হাসছি, কেননা আমি জানি যে, রোভার্সের এই বিপদ ঠিকই কেটে যাবে ।
এবারে বড়দিনে তোমাদের একটা ভাল খবর দিচ্ছি...
জিওফ গাইলসের জায়গায় কাকে দলে আনছি, জানো ?
বদলি-খেলোয়াড় হিসেবে কে আসছে রোভার্সে ?
(আগামী সংখ্যায়)

প্রথম বারের ঝামেলা

উরুগুয়েতে প্রথম বিশ্বকাপের আসর বসেছিল আজ থেকে চুয়ান্ন বছর আগে, ১৯৩০ সালে। কিন্তু প্রতিযোগিতা শুরুর দু' মাস আগে দেখা গেল ইউরোপের কোনও দেশই বিশ্বকাপের আসরে হাজির হবার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেনি। ব্যাকুল হয়ে উরুগুয়ে ফুটবল ফেডারেশনের কর্মকর্তারা দেশে-দেশে আবেদন পাঠালে রুমানিয়ার রাজা ক্যারল এই সমস্যার সমাধানে এগিয়ে এলেন। তিনি নিজেই খেলোয়াড়দের বাছাই করে তাঁরা যে-যে কোম্পানিতে চাকরি করতেন, সেখান থেকে ছুটির ব্যবস্থা করে দল পাঠিয়ে দেন।

আগেই বাঁশি বেজেছিল

প্রথমবারের আসরে ফ্রান্স ও আর্জেন্টিনার মধ্যে খেলা চলছে। খেলা শেষ হবার ৯ মিনিট আগে আর্জেন্টিনা এক গোলে এগিয়ে যায়। কিন্তু সকলকে অবাক করে দিয়ে ব্রাজিলের রেফারি আলমিডা রেগো নির্দিষ্ট সময়ের আগেই খেলা-শেষের বাঁশি বাজিয়ে দিলেন। আর্জেন্টিনার সমর্থকরা তৎক্ষণাৎ স্রোতের মতো মাঠের মধ্যে ঢুকে পড়ে। এদিকে ফ্রান্সের খেলোয়াড়রা রেফারিকে মারধোর করতে শুরু করলে রেফারি নিজের ভুল শুধরে ফের খেলা শুরু করার নির্দেশ দেন।

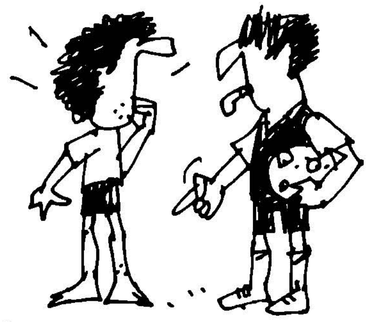

বুট খোলা চলবে না

তৃতীয় বিশ্বকাপের আসর বসে ফ্রান্সে, ১৯৩৮ সালে। পোল্যাণ্ড ও ব্রাজিলের মধ্যে গ্রুপ লিগের একটি খেলায় গোল দেবার প্রতিযোগিতা শুরু হয়। দু' পক্ষই চারটি করে গোল করে। প্রথমার্ধে ব্রাজিলের সেন্টার ফরোয়ার্ড লিওনিডাস একাই হ্যাটট্রিক করেন। কিন্তু বৃষ্টিভেজা মাঠে কাদার মধ্যে খেলতে অসুবিধে হওয়ায় লিওনিডাস দ্বিতীয়ার্ধে বুট খুলে খালি পায়ে খেলতে শুরু করেন। রেফারি কিন্তু ব্যাপারটি ঠিক লক্ষ করেছিলেন। খালি পায়ে খেলা নিষেধ, অতএব লিওনিডাসকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আবার বুট পরে খেলতে হয়।

ছেলেটির নাম পেলে

স্টকহোমে ১৯৫৮-এর বিশ্বকাপের আসর বসে। ওয়েলসের সঙ্গে খেলার সময় ব্রাজিলের সতেরো বছর বয়স্ক এক নিগ্রো খেলোয়াড় দলের একমাত্র গোলটি করার পরে আনন্দে এতই অধীর হয়ে যায় যে, সারা মাঠে গো—ও—ও—ল, গো—ও—ও—ল বলতে বলতে ছুটোছুটি লাগিয়ে দেন। দলের অন্য খেলোয়াড়রা তখন দৌড়ে এসে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে শান্ত করেন। তোমরা সবাই নিশ্চয়ই ধরে নিয়েছ কে এই খেলোয়াড়। হ্যাঁ, ইনিই পেলে।

খেলোয়াড়দের মাথা গরম

ব্রাজিল ও চেকোস্লোভাকিয়ার মধ্যে অপর একটি খেলায় খেলোয়াড়রা মাথা গরম করে খেলতে থাকেন। ফল যা হবার তাই হয়। খেলোয়াড়রা একে-একে ভূমিশয্যা গ্রহণ করতে শুরু করেন। কারও পা ভাঙে, কারও হাত, কেউ পেটে দারুণ আঘাত পান, কারও চোট অল্পের ওপর দিয়ে যায়। তিনজনকে মাঠের বাইরে যেতে হয়।

সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে স্টেডিয়াম

বিশ্বকাপের দায়িত্ব পাবার পরে ব্রাজিলের ফুটবল সংগঠন বিশাল মারাকানা স্টেডিয়াম গড়ার কাজে হাত দেন। কিন্তু দেখা গেল, কাজ মোটেই এগোচ্ছে না। অথচ অনুষ্ঠান শুরু হতে আর মাত্র কয়েকটা দিন বাকি। ফলে সৈন্যবাহিনীকে ডাকা হয় স্টেডিয়াম তৈরি সম্পূর্ণ করার জন্য।

অতিরিক্ত সময়ে হ্যাটট্রিক

সারা প্রতিযোগিতায় মাঠের বাইরে বসে থেকে ফাইনালের অতিরিক্ত সময়ে হ্যাটট্রিক করার মতো বিরল ঘটনা ঘটেছিল ১৯৬৬-এর বিশ্বকাপে। নিয়মিত খেলোয়াড় জিমি গ্রিভসের বদলি জিওফ হার্স্ট ফাইনালে পশ্চিম জার্মানির বিরুদ্ধে অতিরিক্ত সময়ের খেলায় তিন-তিনটি গোল করে ইংল্যাণ্ডকে বিজয়ী করেন।

বিশ্বকাপের ধাঁধা

১ **মেক্সিকোর** আজটেকা স্টেডিয়ামে দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ ফাইনাল অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। পৃথিবীর আর কোন্ স্টেডিয়াম এই দুর্লভ সম্মান পেয়েছে ?

২ **বিশ্বকাপের** আগে সংগঠক দেশে ভূমিকম্প হওয়ার নজির শুধু মেক্সিকোতেই নয়, অন্য একটি দেশেও আছে। সেটি কোন্ দেশ ?

৩ **মেক্সিকোতেই** ব্রাজিল তৃতীয়বার বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ান হিসেবে চিরদিনের মতো জুলে রিমে কাপ দখল করে। ব্রাজিলের অধিনায়ক সেবার কে ছিলেন, ফাইনালে ব্রাজিলের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল কোন্ দেশ ?

৪ **বিশ্বকাপ** ফুটবলে সবচেয়ে বেশি গোল করবার রেকর্ড পশ্চিম জার্মানির গার্ড মুলারের দখলে। পাওলো রসি আর ক'টি গোল করলে তাঁর রেকর্ড ছুঁতে পারবেন ?

৫ **বিশ্বকাপের** ইতিহাসে মাত্র একবারই একটি দেশ চ্যাম্পিয়ান হয়েও খেতাব রক্ষার লড়াইয়ে নামেনি। কত সালে, কোন্ দেশ ?

৬ **সবচেয়ে** বেশি বয়সে বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পেয়েছেন কোন্ ফুটবলার ?

৭ **কোন্** বিশ্বকাপে রেকর্ড-সংখ্যক দর্শক হয় ?

উত্তর (১) পৃথিবীর অন্য কোনও স্টেডিয়ামে দু'বার বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয়নি। (২) চিলি। (৩) কার্লোস আলবার্তো। ইতালি। (৪) পাঁচটি গোল। (৫) ১৯৩৪ সালে, ১৯৩০ সালের চ্যাম্পিয়ান উরুগুয়ে। (৬) সার স্ট্যানলি ম্যাথুজ। ৩৯ বছর বয়সে প্রথম বিশ্বকাপ খেলেন। (৭) ব্রাজিল বিশ্বকাপে। চূড়ান্ত পর্যায়ের অধিকাংশ খেলাতেই প্রায় দু' লক্ষ দর্শক ছিল। মূল স্টেডিয়াম মারাকানার আসন সংখ্যা ছিল ১৮৩,৩৪১।

টিভি এল এই তো সেদিন

'আফ্রিকান সাফারি'র একটি দৃশ্য

মার্চ মাসের প্রথম রবিবারে দিল্লি থেকে কুইজ-টাইম হল রাত ন'টায়। প্রতি রবিবারই হয়। কোথায় হয়? কোথায় আবার, তোমারই বাড়িতে! অবশ্য প্রত্যেকের বাড়িতেই টিভি নেই, সর্বত্র আবার বিদ্যুৎও নেই। আবার বিদ্যুৎ থাকলেও সব সময় যে থাকবে তাও বলা যায় না। তোমরা বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই যে, আমি একটি টিভি প্রোগ্রাম নিয়ে বলছি। রবিবার রাত ন'টায় যে কুইজ-টাইম প্রোগ্রাম হয়, সেটা প্রচারিত হয় দিল্লি থেকে। এই প্রোগ্রামটি কে পরিচালনা করেন দেখেছ? সিদ্ধার্থ বসু।

এবার বলি, মার্চের প্রথম রবিবারে সিদ্ধার্থ একটি ছবি দেখিয়ে বললেন, সেটি কার ছবি। একটু ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন সিদ্ধার্থ। ছবিটি ১৯৭৬ সালে তোলা। একজন বলল, ছবিটি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর। ছবি না দেখেই কিন্তু তোমরা বলে দিতে পারবে উত্তরটা একেবারেই ঠিক হয়নি! কেমন করে? একটু ভাবলেই বুঝতে পারবে। এর উত্তর তোমরা যদি দিতে না পারো তা হলে বড় কাউকে জিজ্ঞেস করে নিও, আমি এর উত্তর জানাব না।

টিভি-ভর্তি কত জিনিস। ওই একই দিনে বেতালের একটি গল্প হয়ে গেল। হিন্দিতে বলায় আমি অনেকটাই বুঝতে পারলেও অনেকটা পারলাম না। কত খেলা, কত সংবাদ, কত বিচিত্র জগৎ! পয়লা মার্চে একটা পুরনো ছবি দেখা গেল—আফ্রিকান সাফারি। আফ্রিকার জঙ্গল, মরুভূমি, আগ্নেয়গিরি, সিংহের দল, ইগ্রেট হাঁসের বাহিনী, বিষাক্ত সাপ, শিম্পাঞ্জির খুদে বাচ্চা, চিতার বাচ্চা, পিগমিদের নানা প্রথা—এ সব আফ্রিকায় কত যুগ ধরে সেই একই রয়েছে।

জগতের সঙ্গে নিবিড়তরভাবে পরিচয় পেতে হলে টিভি'র জুড়ি নেই। সেই কোথায় মেলবোর্নে ক্রিকেট খেলা হচ্ছে, কী-হয় কী-হয় ভাব। ভারতীয়রা কি জিতবে না হারবে? সংবাদে দু-তিন লাইন পেলেই আমরা আগে খুশি হতাম। আক্ষেপ হত অবশ্য খেলাটা দেখা হল না বলে। হিংসে হত, যারা দেখছে তাদের উপর। রেডিওয় ধারাবিবরণী যখন শুরু হল, তখন অবশ্য আক্ষেপ কিছুটা কমল। তারপর এখন প্রতিটি বল কী ভাবে দেওয়া হচ্ছে, কী ভাবে ব্যাটসম্যান ব্যাট করছে এ-সব তো দেখতেই পাচ্ছি, ভাগ্যবানেরা আবার রঙ-সমেত দেখছেন।

এই টিভি আমাদের দেশে এল এই তো সেদিন। তার আগে উন্নত অনেক দেশেই টিভি প্রচার শুরু হয়েছে। কিন্তু টিভি তৈরি করল কে? কে প্রথম কথাটা ভাবলেন? কী ভাবে এর উন্নতি হল? একটি কথা বলে দিই, কোনও একজন লোকের সাধ্য ছিল না টিভি তৈরি করার। বহু দেশের বহু বৈজ্ঞানিক বহু যুগ ধরে টিভি'র স্বপ্ন সফল করতে চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। একেই বোধহয় বলে সাধনা। তোমরা আশ্চর্য হয়ে যাবে এ-কথা শুনলে যে, টিভি তৈরির কথা ভেবেছিলেন এক বৈজ্ঞানিক একশো বছরেরও বেশি আগে। ইনি একজন আমেরিকান, নাম জর্জ কেরি। এর কয়েক বছর পর, ১৮৮০ সালে দু'জন বৈজ্ঞানিক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডব্লু·ই·সইয়ার এবং ফ্রান্সের মরিস লেব্লঁ। বৈদ্যুতিক তারের সাহায্যে (তখনও বেতারযন্ত্র তৈরি হয়নি), ছবি পাঠানোর সম্ভাবনা প্রথম দেখা দিল। তার চার বছর পর ১৮৮৪ সালে পল নিপকৌ টিভি'র প্রথম পেটেন্ট নেন। কিন্তু সত্যিকারের প্রচার হতে-হতে আরও বহু বছর কেটে যায়। বহু বছর কেন, বহু যুগ। আমরা কিন্তু আধুনিক যুগের কোনও গুরুত্বপূর্ণ জিনসই আবিষ্কার করতে পারিনি। যে সামাজিক আর্থিক এবং রাজনৈতিক পরিবেশে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি সম্ভব হয়, তা আমাদের ছিল না। এখন আমরা অন্যের তৈরি জিনিসই কেবল ভোগ করছি। শুধু টিভি নয়, আরও অনেক কিছু।

যাই হোক, সে অন্য কথা। আমাদের এই কলকাতাতেও টেলিভিশন কেন্দ্র হয়ে গেছে। এখান থেকে কত রকম প্রোগ্রাম প্রচার করা হয়। ছোটদের জন্যও বিশেষ বিশেষ কত প্রোগ্রাম প্রচারিত হয়। সোমবার হয় হরে-কর-কম্বা, ১০ থেকে ১৫ বছরের ছেলে-মেয়েদের জন্য, মঙ্গলবার হয় চিচিং ফাঁক, ১০ বছর পর্যন্ত বয়সের ছেলে-মেয়েদের জন্য। এ ছাড়া ইংরেজিতে হয় টেলিস্কোপ। এটা প্রত্যেক সপ্তাহে এখনও হয় না, হয় মাসের দ্বিতীয় এবং চতুর্থ শুক্রবার। আবার সোমবার দেখানো হয় ইংরেজি ছবি, মাসের চতুর্থ সোমবার। প্রতি মাসের তৃতীয় শুক্রবারে দেখানো হয় ছোটদের ছবি, যাকে বলে ফিচার ফিল্ম, বাংলা কিংবা হিন্দি। অবশ্য ইংরেজি-হিন্দি প্রোগ্রামই বেশি। তা একটা সুবিধে অবশ্য আছে এতে, এই ভাষাগুলো শুনতে শুনতে শেখা হয়ে যেতে পারে।

'বিক্রম অওর বেতাল'

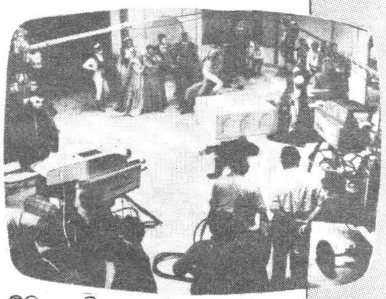

টিভিতে কীভাবে ছবি তোলা হয়

কী বললে? শিখতেই আপত্তি? তা হলে বলব না কথাটা। কিন্তু একটা কথা, তোমাদের যে-সব প্রোগ্রাম ভাল লাগে (বা খারাপ লাগে) সেটা আমাকে লিখে জানাতে পারো। খুব ভাল লেখা হলে হয়তো ছাপার অক্ষরে নামও দেখতে পাবে কখনও তোমাদের এই 'আনন্দমেলা'তেই। তবে নাম ছাপানোর জন্যই চিঠি পাঠালে কিন্তু দারুণ রাগ করব আমি! আর বেতার? অর্থাৎ রেডিও? তাকেও ভুললে চলবে না। ছোটদের প্রোগ্রাম সেখানেও তো হয়, সেগুলো নিয়েও কথা বলার ইচ্ছে রইল।

দিগ্‌দর্শক

"এখন এমন এক সাবান পেয়েছি, যা দেখি লাক্সের
চেয়েও চমৎকার !"—বলেন শ্রীদেবী.

নতুন লাক্স

মনমাতানো নতুন সুবাস

ফুলের মিষ্টি মধুর গন্ধের তাজা সুবাস, যার পঞ্চমুখে প্রশংসা চিত্রতারকাদের নিজের ভাষায়— 'দারুণ,' 'মনোরম' 'অপূর্ব' ।

দর্শনীয় নতুন রূপ

আপনার মতনই দর্শনীয় আর আধুনিক আর দারুণ আকর্ষণীয়। তিনটি মনোমুগ্ধ করা রঙে: গোলাপী. সবুজ আর হলদে।

নতুন
লাক্স
চিত্রতারকাদের সৌন্দর্য সাবান।

HLL—2012

হিন্দুস্তান লিভার লিমিটেডের এক উৎকৃষ্ট উৎপা

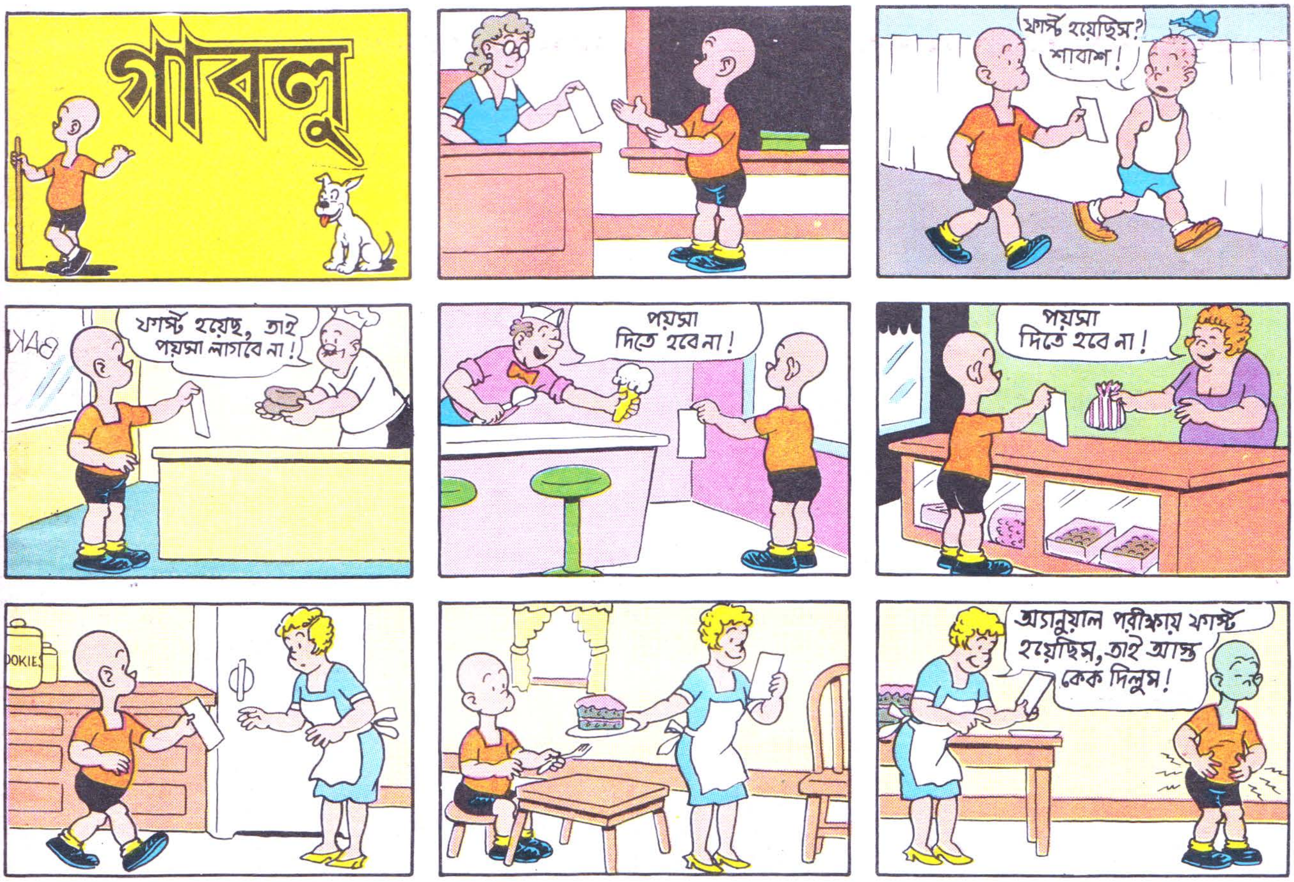
গাবলু
ফার্স্ট হয়েছিস? শাবাশ!
ফার্স্ট হয়েছে, তাই পয়সা লাগবে না!
পয়সা দিতে হবে না!
পয়সা দিতে হবে না!
অ্যানুয়াল পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছিস, তাই আস্ত কেক দিলুম!

গাবলু
এই পুকুরে স্নান করা নিষেধ
এই পুকুরে স্নান করা নিষেধ

বুড়ো আংলা । অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড,
কলকাতা ৯ ।
১৫·০০ ।

ক্ষীরের পুতুল । অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড,
কলকাতা ৯ ।
১০·০০ ।

মাটি-মাঠ-নদী-বন-পাহাড় দিয়ে গড়া যে বাংলা চিরদিনের, তারই এক চিরকালীন গল্প 'বুড়ো আংলা' । আর 'ক্ষীরের পুতুল' এক জাদুকরের দেশের মায়া-বানরের গল্প, যে মানুষের মতো কথা বলে, ছেলের মতো ভালবাসে বড় রানিমা'কে, দুঃখিনী মায়ের চোখের জল মুছিয়ে দিতে চায় । এ-সব গল্প যিনি শুনিয়েছেন, তিনি শিল্পীদের শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর । রঙ-তুলির ছবি আর কালি-কলমের গল্প, তিনি যা এঁকেছেন, যা লিখেছেন, সবই হয়ে উঠেছে অসাধারণ সৃষ্টিকর্ম । তাঁর ছবি গল্পের মতো কথা বলে, আর গল্প হয়ে ওঠে চোখ-জুড়নো ছবি । শুধু গল্প-উপন্যাস লিখেই তিনি সেরা শিল্পীর মর্যাদা পেতেন ।

'বুড়ো আংলা'র রিদয় নামের হৃদয়হীন ছেলেটিকে তো আমরা চিনি । চিনি আমতলি গ্রাম, চলনবিল, চকা-নিকোবর আর যোগী গোফার রংপো নদীটিকে । চিনি পশুপাখিদের । টুং-সোন্নাটা ঘুমের 'বাতাসিয়া'

লাইন দিয়ে আমরা কতবার আসা-যাওয়া করেছি । চেনা পৃথিবীটিকেই নতুন করে চিনিয়ে দিয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ । চিরদিনের ফ্রেমে বসিয়ে তাকে জুড়ে দিয়েছেন মনের রঙিন দেয়ালে । এমনই মায়া-মেশানো লেখার ভঙ্গিতে রিদয় নামের বিচ্ছু ছেলেটিকেও ভাল না বেসে পারি না ।

'ক্ষীরের পুতুল'এর রাজামশাই গেলেন বাণিজ্যে । শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে সুন্দর এক রূপকথার জগতে আমাদের নিয়ে যান অবনীন্দ্রনাথ । তিনি এঁকেছেন :

"রাজা মানিকের দেশে মানিকের চুড়ি নিয়ে, সোনার দেশে সোনার মল গড়িয়ে, মুক্তোর রাজ্যে এলেন ।

"সে দেশে রাজার বাগানে দুটি পায়রা । তাদের মুক্তোর পা, মানিকের ঠোঁট, পান্নার গাছে মুক্তোর ফল খেয়ে মুক্তোর ডিম পাড়ে । দেশের রানি সন্ধ্যাবেলা সেই মুক্তোর মালা গাঁথেন, রাতের বেলায় খোঁপায় পরেন, সকাল বেলায় ফেলে দেন ।"

এ-গল্প কখনও পুরনো হয় না । আর যেমন গল্প, তেমন ছবি । এঁকেছেন আশিস সেনগুপ্ত । বড় শিল্পীরা নতুনদের উদ্বুদ্ধ করেন । সেই কাজটিই করেছেন অবনীন্দ্রনাথ । বাংলার ধারাবাহিক এক শিল্প ঐতিহ্যেরই নিদর্শন হয়ে থাকল ধ্রুপদী দুটি বইয়ের এই সংস্করণ ।

ভারতের কয়েকটি পথঘাটের খেলা ।
মুলক রাজ আনন্দ ।
ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, দিল্লি ।
২·৫০ ।

ভারতীয়দের মধ্যে যাঁরা ইংরাজি ভাষায় সাহিত্য রচনা করে বিখ্যাত হয়েছেন, মুলক রাজ আনন্দ তাঁদেরই একজন । তাঁর নাম তোমরা শুনেছ নিশ্চয়, দুটি-একটি বইয়ের বাংলা তর্জমাও হয়তো পড়ে থাকবে ।

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট তাঁর এই যে বইটি বার করেছেন, মূলে এটিও ইংরেজি ভাষায় লেখা বই । ইংরেজিতে এর নাম ছিল 'সাম স্ট্রিট গেমস অভ ইণ্ডিয়া' । এর বাংলা করেছেন অসীম ভাদুড়ি ।

পথেঘাটে চলতে-ফিরতে যে-সব খেলা তোমরা দেখতে পাও, যার কিছু-কিছু তোমরা নিজেরাও হয়তো অলিতে-গলিতে খেলে থাকো, তারই বিবরণ রয়েছে এই বইয়ে । যেমন এক্কা-দোক্কা, লাট্টু, ডাং-গুলি । এ-সব খেলার নিয়মকানুন এ-বইয়ে দেওয়া আছে, পড়ে বুঝতে পারছি যে, নিয়মগুলি সর্বত্র এক নয়, ছোটখাটো তফাত তোমাদেরও চোখে পড়তে পারে ।

তা সে যা-ই হোক, বইখানা তোমাদের ভালই লাগবে । সেইসঙ্গে এইটে জেনে মজা পাবে যে, মুলক রাজ আনন্দের মতো মানুষও ছেলেবেলায় ডিগবাজি খেতে খুব ভালবাসতেন, একবার তো বনভোজনে গিয়ে ডিগবাজির প্রতিযোগিতায় তিনি প্রথমও হয়েছিলেন ।

বইখানা সত্যি ভাল । আমাদের আপত্তি শুধু একটা ব্যাপারে । এতটুকু বই, তাও বড়-বড় হরফে ছাপা, অথচ তারও মধ্যে রয়েছে বানান-ভুল । 'শূন্য' শব্দটার বানান বারবার হয়েছে 'শূণ্য' । ছাপতে দেবার আগে বানানগুলো আর-একটু ভাল করে দেখে দেবার দরকার ছিল ।

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

ঝাল ঝাল লঙ্কা আর টকমিষ্টি টমেটোর মিশ্রণ।

এবং তখন-ই দারুণ সব ঘটনা ঘটতে শুরু করে।

কিসানের নতুন টমেটো চিলি স্যস। এতে সব কিছুই আছে — মুখে জল আনার মতো ঝাল ঝাল স্বাদ যা আপনার রসনাকে তৃপ্তি দেবে আর এর সব-টুকুই আপনার চেটে-পুটে খেতে ইচ্ছে কর'বে।

একাধারে ঝাল ঝাল স্যসের স্বাদ

লালচে টমেটোর রসের সঙ্গে ঝাল ঝাল লঙ্কা মিশিয়ে তার ওপর খানিকটা গরম মশলা ছড়িয়ে দিন। কিসানের স্যস তৈরীর অনন্য অভিজ্ঞতা আর কারিগরী ক্ষমতা থাকায় এই অপূর্ব স্বাদ সারা পৃথিবীতে আর কোথাও পাবেন না।

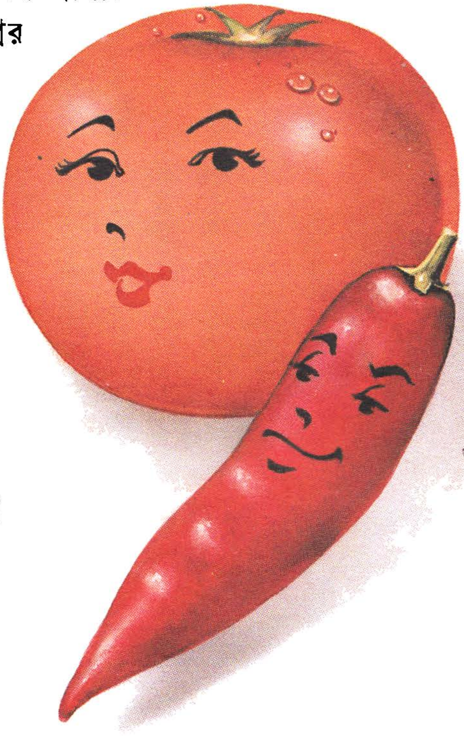

প্রথম স্বাদেই একেবারে কাৎ

অরুচি দূর ক'রতে আপনার মুখ বদলান। আপনার মনের মতো সব খাবারগুলোতেই কিসানের নতুন টমেটো চিলি স্যস মিশিয়ে নিন। খেতে ব'সে দেখবেন এটি না হ'লে আপনার আর চ'লবেই না।

আর দ্বিধা ক'রবেন না। কিসানের নতুন টমেটো চিলি স্যস চেখে দেখুন! অন্য কোন স্যস আপনার পছন্দ মতো খাবারকে বা যে কোন খাবারকে এত সুস্বাদু এবং রুচিকর ক'রে তোলে না।

আজ থেকেই শুরু ক'রুন। এটি না হ'লে আপনার আর চ'লবেই না।

কিসানের নতুন টমেটো চিলি স্যসে.
এই স্যসের কোন বিকল্প নেই।

OBM 2004 Ben

Anandamela 14 May 1986. Regd. No. WB/CC/264. MH By-South
683TN/MS(c)/731

"মা,
আর এক প্যাক রসনা খোলো না!"

খাঁটি কমলা-কমলা গন্ধ!

রসনা

ভারতের সবচেয়ে বেশি বিক্রীর
সফ্ট ড্রিঙ্ক কনসেনট্রেট

Mudra:A:PI:2951B